আত্মজীবনীর স্থাপত্য

দূর্বা দেব

ভারতী বুক এজেন্সী
৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ - ২০০০

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
ছায়া গ্রাফিক্স
২১১ই বাগমারি রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৪

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
কলকাতা-৯

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর

সূচিপত্র

ভূমিকা

মেয়েদের শূন্যবিন্দু-লেখা

লেখাব ভালো-মন্দ নয়, সার্থকতা-অসার্থকতা নয়। শুধু লিখতে পাবাব তৃপ্তি যাদের কাছে অনেকখানি, নিবালোক ভাযাহীন পরিসর থেকে তাঁবা প্রথমত কোন্ বার্তা নিয়ে আসেন! বিখ্যাত এক দার্শনিকের বাচন অনুসরণ করে বলা যায়, 'আমি আছি কারণ আমি নিজে নিজে চিন্তা কবতে পাবছি।' পিঞ্জরে-বসা তোতাপাখিব মতো শেখানো বুলি আউড়ে যাচ্ছি না— ধার-কবা চোখে নিজেব দিকে তাকাচ্ছি না— নিজেব উপব চাপিয়ে দিচ্ছি না কোনো ধূর্ত প্রতাবক প্রভুর বানানো রঙিন আঙ্রাখা : এই কথাগুলিও হযতো বলতে পাবেন দীর্ঘ দীর্ঘতর কাল রুপোর কাঠির মায়ায ঘুমিয়ে-থাকা বন্দিনি কন্যা। বাজকন্যা নয়, প্রতিদিনেব ধূসর বাস্তবে অতিপবিচিত-হযেও-অপরিচিত কোনো মাটির কন্যা। মায়া কেটে যাচ্ছে বলে তিনি অন্তত এইটুকু বুঝতে পারছেন, এতকাল তিনি নিঃসাড় ঘুমে তলিযে ছিলেন— এইবার একটু-একটু কবে জেগে উঠছেন। তাই তিনি প্রথম নিজেকেই জানাতে চাইছেন তাঁর জেগে ওঠাব আশ্চর্য বৃত্তান্ত! বহু শতাব্দীর নৈঃশব্দ্যের ঝরোখা সবে যাচ্ছে। ভাষা-পৃথিবী আব চেতনা-বিশ্ব ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে; তিনি কাবও লেজুড় বা উদ্বৃত্ত নন— তাঁর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র : এই আশ্চর্য নতুন কথাটি তিনি বোঝাতে চাইছেন। ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে এই মৌলিক ঘোষণা করছেন : আমি নারী! আমি আগে মেয়ে পরে মানুষ নই— আমি মানবী।

কীভাবে নিজস্ব-এক-ঘরের কথা ভাবতে শিখেছে নাবী, এই বৃত্তান্ত তো এক প্রজন্মের নয়। দুর্ভেদ্য অন্ধকারেব মধ্যে এক চিল্তে আলোর ইশারা যিনি প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি তো কোনো-এক পূর্ব-মাতৃকা। এমনও হতে পারে, সেই পূর্বমাতৃকা যে পুবোপুরি নতুন কিছু দেখছেন— এই সত্য হয়তো তাব নিজের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। তবু এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসে ভোরের প্রাক্-মুহূর্তেব অরুণিমাও তাৎপর্যবহ কেননা তাতে অন্তত এই সংকেতটুকু থাকে যে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। নারী ঊনমানবী নয়, পুরুষেব ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপব তার বেঁচে থাকা নির্ভর করে না, আশাপূর্ণার সুবর্ণলতার মতো নির্মমভাবে প্রতারিত হয়েও অস্তিত্বহীন বারান্দার স্বপ্ন দেখে যায় : এই বার্তা পৌঁছে দেওয়াই তো প্রাথমিক পর্যায়ের নারী-পাঠকৃতির বড়ো যুদ্ধ-জয়। তবে তারও আগে কিছু কথা আছে। যে-সমাজে বিয়েই মেয়েদের সর্ব ধর্মসার, বইয়ের জগৎ নিষিদ্ধ এলাকা (যেহেতু পড়াশোনা করলেই অনিবার্য ভবিতব্য বৈধব্য), শৈশবে ও কৈশোরে বাবা (কিংবা কৈশোরেই খাঁচা-বদল হয়ে গেলে মালিক অন্য

কেউ)— যৌবনে স্বামী, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে ছেলে প্রভু হওয়াতে সেই সমাজে নারীর না ছিল জমি না, ছিল আকাশ। মেয়েদের জানানো হয়েছে, 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই/তবে না তার গুণ গাই।' কেউ তো তাদের জন্যে অক্ষরের রাজ্য খুলে দেয়নি, তা হলে বর্ণমালা না-জেনে ওরা ভাষা-পৃথিবীতে পাড়ি দেবে কী করে? গার্গী বা খনার গল্প মেয়েদের কাছে যদি বা করা হত, দুটো কাহিনি থেকে উঠে আসত পুরুষের নির্মম ক্রূরতা। ছলে-বলে-কৌশলে মেয়েদের মানুষ হয়ে ওঠার অধিকার কেড়ে নেওয়া হত কীভাবে তার বিবরণ জেনে মেয়েরা পড়াশোনার নাম শুনলেই শিউরে উঠত . এমন অনুমান করা যেতেই পারে।

তাই যেদিন অন্তঃপুরে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের বার্তা পৌঁছাল, কোনো-কোনো পূর্বমাতৃকা বর্ণমালা শিখলেন পড়লেন লিখলেন— তা সামাজিক ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণই ছিল। ছিল বিদ্রোহের বিপ্লবের আত্ম-উদ্ভাসনের বিরল মুহূর্ত। নিরেট নিথর সময়ের বুক চিরে শতদল ঝর্নার ধ্বনি অবশ্য জেগে ওঠেনি সেই কুহেলি-লীন প্রাক্-আধুনিক রাতে— তা অবশ্য সম্ভবও ছিল না— কিন্তু 'নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি' কেউ কেউ শুনতে পেয়েছিল। সেই অন্তঃপুরিকারা লোকচক্ষুর অগোচরে পিতৃতন্ত্রের ঔপনিবেশিক দাপটের মধ্যেই পুরুষের ভাষা-চেতনা-বিশ্বাস-সংস্কারের একবাচনিক পরম্পরায় হস্তক্ষেপ করার পদ্ধতি শিখে নিলেন। কেননা এটাই ছিল নিজস্ব অস্তিত্ব অনুভবের একমাত্র পথ। বহু কোরক নিশ্চিতভাবে ফুটে উঠতে-না-উঠতে ঝরে গেছে অসংবেদনশীল পুরুষ-প্রভুর নিষ্ঠুর পীড়নে। এক কদম এগোতে-না-এগোতে তিন কদম পিছিয়ে গেছেন কত নিঃসঙ্গ পূর্বমাতৃকা। তবু এত সীমাহীন পারিবারিক ও সামাজিক সন্ত্রাস সত্ত্বেও ইতিহাস থেমে থাকেনি। নারী-পরিসর কাকে বলে, অবদমিত মেয়েরাই তা অজস্র পরাজয় ও পিছিয়ে-আসার মধ্য দিয়ে ক্রমশ বুঝে নিয়েছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ পুরুষ-সর্বস্ব জগতে মেয়েদের জন্যে একেবারেই ছিল না। সমাজ-সংস্কারক মনীষীদের ধারাবাহিক উদ্যমের ফলে জগদ্দল পাথর নড়তে শুরু করল। মেয়েদের জন্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রকৃতই ছিল যুদ্ধ-জয়ের মতো। অন্তঃপুরিকারা অবশ্য সম্পূর্ণ উনিশ শতক জুড়েই দীপায়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। যাঁরা নিজেদের চেষ্টায়, আগ্রহে সাক্ষর হয়েছেন এবং বই পড়ার মতো বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন— তাঁদের তো প্রথম লড়তে হয়েছিল অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে তা অনেকটা পরিমাণে ছিল নিজেরই বিরুদ্ধে দুরূহ যুদ্ধ। এঁদের সাহস ও ধৈর্য অতুলনীয়। পড়তে-পড়তে যখন সম্ভাবনার উদ্ভাসিত জগৎ তাঁদের কাছে উন্মোচিত হলো, অবধারিত ভাবে তাঁরা এলেন লেখার সম্মোহনী পরিসরে। পিতৃতন্ত্রের চোখে 'মেয়েমানুষের লেখা' কতখানি তাচ্ছিল্যের বস্তু ছিল এবং কী হত এইসব লেখার সাধারণ পরিণতি— রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' কিংবা আশাপূর্ণার 'সুবর্ণলতা' তার দৃষ্টান্ত। বহু সন্তানের জননী হয়েও স্ত্রী যখন স্বামীর চেহারাও ভাল করে দেখতে পেত না, সেই আমলের কোনো নারী কোন্ চোখে তাঁর অবরুদ্ধ জগৎকে দেখতে পেতেন— তারই নিদর্শন হিসেবে রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন'কে গণ্য করা চলে। মেয়েরা দেখতেন তাঁদের বাস্তবকে, সেই বাস্তবের অনুলিপি তৈরি করতে

গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারতেন 'চারিদিকে মোব একি কারাগার ঘোর।' কিন্তু 'ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর, ওরে কী গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির কর'— এমন উচ্চারণ সম্ভব হয়নি বহু বহু দিন পরেও। যেহেতু আবশ্যিক আত্ম-বিনির্মাণের পক্ষে সামাজিক ইতিহাসের মন্থর গতি ছিল সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক।

ফলে দু'একটি বিচ্ছিন্ন আলোর রেখা সত্ত্বেও মেয়েদের কোনো নিজস্ব উপনিবেশ কৃষ্ণ মহাদেশের নিবেট স্তব্ধতাকে প্রত্যাহ্বান জানাতে পারে নি। তবু ইতিহাসের গতি থেমে থাকে না; রাত্রির সবচেয়ে অন্ধকাব প্রহরই ভোরের পূর্বযাম বলে নিরবয়ব পিণ্ডাকার জান্তব অস্তিত্বের 'অনুপস্থিতি' থেকেও ক্রমশ ঘোষিত হয মানবী সত্তাব উপস্থিতি। অসূর্যম্পশ্যা নারীসমাজও নতুন ঊষার খবর মনের গভীরে পেয়ে সচকিত হযে ওঠেন। আলোর বহুস্বর তাঁদের কাছে প্রকাশ দাবি করে। পড়ার জগতে প্রবেশাধিকার যখন অর্জিত হলো, অক্ষরের অপ্রতিরোধ্য আমন্ত্রণে মেয়েরা একটু-একটু করে দুরূহতর লেখার জগতে 'পা' বাড়ালেন। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক , তা যতখানি বাস্তব ক্রিয়া ততটুকু প্রতীকী ক্রিয়াও। অন্তেবাসী মেয়েরা যখন নিজেদেব চিনতে ও বুঝতে শুরু করলেন, তাঁদের অবচেতন মনে আত্মকথা লেখার তাগিদ আপন সত্তাব উপস্থিতি ঘোষণার জন্যেই ক্রমশ জোরালো হযে উঠছিল। যাঁদের বাহির অন্তরাশ্রয়ী আব অন্তর্লোক বহির্বাশ্রিত, তাঁদেব ঘিরে-থাকা পুঞ্জীভূত নীরবতাই বাঙ্ময। তাঁরা যখন আপন কথা লিখলেন, তাতে অন্তত পিতৃতন্ত্রের অতিব্যক্ত মোহর-খচিত সাহিত্যিকতার কোনো ছাপ রইল না। কোনো সাজানো কথা বা অলঙ্কৃত বাক্ নয়, আটপৌরে ঘরোয়া কথায় অভিজ্ঞতার বযান তৈরি হলো। এই তো বার্ত-কথিত শূন্যবিন্দু লেখা, 'সাহিত্য'-এর প্রতিস্পর্ধী হয়েই তার প্রকাশ। তাব সর্বাঙ্গে নৈঃশব্দ্যের শৈলী ; অন্যভাবে বলা যায়, পরিচিত বা পূর্বনির্ধারিত সমস্ত শৈলীব নৈঃশব্দ্যই অন্তেবাসী মেয়েদের আত্মকথায় দেখি আমরা।

উনিশ শতকে মেয়েদের আত্মকথা লেখার পাট শুরু হলো ; বিশ শতকে স্বভাবত তার বিস্তার ঘটেছে। তবে সেই যে পিঞ্জরে-বসা-শুক পাখির কথকতা শুরু হয়েছিল তার চরিত্রগত কোনো বদল ঘটল না। পিঞ্জরের পরিধি অনেক বড়ো হয়েছে, তাতে শুকপাখির সীমাবদ্ধ ওড়াউড়িও দেখা যাচ্ছে ; কিন্তু পিঞ্জরের বোধ অটুট রয়ে গেছে। শেকলটা দৃশ্যমান নয়, তবু অদৃশ্য হলেও তা যে অকাট্য এই অস্বস্তিকর উপলব্ধি অস্বীকার করা যাচ্ছে না। রাসসুন্দরী থেকে বেগম রোকেয়া অবধি নারী-প্রগতির শতবর্ষব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ কি আসলে শতবর্ষব্যাপী নিঃসঙ্গতারই দহন-কথা নয়! এবং তারও পরে, অন্তেবাসী বেবী হালদার যখন নিজের কথা লেখে কিংবা নির্বাসিত প্রান্তিক জনপদ বরাক উপত্যকায় আলোকপ্রাপ্তা ও সংগ্রামী কবি-অধ্যাপিকা অনুরূপা বিশ্বাস আত্মকথা লেখেন— তাতে তো পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে আসা সত্ত্বেও পিঞ্জরের অমোঘ উপস্থিতিই স্বীকৃতি পায়। এভাবে যখন বিনোদিনীর কথা পড়ি কিংবা মনোদার বিবরণ, তাদের ছায়াবৃতা অস্তিত্বের গ্লানি ও যন্ত্রণা আমাদের করুণা উদ্রেক করেই ফুরিয়ে যায় না। আমাদের বহু বিজ্ঞাপিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রকৃত অন্দরমহল থেকে নিরুচ্চার ধিক্কার ও দীর্ঘশ্বাস যেন আগুনের হল্‌কার মতো পুড়িয়ে দিয়ে যায়। পাশাপাশি

রয়েছেন আশালতা, পূর্বজাদেব তুলনায় যিনি অনেক বেশি আলোকিত কক্ষপথে পরিক্রমা করেছেন। নিজস্ব-এক-ঘবেব জন্যে আকুতিকে প্রকাশ করাব উপযোগী ভাষা খুঁজে নিতে হয়েছিল রাসসুন্দরীকে ; আত্মজীবনীর স্থাপত্য নির্মাণে তিনি প্রকৃত আদিমাতৃকা। প্রচ্ছন্নেব আখ্যান রচনার আর্তি তাঁব জীবনকে ঔপন্যাসিকতায় উত্তীর্ণ করুক কিংবা না-ই করুক— সাধাবণের অসাধাবণত্ব তাঁব শূন্যবিন্দু লিখনে প্রথম মূর্ত হয়ে উঠেছিল। গার্হস্থ্যের দৈনন্দিনে যেসব অসংখ্য সেবাবিধাযিনী নারী প্রজন্মের পবে প্রজন্ম ধবে নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত সন্তর্পণে মুছে গেছেন, তাঁদেব সেই আত্মগোপন কবে থাকা আব চূড়ান্ত আত্মনিবাকবণেব বয়ান তো নিষ্কর্ষ-গর্ভ শূন্যেরই বিস্ফোরণ।

রাসসুন্দরী অন্তত 'আমাব জীবন' কথাটি ভবসা কবে লিখতে পেরেছিলেন ; নিজের পরিচয় তাঁকে গোপন কবতে হযনি। কিন্তু নারীমাংস-লোলুপ পিতৃতন্ত্রের নিশ্ছিদ্র পীড়নে মনোদাকে আত্মগোপন কবতে হযেছিল। নামগ্রাসী পবিচযগ্রাসী মর্যাদাগ্রাসী অবস্থানেব বযান তো বিশেষ অর্থে শূন্যবিন্দু লেখাবই আবেক দৃষ্টান্ত। এ প্রসঙ্গে ধ্বনিসাম্যে প্রায় একই নামের অধিকারী আবেক নাবীব কথা আমাদেব মনে আসছে। তিনি মনোদা দেবী। নাবীব বয়ানেব অন্য আবেকটি ধবন তাব বাল্যস্মৃতিতে লক্ষ্য কবি যে, বালিকা বযসেই পিঞ্জববদ্ধ নারীর গণ্ডিহীনতা নির্দিষ্ট হয়ে যায। নটী বিনোদিনীর আত্মবিলুপ্তির বিববণও নিজস্ব এক ঘব না-পাওয়ার এবং ঘরেব মবীচিকায় প্রতাবিত হওযার বিষাদ-ধূসর পাঠকৃতি। সব লড়াই জেতা যায় না, হয়তো বা সব লড়াই ঠিকমতো কবাও সম্ভব হয় না। বিনোদিনীব নাবীসত্তাও শিল্পীসত্তা মর্দিত-লাঞ্ছিত হযে মরুপথে হাবিয়ে গেল ; মনোদাব ক্ষেত্রে অবশ্য জৈবিক তাড়নার বাধ্যবাধকতা ছিল। জৈবিক বাস্তবকে চিরদিনই এড়িয়ে যাওয়া হযেছে ; ফলে নারীসত্তা ও নারীপরিসর সম্পর্কিত আলোচনা অনিবার্য ভাবে অসম্পূর্ণ রযে গেছে। মনোদাব আত্মকথা এবিষয়ে কিছু ইশাবা দেয আমাদের। শিক্ষার বিস্তার যত হল, মেয়েদের জগৎ নতুন চেতনায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। বেগম রোকেয়া এই উদ্‌ভাসনে আস্থা রেখে সক্রিয় হয়েছিলেন। একই সঙ্গে সামাজিক সক্রিয়তা ও লেখা দীপায়ন প্রক্রিয়াবই আদর্শ অভিব্যক্তি। বেগম রোকেয়ার উপন্যাস তাই তাঁর ছদ্মবেশী আত্মজীবনী। এই নিরিখে, বঙ্গীয় সংস্কৃতির উত্তাপ-কেন্দ্র থেকে কার্যত আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত প্রান্তিক বরাক উপত্যকায় সংগ্রামী-নারী-সংগঠনের অগ্রণী সক্রিয়তাবাদী-কবি অনুরূপা বিশ্বাস বেগম রোকেয়ার উত্তরসূরি। 'নানারঙের দিন' নামে তাঁর আত্মকথা বুঝিয়ে দেয় নারীর নিজস্ব জগৎ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অখণ্ড মানববিশ্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধ নেই কোনো।

আশালতা সেনও নিজস্ব প্রত্যয়ে জ্যোতির্ময়ী, আরেক জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতোই। লেখা তাঁর অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছিল। প্রাগুক্ত বরাক উপত্যকায় ছিলেন সুপ্রভা দত্তও, যাঁর দিনলিপির কিছু অংশ প্রকাশিত হওয়াতে জেনেছি— সব-দিক-দিয়ে পিছিয়ে-থাকা অঞ্চলেও কেঁপে উঠেছিল নৈঃশব্দ্যের ঝরোখা— রবির কর পশেছিল শান্ত নিরুদ্যম অন্তঃপুরেও। কিন্তু সুপ্রভার উত্তরসূরিদের ব্যাখ্যাতীত অনীহা ও রক্ষণশীলতার জন্যে তাঁর দিনলিপির সামাজিক স্বর

উন্মোচিত হলো না। তাতে আবও একবার প্রমাণিত হলো, মৃত্যুর বহুকাল পরেও নিজের ভাষা চেতনা-বিশ্বাস-প্রতিবেদনে নারীর অধিকার স্থাপিত হয় না। পরিচারিকা হয়েও বেবী হালদার আত্মপ্রকাশ করতে পারল অথচ কুলবধূ হয়েও বহু ধী-সম্পন্না নারীর বয়ান রয়ে গেল অবগুণ্ঠন ও যবনিকার আড়ালে— এর কাবণ কি এই যে, শেষ পর্যন্ত নারীর আত্মকথার স্থাপত্য স্বীকৃত হতে পাবে কেবল সহৃদয় কোনো পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতায়!

এইসব কথা লিখছি যে-উপলক্ষে তা হলো, আত্মপ্রচার-বিমুখ গবেষিকা ড. দূর্বা দেব মেয়েদের আত্মকথার তন্নিষ্ঠ মূল্যায়ন করে 'আত্মজীবনীর স্থাপত্য' নামে বই লিখেছেন। এর আদিরূপ ছিল এম. ফিল ডিগ্রির জন্যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গবেষণাসন্দর্ভ। ঘটনাচক্রে আমি ছিলাম গবেষণা-নির্দেশক। পরে দূর্বা আমারই তত্ত্বাবধানে নারী-পাঠকৃতি সম্পর্কিত ভিন্ন-একটি বিষয়ে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি ডিগ্রিও পেয়েছেন। এম.ফিল সন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত নতুন করে লিখেছেন দূর্বা ; নিরবচ্ছিন্ন পাঠ-অভিজ্ঞতায় অর্জিত অনেক নতুন উপাদান সম্বলিত নতুন তিনটি অধ্যায়ও যোগ করেছেন। আমার বিশ্বাস, যৌক্তিক বিশ্লেষণে ঋদ্ধ এই বইটি রসজ্ঞ মহলে আদৃত হবে।

প্রথম অধ্যায়

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না

আত্মজীবনী : নির্যাস

জীবনের পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে নিজের বিবর্তনগত অভিব্যক্তির ধারাটিকে ফুটিয়ে তোলার নামই আত্মজীবনী। সহজ কথায় বলতে গেলে, ব্যক্তিজীবনের ধারাবাহিক অনুপুঙ্খ বিবরণের পাশাপাশি অন্তর্জীবনের পরিচয়ই হল আত্মজীবনী। আত্মজীবনী আসলে আত্মবিনির্মাণ, নিজের পরিচিত তথ্যের সাহায্যে নিজেরই অজ্ঞাতপূর্ব পরিসরের পুনর্নির্মাণ। এ বিষয়ে মহাজন উক্তি রয়েছে : "Our life is a diary in which we intend to write a story but write another"। সবার জীবনে তা হয়তো সত্য নয়। কেউ হয়তো বিশেষ একটা সময়ে নিজেকে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেকে খুঁজে নিতে আগ্রহী হন, আত্মআবিষ্কারে সচেষ্ট হন, লিখতে অগ্রসর হন নিজের জীবনকাহিনি, খুঁজে নিতে চেষ্টা করেন 'পশ্চাতের আমি'-কে। তাই বলে আত্মজীবনী শুধুমাত্র অতীত স্মৃতির রোমন্থনই নয়, বড় আমি ও ছোট আমির দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তির দ্বিরালাপিক উচ্চারণ, হওয়া আর হয়ে-ওঠার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতিবেদন। সেখানে সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে মানুষ তার ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের ছবি খুঁজে নিতে আগ্রহী হয়— যে ছবি সে রেখে যেতে চায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ; নিজেকে তুলে ধরতে চায় উত্তরসূরিদের কাছে অথবা শুধুই আত্মতৃপ্তির জন্যে। অন্যান্য সাহিত্যের মত আত্মজীবনীরও একটা বিশিষ্টতা আছে।

প্রথমত আত্মজীবনীতে জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ থাকে। **দ্বিতীয়ত,** লেখকের জীবনের কোনো না কোনো তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে আত্মজীবনীতে। **তৃতীয়ত,** জীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে মনের মধ্যে একটা সম্পূর্ণতার ভাব জেগে ওঠে। **চতুর্থত,** আত্মজীবনীতে মানুষ আত্ম-আবিষ্কাবে সচেষ্ট হয়। **পঞ্চমত,** আত্মজীবনীর চমৎকারিত্ব নির্ভর করে আত্ম-উপলব্ধি ও অনুভূতির উপর, ঘটনা সংগ্রহের উপর নয়। **ষষ্ঠত,** লেখাটা ব্যক্তিজীবনগত হলেও তৎকালীন সমাজজীবনও চিনে নেওয়া যায়, চিনে নেওয়া যায় তার পরিবেশ, পরিচিতি ও পরিসরকে। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে আত্মজীবনীর মূল কথা হল, জীবনের চুলচেরা বিশ্লেষণ, যেখানে সচরাচর আত্মসংকোচনের কোনো অবকাশ নেই। অকপট স্বীকারোক্তি এ জাতীয় রচনার অন্যতম অঙ্গীকার। যদিও শর্তপালনের দায়রক্ষা ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব হয়ে ওঠে অনেকের কাছে। তাই আত্মকথার ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য আত্মগোপন। যতটুকু বলা শোভন, যতটুকু শালীন ঠিক ততটুকুই বলা। কখনো ব্যক্তির ভয় কখনো বা সমাজের, কখনো সমালোচনার কখনো বা সম্মানহানির ভয় মিথ্যের মুখোশে আড়াল করে রাখে প্রকৃত সত্যকে। [illegible] এ বাজনীতিব

পেছনে একদিকে ক্রিয়াশীল প্রতাপের কৌশল এবং অন্যদিকে সহজাত স্বভাববোধ। এদিক থেকে তসলিমার ভাষ্য ব্যতিক্রমী উদাহরণ। অনেকেই বলেন, 'বড্ড খোলামেলা রাখ-ঢাক নেই'— এই রাখ-ঢাকই তো আত্মগোপন করার, সত্যকে চাপা দেবার শতাব্দীপ্রাচীন কৌশল— আর অধিকাংশ আত্মকথাতেই তা আয়ত্তীকৃত। তসলিমার অভিযোগ অনুযোগ কঠোর ভাষায়, ভয়ঙ্কর এবং অপ্রিয় সত্য উচ্চাবণ নির্দ্বিধায়— যা উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকেও অনেকেবই বিশ্বাসের মাত্রা অতিক্রম করে যায়।

আত্মজীবনীর মতো স্মৃতিকথা বা ডায়েরিও ব্যক্তিগত রচনা। তথাপি স্মৃতিকথা বা ডায়েরির সঙ্গে আত্মজীবনীর মূলগত পার্থক্য আছে। ডায়েরি হল দিনলিপি, বিচ্ছিন্ন এবং বিশেষ ঘটনার প্রতিচ্ছবি, আত্মপ্রকাশের সেখানে কোনো সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ জীবনব্যাপী আত্মপ্রকাশের সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত ডায়েরিতে থাকে না। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—

> 'আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম, তাহলে তাতে করে হোত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তাহলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।'[১]

স্মৃতিকথায় পরিপার্শ্বের প্রাধান্যের পাশাপাশি টুকরো ঘটনা বা ছবি তুলে ধরা হয়। সেখানে লেখকের অবস্থান থাকে প্রচ্ছন্নতার আড়ালে। ববীন্দ্রনাথও বলেছেন 'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে'। অন্যদিকে আত্মজীবনী হল, জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য, জাতির সমাজ ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। যেখানে কখনো দেশকালের চিত্র ফুটে ওঠে, পাশাপাশি ব্যক্তিজীবন আর সমাজ জীবন একীভূত হয়ে স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করে।

প্রকৃতপক্ষে আত্মজীবনীব অভিনবত্ব বা সার্থকতা আত্মউপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে জীবনী রচনার অনেককিছু স্থিরীকৃত হয় ঘটনা সংগ্রহের উপর। সুকুমার সেনের মতে "পাঠ্যবস্তুর রসের বিচারে জীবনী ও আত্মকথা ভিন্ন স্বাদেব [illegible] আত্মকথা মধুরতর! ... জীবনী ও আত্মকথা যেন আমচুরের ও কাঁচা আমের অম্বল। ব্য[illegible] দুটির মধ্যে রসের গুণাগুণ যেমনই, কাঁচা আমের অম্বলে জিভের ও দাঁতের আরাম বোধ হয় বেশি।"[২] জ্ঞাতব্য বিষয়, সংগৃহীত তথ্য সংযোজন করে জীবনী লেখা গেলেও আত্মজীবনী লেখা সম্ভব নয়। তাই বলে আত্মজীবনী শুধুমাত্র ইতিহাস নয় আবার ধারাবাহিক জীবনকথাও নয়। আত্মজীবনী হল, সত্তার হয়ে-ওঠার কাহিনি, না-বলা কথার বাণী। সেখানে নিজেকে জানা যদি উপযুক্ত গুরুত্ব অনুযায়ী উপস্থাপিত হয়, তবেই তা সার্থক। যে জীবন নানা বর্ণে, নানা রসে ফলবান হয়ে ফুটে ওঠে, নিজস্ব অনুভূতি, বিশ্বাস, আদর্শকে তুলে ধরা হয় যেখানে, সে জীবনের কথাই তাঁর মুখ থেকে শুনতে পাই আমরা যার মধ্য দিয়ে তাঁকে জানা যায়, চেনা যায়, উপলব্ধি করা যায়। তবে ব্যক্তিগত সুখস্মৃতি, শোকসন্তাপ, প্রেম-ভালোবাসা, হতাশা-নৈরাশ্যকে এড়িয়ে আত্মকথা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

আত্মজীবনী আসলে আত্মবিনির্মাণ (Self-deconstruction)। সত্তা মূলত দ্বিবাচনিক, অপরসত্তার উপস্থিতি আমাদের চেতনাকে যেভাবে আলোড়িত করে, সে-অনুযায়ী আমরা তাৎপর্য অর্জন করি। সত্তার চেতনার জগতে প্রবেশের জন্য আত্মকথার সাহায্য অপরিহার্য। কেননা দর্পণ অন্তত মিথ্যা আশ্বাস দেয় না।

দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে আত্মজীবনী লেখা হয়েছে। কেউবা প্রিয়জনের অনুরোধে কেউবা বিগত দিনের কথা নাড়াচাড়া করার তাগিদে, আবার কেউ শুধুমাত্র সাহিত্য রচনার জন্যে আত্মজীবনী লিখেছেন। জানাতে চেষ্টা করেছেন আজকের হয়ে-ওঠা কথককে যে সময়ের হাত ধরে এক-পা দু-পা করে কতটা পথ পেরিয়ে এসেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকের ধারণাতেই ছিল না যে তাঁদের বয়ান সমাজ ইতিহাসের মূল্যবান আকর হিসেবে কখনো বিবেচিত হতে পারে। হারিয়ে-যাওয়া দিনের কাহিনিকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অনামিজনেরা তাঁদের অব্যক্ত বয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন, তাই দিয়ে আমরা আমাদের পথপ্রদর্শিকা পূর্বসূরিদের জানতে পারি। সেইসঙ্গে তাঁদের পরিসর, তাঁদের সময়, সমাজ, নিজস্ব নির্মিতিকে বিনির্মিত চিন্তা-চেতনার আলোকে বুঝতে পারি, পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটি খুব একটা প্রাচীন নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' প্রথম প্রকাশিত আত্মজীবনী, যদিও দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকাশিত না-হলেও প্রথম লিখিত আত্মজীবনী। দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র আত্মজীবনী রচনার মধ্য দিয়ে সমাজচিত্রকে তুলে ধরেছেন যার থেকে আমরা ব্রাহ্মসমাজের একটা সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাই। আর মহিলাদের কথা যদি ধরি, তা হলে সারদাসুন্দরী দেবী, নিস্তারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, সুদক্ষিণা সেন, নটী বিনোদিনী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, মনোদা দেবী, যাঁদের জীবন স্থবির নয় তাঁরা আত্মজীবনী রচনা বা জীবনের টুকরো ছবি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ-সংসারে নারীর অবস্থানের স্বরূপ স্পষ্ট করে তুলেছেন। নিজের কথা বলার মধ্য দিয়ে আমার 'আমি'-কে তুলে ধরার একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন নিজস্ব বয়ানকেন্দ্রিক রচনার নামকরণের মধ্যে। নামকরণের ক্ষেত্রে পুরুষদের নিজের কথায় চরিত শব্দটি ব্যবহারের বাহুল্য, নারীর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রমে পর্যবসিত। এর পেছনেও আছে নিয়ন্ত্রিত পরিসর, নিয়ন্ত্রকের অলক্ষ্য ভূমিকা। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা, পদক্ষেপ, সিদ্ধান্তেও এসেছে নতুনত্ব। অতি সাম্প্রতিককালে আত্মকথার নামকরণে এসেছে ব্যঞ্জনা, রূপকার্থের প্রয়োগ। বিশ শতকের শেষে এবং একুশ শতকে শিক্ষার ব্যাপকতা এবং নিষ্পেষণের রাজনীতিতে কিছুটা শিথিলতা হয়তো বা এর মূল কারণ।

প্রতিটি জীবনই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। ব্যক্তির অর্জিত অভিজ্ঞতা সমাজ ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। কেননা সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির একান্ত উপলব্ধি সেই ব্যক্তিবিশেষের চোখ দিয়েই ধরা পড়ে। আর সেই বিশেষ ব্যক্তিটি যদি হন নারী তা হলে তিনি যেমন সংখ্যালঘুত্বের দাবিতে গুরুত্ব লাভ করেন সেইসঙ্গে আমরাও আরো বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠি, অন্দরমহলের আন্তরিক তথ্য বা চিত্র জানার জন্যে। কারণ আমাদের সমাজে নারীর স্থান বিশেষ একটা গণ্ডির মধ্যে। সমাজের অনুশাসন নারীকে করে তোলে কূপমণ্ডুক, ফলে বহির্জগৎ সর্বাংশে তার কাছে হয়ে ওঠে অচেনা অজানা। এমতাবস্থায় স্বাধীন মতপ্রকাশে অথবা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার অথবা ক্ষমতা থেকেও নারী থাকে পুরোপুরি বঞ্চিত। তাদের জীবন অতিবাহিত হয় অন্দরমহলের ঘেরাটোপে কাজকর্ম ও সন্তানপালনের মধ্যে, আর আঁতুড়ঘর থেকে রান্নাঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাদের বিচরণ

ক্ষেত্র। এদিক দিয়ে নারীর লেখা আত্মজীবনী মূল্যবান রচনা হিসেবে বিবেচিত এবং স্বীকৃত। বিশেষ করে নারীবাদ নিয়ে যখন সারা দেশজুড়ে নিবিড় পাঠের আয়োজন চলছে, তখন সেই নারীর নিজস্বনির্মিত দর্পণে প্রতিফলিত আত্মপ্রতিবিম্বের বিশ্লেষণ অবশ্যই জরুরি।

উনিশ ও বিশ শতকে আত্মকথা রচনা করেছেন অনেকেই। সব রচনাকে ছুঁয়ে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তিকে গভীরভাবে জানতে, তার সময় তথা পরিসরকে বুঝতে হাতে গোনা জনাকয়েক ব্যক্তিত্বকে আমি নির্বাচিত করেছি। চেষ্টা করেছি উনিশ ও বিশ শতক থেকে ভিন্ন ক্ষেত্রের ভিন্ন গোত্রের ভিন্ন পরিসরের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজনকে তুলে ধরতে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রথম মহিলা আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দাসী, আছেন রঙ্গনটী বিনোদিনী। মনোদাদেবীকে তালিকাভুক্ত করাব কারণ, নারীর একান্ত আবেগ-অনুভূতিগুলি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায়। যদিও তিনি লিখেছেন 'সেকালের গৃহবধূর ডায়েরি', কিন্তু আক্ষরিক অর্থে ডায়েরির কোনও বৈশিষ্ট্য রচনাতে নেই। রচনাটি মূলত লেখিকার শৈশব অবস্থার স্মৃতিচারণ, অনেকটা আত্মকথন বা আত্মজীবনী জাতীয। প্রসঙ্গত আমি শিলচরে বসবাসকারী সুপ্রভা দত্ত নাম্নী একজন মহিলার ডায়েবিব কথাও পরিশিষ্ট অংশে উল্লেখ করেছি। যার অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছে শিলচরে 'অক্ষরবৃত্ত' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (আশ্বিন ১৪০৩)। এক্ষেত্রে মূলত প্রান্তিক পরিসরেব সীমানা ডিঙিয়ে বৃহত্তর বঙ্গে বার্তা পৌঁছে দেওয়াই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। রয়েছেন রোকেয়া। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকাব যে, রোকেয়া আত্মকাহিনি রচনা করেননি ঠিকই কিন্তু তাঁর বচনায় তাঁর নিজের জীবনের কথা, দুঃখ-যন্ত্রণার কথা, উপলব্ধি-অনুভূতির কথাই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বয়েছে। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নারীর মধ্যে প্রথম আত্মসচেতনতার উন্মেষ ঘটে, কিন্তু তা ক্রমশ সামনে এগোতে এগোতে এক পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতির রূপ ধরে রোকেয়ার সময়কালে। কাজেই রোকেয়াকে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। তিনি নারী-আন্দোলনের সেনানী, নারী-প্রগতির অন্তহীন যুদ্ধের বীরাঙ্গনা রমণী, নির্যাতিতার প্রতিবাদের শক্তি, আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে উদ্যত শানিত বর্শাফলক। মনোদা কন্যা আশালতাকে অন্তর্ভুক্তির কারণ বিশ শতকের রাজনৈতিক মহিলা নেত্রী তিনি। পল্লিবাংলার ঘরে ঘরে দেশপ্রেমের উন্মাদনা সঞ্চারে এ মহিলার জীবনপাঠ নারীর সত্তা ও সংগ্রামিক পরিসরকে চিনতে সাহায্য করে। ভিন্ন অবস্থানে থেকে মা ও মেয়ের বয়ানকেন্দ্রিক সত্তার নির্মিতিকে জানার কৌতূহল থেকেই এ নির্বাচন। আর অতি সাম্প্রতিক কালের বেবী হালদার একজন পরিচারিকা। প্রান্তিক পরিসরে অবস্থানরত এই নারীব্যক্তিত্বেব আত্মকথা আমাদের নিম্নবর্গীয় সামাজিক বিন্যাসের এক ভিন্ন স্মারক। সমাজ-সংসারের পরিসরকে বিনির্মাণবাদী ভাবনার আলোকে অবলোকন করতে এই আত্মকথা অত্যন্ত জরুরি। রাসসুন্দরী বিনোদিনীর পর বেবীর আত্মকথা সাম্প্রতিককালের সামাজিক চালচিত্রের এক আকর্ষণীয় দলিল। আর অনুরূপা বিশ্বাস তো একজন স্বনির্মিত সত্তা। 'জল দাও শেকড়ে আমার' — অনুরূপাকে নিয়ে আলোচনা তো শেকড়েরই অনুসন্ধান। বরাক উপত্যকার নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা, সর্বোপরি সমাজ-সংসারে তাঁর বহুমাত্রিক পরিচয় তাঁকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র। তিনি অনুকারী নন, হয়ে উঠেছেন অনুকরণীয়।

এ পর্যন্তই আমার আলোচনার বিস্তৃতি, আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিমিত নির্যাস। এই নির্যাস

নিঙড়েই আমি দেখতে চেয়েছি, দেখাতে চেয়েছি— অন্দরমহলে নারীর চিত্রকে, তাঁর বহির্বিশ্বে পদার্পণের তাড়নাকে এবং হয়তো বা কিছু প্রাপ্তির আনন্দকে ; চিহ্নায়ক পরিচয়কে অতিক্রম করে, নারীব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও তাঁর সত্তাকে, জীবনযুদ্ধের সৈনিক হয়েও অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামকে, সত্তা ও অপরতার দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনে অতিক্রান্ত সময়কে।

নারী : পূর্ব পরিপ্রেক্ষিত

নারীর আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনার আগে বঙ্গীয় সমাজের প্রেক্ষাপট কেমন ছিল, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'সেই দেশ সভ্য যেথা রমণী পূজিতা'— এ বাণী প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতেব ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে কতটুকু প্রযোজ্য তা জানার জন্যে অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা প্রয়োজন।

ইতিহাসের বহমান ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বঙ্গীয় তথা ভারতের নারীসমাজ দূর অতীত থেকে অবস্থান করছেন বিশেষ একটা গণ্ডির মধ্যে। পুরাকালে যম নামক প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রকার বলেছেন—

"পুরাকল্পেতু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনস্তথা॥"[৩]

(পুরাকালে নারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন, বেদেব অধ্যাপনা এবং সাবিত্রীবচনে অধিকার ছিল)। মৌঞ্জীবন্ধন উপনয়নের একটি বিশেষ চিহ্ন নির্দেশ করত আর সাবিত্রীবচন বলতে গায়ত্রীমন্ত্র বোঝাত। কাজেই বোঝা যায়, বৈদিক যুগে নরনারী নির্বিশেষে সকলেরই সম্মান ও মর্যাদা ছিল। বেদের ভাষায় স্ত্রীজাতিকে বলা হত নারী অর্থাৎ নেত্রী। তাঁরা স্বামীর সঙ্গে দেবপূজা ও যজ্ঞ করতেন। কন্যার শিক্ষালাভ হত পিতৃগৃহে আর যৌবনে নিজস্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী স্বামী নির্বাচনের অধিকারও থাকত। বিশ্ববারা, ঘোষা, গোধা এমন বিশেষ নারীরা সভা-সংসদে যোগ দিতেন। মদালসা, আত্রেয়ী, সুলভা, শবরী নামা বিদূষী মহিলার নামও শোনা যায় পৌরাণিক যুগে। আর বৌদ্ধযুগের সুজাতা, মহাপ্রজাপতি, অম্বপালী, সংঘমিত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধতাপসীগণও জনসমাজে সম্মানিতা ছিলেন। তাঁদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু তাঁরা সবাই ছিলেন ব্যতিক্রম, সর্বসাধারণের প্রতিভূ নন। তবে অবস্থানগত তারতম্য যে ছিল না তা সত্য নয়। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত সংখ্যক নারীর সামনেই খোলা ছিল। লক্ষণীয় যে, বৈদিক যুগে নারীর অবস্থা অন্যান্য যুগ অপেক্ষা উন্নত হলেও সন্তানের জন্মসংক্রান্ত বিষয়ে কন্যা অপেক্ষা পুত্রই অভিপ্রেত ছিল। ঋগ্বেদে স্পষ্ট উল্লেখ না-থাকলেও বিবাহকেন্দ্রিক মন্ত্রোচ্চারণে পুত্রসন্তান লাভের প্রার্থনায় কন্যাসন্তানের কোনো উল্লেখ নেই। অথর্ববেদের দুটি সূক্তে স্পষ্ট করে পুত্রসন্তান প্রার্থনার কথা আছে। সংহিতার যুগ পর্যন্ত পুত্রসন্তানের প্রতি অধিকতর আগ্রহ থাকলেও কন্যাসন্তানকে অবহেলা করা হয়নি। ঋগ্বেদে দেখা যায়, নারীর নৈতিক ত্রুটির বিচারে কঠোর মনোভাব ছিল না। নারীপুরুষ নির্বিশেষে একই নীতি গ্রহণ করা হত। শিক্ষিত নারীদের মধ্যে অনেকে দীক্ষান্তে গুরুগৃহেও বাস করতেন। সময়ের গতিতে নারীদের পক্ষে গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষালাভ কঠিন হয়ে ওঠে, এমনকী পরিবার ভিন্ন অন্য কোনো শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভেও বাধা আসে। এভাবেই জ্ঞানীগুণী শিক্ষকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে পিতৃগৃহে বন্দিনী করে

রাখার চেষ্টা চলতে থাকে। নারীশিক্ষার পথ রুদ্ধ হবার ইতিহাসে তাই প্রথম ধাপ। পরবর্তী সময়ে যখন মানসিক অবরোধের সঙ্গে যুক্ত হল শারীরিক অবরোধ, তখন থেকেই নারীর শিক্ষার দ্বার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

শাস্ত্রের নজিরও প্রমাণ করে, নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল। তাই শিক্ষিত নারী সম্পর্কে বলা হত— "স্ত্রিয়ঃ সতীঃ তা উ যে পুংসঃ আহুঃ"[৪] অর্থাৎ নারী হয়েও সে পুরুষ। এমনকি অবরোধে রাখার চেষ্টাও চলতে থাকে ব্রাহ্মণের যুগ থেকে। কাজেই অন্তঃপুরবাসিনী নারী ক্রমেই বন্দিনি নারীতে পরিণত হতে থাকেন। সোমযাগে আছে— 'বজ্র বা লাঠি দিয়ে নারীকে মেরে দুর্বল করা উচিত যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির ওপরে তার কোনো অধিকার না থাকে'।[৫] স্পষ্টই বোঝা যায়, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যেই নারীকে স্বামীর অধীনে থাকতে বাধ্য করা হত। এই মানসিকতার ফলে গুপ্তযুগের ভাস্কর্যে লক্ষ করা যায়, লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন। এভাবে ক্রমশ নারী অসম্মানিত হতে থাকেন রামায়ণ, মহাভারত থেকে পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিতে। নারীর পরিচিতি হয় 'নারী নরকের দ্বার'। ষোড়শ শতাব্দীতে নব্যস্মৃতি রচিত হয়, রচনাকার স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। রঘুনন্দন বা জীমূতবাহনের মতো শাস্ত্রকারেরা সেখানে পুরুষের শিথিলতা বা স্বাধীনতাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন যেখানে নারীসমাজকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে পিতৃতন্ত্রের প্রতাপকে নিরঙ্কুশ করার জন্য আয়োজিত রীতিনিয়মের কঠোরতাই পেয়েছিল বিশেষ প্রাধান্য।

বাস্তবিক পক্ষে প্রথমযুগে নারী পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন না ঠিকই, তথাপি নারী তখনো ব্যক্তি ছিলেন, বস্তুতে পরিণত হননি। তারপর সমাজে সুযোগগ্রাহী শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্যই নারী উত্তরোত্তর শুধুমাত্র পূর্বেকার অধিকার থেকে বঞ্চিতই হলেন না, ভোগ্যবস্তু ও পণ্যদ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হলেন। নারীর এ পরিণতির জন্য যে-সমাজ দায়ী তার নাম পিতৃতন্ত্র। পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব এবং নারীর হীনাবস্থার জন্য এঙ্গেল্‌স অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তি-মালিকানা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবই প্রধান কারণ। অন্যদের মতে ঘটনাচক্র দায়ী।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি মনে করত। কাজেই বিবাহ-পরবর্তী সমাজে স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার ফলে পিতার বাড়ি তাঁর সাহায্য, সেবা ও অন্যান্য কর্ম থেকে বঞ্চিত হল। দেখা যায়, সে-ক্ষেত্রে কন্যার পিতার কন্যামূল্য দাবি করার সুযোগ ছিল। এই রীতি নারীকে যে পণ্যদ্রব্য করে তুলেছিল, এরকম ইঙ্গিতও রয়েছে বৈদিক সংহিতা যুগের মন্ত্রটিতে—

"অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ।
অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যা মিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনযামি নব্যম॥"[৬]

বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও বলা হয়েছে 'নারী পণ্যদ্রব্যের মত'। স্ত্রীকে বাজি রেখে পাশা খেলার কথা রয়েছে মহাভারতে। অথচ মনুসংহিতার এক জায়গায় আছে—

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তুন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"[৭]

এমনি বিপরীতধর্মী চিত্র আমরা নানাস্থানে দেখতে পাই। নারীর অবস্থান সম্বন্ধে এক স্থানে

দেখি— 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' অর্থাৎ নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়। আবার শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে একদিকে আছে—

''কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ''[৮]

অথবা

''তালেব্‌ল এল্‌মে ফবিজাতন্‌ আলা কুল্লে মোসলেমিন্‌ ও মোসলেমাত।''[৯]

(অর্থাৎ পুত্রের মতই কন্যাকে শিক্ষা দিতে হবে, যত্নের সঙ্গে পালন করতে হবে।)

অন্যদিকে তেমনি আছে নারীর পক্ষে বিবাহ হল উপনয়ন, পতিগৃহে বাস হল গুরুগৃহে বাস এবং পতিসেবা হল বেদাধ্যয়ন। অর্থাৎ নারীব বেদপাঠের বিকল্প হল বিবাহ করে পতিগৃহে পতির সেবা করা। স্মৃতিশাস্ত্রেও রয়েছে 'পতিসেবাই নারীর পরমধর্ম', 'পতির পুণ্যে তার স্বর্গবাস, পাপে নরক'। এ-ক্ষেত্রে স্পষ্টতই বোঝা যায়, নারীর কোনো স্বাধীনতাই স্বীকার করেনি পুরুষ। তার একমাত্র পরিচয় সে জায়া অথবা জননী বা গৃহিণী এবং পুত্রের জননীর পরিচিতিতেই তার সার্বিক সার্থকতা। এমনকী তাব সামাজিক মূল্য সংসারে তার নির্বাক ভূমিকা ও সেবাপরায়ণতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তারপরও এসব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সাহস অর্জন করতে পারেনি নাবী। কারণ ঔপনিবেশিকৃত মনেব ধারণাকৃত সত্য হল, উত্তম নারী সে-ই 'যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয এবং স্বামীর কথার ওপরে কথা বলে না'।[১০] মনুও তো নবম অধ্যায়ের ১৬ এবং ১৭ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন— সৃষ্টিকর্তা 'তাদের মধ্যে যৌন আবেগময় প্রেম, অলঙ্কারপ্রীতি, অপবিত্র কামনা, ক্রোধ, মিথ্যাচার, ঈর্ষা এবং কদাচার প্রোথিত করে দিয়েছেন'। কাজেই 'তাদের স্বভাবসিদ্ধ দুশ্চরিত্রতার জন্য তাদের খুব সাবধানতার সঙ্গে প্রহরা দিয়ে রাখা উচিত— বিশেষতঃ তাদের স্বামীর কর্তব্য তাদের বিশেষ প্রহরায় বাখা, কারণ স্বামীর প্রতি তারা স্বভাবতই বিশ্বাসহন্ত্রী।' নারী সম্পর্কে এ কদর্য উচ্চারণ শালীনতার মাত্রাকে অতিক্রম করে যায়। নারী-অবস্থিতির চিত্র কতটা ভয়াবহ, নারী সম্পর্কিত ধারণা কতটা অরুচিকর হতে পারে তার ব্যাখ্যা বাহুল্যমাত্র। ৫৮৫ খ্রিঃ Macon নগরে খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকগণের আলোচনার বিষয় ছিল নারীরা মানবীয় জীব না অন্য কিছু।[১১] কূটকৌশলজাত এই মানসিকতা থেকেই নারীর প্রতি ঘৃণ্য মনোভাব গড়ে উঠেছিল বঙ্গীয় তথা ভারত বা অন্যান্য দেশে।

সমাজের এই কঠোর অনুশাসন বিশেষ করে যে-সমাজ নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখেছিল সেখানে সৎপথে জীবিকার্জন প্রসঙ্গ প্রহেলিকামাত্র। সেইসঙ্গে ছিল বহুবিবাহ প্রথা অথবা পুরুষের যথেচ্ছ পরনারীসম্ভোগের অধিকার যা সমাজের দৃষ্টিতে দোষমুক্ত ছিল— এমতাবস্থায় অনেক নারী গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হত। ফলস্বরূপ তার ভাগ্যে জুটত সমাজের ঘৃণা আর অবজ্ঞা। তাই বলে কুলবধূর অবস্থাও যে খুব একটা ঈর্ষণীয় ছিল তা বলা যায় না। কেননা সামাজিক ও মানবিক মর্যাদার দিক থেকে সে ছিল স্বামীর ছায়ার অনুগামিনী। এর অতিরিক্ত কিছু আশা করা তার পক্ষে অন্যায়, অপরাধ ; এই ছিল সমাজব্যাপী ধারণা। এর ওপরে সমাজপতির কঠোর কুটিল অনুশাসনে অবগুণ্ঠন আর অবরোধপ্রথাই সতীত্ব ও কুলমর্যাদার পরাকাষ্ঠা হিসেবে দেখা দিল। তদুপরি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা মেয়েদের একেবারে সর্বনাশের অতল গহ্বরে পৌঁছে দিল।

অন্তঃপুরে নারীর বন্দিজীবনের রীতিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলা হত 'অবরোধ প্রথা'। প্রিসিলা চ্যাপম্যানের বর্ণনায় অন্তঃপুরের অবস্থা ছিল এরকম—

> "The apartments for the women, dominated by, "The Zenanah" are studiously secluded the grantings or shutters with small air holes, serving not simply as a protection from the heat, but rather as a prison security, through which none can penetrate, to search into the sad scenes of misery resulting from the pervertion of heaven's greatest blessing."[১২]

এমনি যখন নারী অবস্থিতির চিত্র, তখন ব্যক্তিস্বরূপে নিজেকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় অথবা আত্মমুক্তির তাড়নায় পিঞ্জরাবদ্ধ নারী বাইরে বেরিয়ে আসতে প্রাণের তাড়না বোধ করলেন। নারীর এই আত্মসচেতন মনোভাব কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই প্রথম দৃষ্টিগোচর হল। আর চেতনার জগতে নারীর এই যে পরিবর্তন তা মূলত কিছু কল্যাণকামী পুরুষের হাত ধরে, যা প্রতীচ্যের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়েরই অনিবার্য ফল।

১.৩. নারী : বিদ্যোপার্জন

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত গৃহস্থ ঘরের হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের স্থান ছিল অন্দরমহলে। তখনকার সমাজ ছিল স্ত্রী-শিক্ষার প্রচণ্ড বিরোধী। সমাজে প্রচলিত ছিল বিভিন্ন প্রথা— বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, বহুবিবাহ। সাধাবণ মানুযের বিশ্বাস ছিল মেয়েদের জীবনে শিক্ষার ফল বৈধব্য অথবা নৈতিক পতন।

প্রথম দিকে স্ত্রী-শিক্ষা ছিল অন্তঃপুরকেন্দ্রিক। খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগেই উনিশ শতকে শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, অন্তঃপুরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে বহির্মহলে। ১৭৮০ খ্রিঃ Eliza Fay কলকাতায় আসেন। লক্ষণীয় যে, সে-সময় কোনো ভদ্রঘরের মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। স্পষ্টই বোঝা যায়, অন্দর ছেড়ে সদরে বেরিয়ে আসার অনুমতি তাদের তখনও মেলেনি। তারপর ১৭৯৯ খ্রিঃ রেভারেন্ড মার্সম্যান-এর স্ত্রী হ্যানা মার্সম্যান কলকাতায় আসেন। ১৮০৭ খ্রিঃ তিনি বাঙালি খ্রিস্টান মহিলাদের জন্য একটি স্কুল শুরু করেন। এ ব্যাপারে তাঁর চেষ্টা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করে। ১৮১৯ খ্রিঃ 'Female Juvenile Society গঠিত হয়। এই নারী সমিতিই বাঙালি মেয়েদের জন্য প্রথম এদেশে বিদ্যালয় স্থাপন করেন কলকাতার গৌরীবাড়িতে। স্কুলে ছাত্রীদের বাংলা মাধ্যমে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮২৪ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় 'সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ইন্ ক্যালকাটা অ্যান্ড ইটস্ ভিসিনিটি' এই সংস্থার স্কুলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মিস কুক্, পরে যিনি মিসেস উইলসন্ হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর চেষ্টায় শোভাবাজার, কৃষ্ণবাজার, মল্লিকবাজার, ঠনঠনিয়া, মির্জাপুর ও কুমারটুলি প্রভৃতি স্থানে ১০টি অবৈতনিক নারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মূলত কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনই এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৮২৫ খ্রিঃ কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলার উদ্যোগে 'ক্যালকাটা লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' প্রতিষ্ঠিত হল। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহ এবং যে সমস্ত অঞ্চলে স্কুল নেই সেখানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা। ১৮৪৭ সালে বারাসতে প্যারীচরণ সরকার, নবীনকৃষ্ণ

মিত্র, কালীকৃষ্ণ মিত্র একযোগে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৮ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে আসেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি ১৮৪৯ সালে অভিজাত ঘরের প্রায় ২০টি মেয়েকে নিয়ে স্কুল খোলেন। স্কুলটির নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল', পরবর্তীকালে তা 'বেথুন স্কুল' নামে সুপরিচিত হয়। বিদ্যালয়ে কার্যের সময়সীমা ছিল সকাল ৭টা থেকে ৯টা অবধি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কন্যা সৌদামিনী দেবীকে এ স্কুলে ভর্তি করেন। এ সম্পর্কে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন— 'আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।'[১৩] ঈশ্বরগুপ্ত এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লেখেন— 'কামিনীরা পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং স্থিরতা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠা হইতে পারে। অতএব তাহারা বিদ্যাশালিনী হইলে সাংসারিক লোকযাত্রা নির্বাহসূত্রে অতিশয় মঙ্গল হইবেক ...।'[১৪] আবার ১৮৫০-এর দশকের গোড়াতে প্রকাশিত 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় তাঁরই লেখনীতে ফুটে ওঠে বিরূপ মন্তব্য—

'যতসব ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে সবে
এবার এ বি শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে
* * *
আর কি এবা সাজি হাতে
সাঁঝ সেঁজুতির ব্রত গাবে'

ঈশ্বরগুপ্তের সমর্থন ও বিরোধিতা উভয়ক্ষেত্রেই নারীর সম্বোধনে রক্ষণশীল মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকেনি। তাঁর কাছে নারীর পরিচয় কামিনী, সাংসারিক লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য তার ততটুকু শিক্ষাই সমর্থনযোগ্য, যাতে তার কামিনী পরিচয় থাকবে অটুট, অক্ষুণ্ণ। এর বাইরে পাঠনির্দিষ্ট অতিক্রান্ত শিক্ষায় ; যেখানে ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনের প্রচেষ্টা, সেখানে তাঁর শ্লেষাত্মক সম্বোধন 'ছুঁড়ি'। মূল কথা হল— নারীশিক্ষা, নারীর স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকৃত ঈশ্বরগুপ্তের মন-মানসিকতায়। আর এ ভাবনার প্রতিফলন নারীর প্রতি বিভিন্ন অভিধায়। শুধু তিনিই নন, পাশাপাশি অন্যান্য রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গের মনোভাবও অনুকূল ছিল না। ''লোকে বলিতে লাগিল এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল। মেয়েগুলা কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না'। নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিশে বলিতে লাগিলেন, 'বাপরে বাপ, মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে। এক 'আন' শিখাইয়াই রক্ষা নাই। চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন, করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে?''[১৫]

স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন ভূম্যধিকারী সভাও। পরিবর্তন-বিরোধীরা ভূম্যধিকারী সভা থেকে রসিকলাল সেনকে বহিষ্কৃত করেন বিদ্যালয়ে বালিকা প্রেরণের অপরাধে। অপ্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গের এ ধরনের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে ধীর গতিতে। মেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, এ ধারণা ধীরে ধীরে তাঁদের মন থেকে মুছে যেতে থাকে এবং মেয়েদের শিক্ষার স্বপক্ষেও এই সময়ে বহু রচনা সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে দেশীয় প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৮৬১ খ্রিঃ থেকে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রচনাকালও একই সময়ে। ঘটনাবহুল ইতিহাসের পাতায় এ সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬২ খ্রিঃ কেশব সেনের উদ্যোগে 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন ব্রাহ্মরাই। এর ফলে মেয়েদের বিয়ের পূর্বে বা পরে ঘরে বসে বিদ্যার্জনের সুযোগ ঘটে। ১৮৭০ খ্রিঃ কেশবচন্দ্র সেন 'ভারত সংস্কার সভা' স্থাপন করেন। এই সভাব আনুকূল্যে ১৮৭০ খ্রিঃ ১লা ফেব্রুয়ারি 'স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। কিন্তু সরকারি সাহায্যের অভাবে বিদ্যালয় চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে; এমনকী একসময় বিদ্যালয়টি বন্ধও হয়ে যায়। এদিকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বেনিয়াপুকুর লেনে ৫ জন ছাত্রী নিয়ে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে'র কাজ দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না। তারপর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে বিদ্যালয়টি পুনরায় স্থাপিত হল। এবার নাম পরিবর্তন করে রাখা হল 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়'। বেথুন স্কুল সেসময় ছিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার বিচার্ড বার্থ বেথুন স্কুল ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়কে সম্মিলিত করার একটি প্রস্তাব করেন। স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ব্যক্তিবর্গও এই প্রস্তাবে আগ্রহ দেখান। এব ফলেই ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট উভয় বিদ্যালয়ের সম্মিলনের ফলে বেথুন স্কুল উচ্চতর শিক্ষায়তনে পবিণত হয়। এ সময়েই কাদম্বিনী বসু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ছাত্রী হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযে সমাবর্তন উৎসবের অনুষ্ঠানে উপাচার্য স্যার আরবুনট বলেন—

> 'Kadambini Basu, obtained very high marks in Bengali, very tolerable marks ın History and even in exact science— a subject which is not usually considered to be congenial to the female intellect'।[১৬]

শোনা যায়, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাবাঈ নামে এক মারাঠি ব্রাহ্মণ মহিলা কলকাতায় এসে একটি স্কুল খোলেন, নাম ছিল 'মহাকালী পাঠশালা'। এরপর মহারানী তপস্বিনী ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আপার সার্কুলার রোডে মহারানী স্বর্ণময়ীর ভবনে 'মহাকালী পাঠশালা' স্থাপন করেন। এই পাঠশালা হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্মানুযায়ী শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে স্কুলটিতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩০, দশ বছরের মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে ৪০০ তে গিয়ে পৌঁছায়। ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে স্কুল ভবনটি স্থানান্তরিত হয় সুকিয়া স্ট্রিটে। সেসময় মাতাজির আমন্ত্রণে স্বামী বিবেকানন্দ স্কুল পরিদর্শন করে বলেছিলেন— 'The movement is in the right direction.'[১৭]

ভগিনী নিবেদিতা ভারতে পদার্পণ করেন ১৮৯৮ সালে। কিছুদিন পর নিবেদিতার সহকর্মী হিসেবে আসেন ক্রিস্টিনা। একটি স্কুল খোলার পরিকল্পনা হয়, যেখানে বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করে স্ত্রী-শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা সঞ্চারিত করে দেওয়ার অভিপ্রায় থেকেই নিবেদিতা স্কুলের জন্ম ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর। প্রথমদিকে এ স্কুলের কোনো নাম ছিল না। পাড়ার লোকেরা 'নিবেদিতা স্কুল' বলত। পরে নিবেদিতা নিজেই এর নামকরণ করেন The Ramakrishna School for Girls।

তাঁর মৃত্যুর পর ১৯১৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে এর নাম হয় The Ramakrishna Mission Sister Nivedita Girl's School, আর ১৯৬৩ সালের ৯ আগস্ট থেকে এ স্কুলের নাম হয় Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girl's School, যার বর্তমান ঠিকানা ৫নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৩।

১৮৯৭ সালটি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বছর। কাবণ এসময়েই প্রেসিডেন্সি কলেজে Co-education বা সহশিক্ষা চালু হয়। এফ. এ ক্লাসের প্রথম বর্ষে ভর্তি হন দুজন ছাত্রী— অমিয়া রায়, চারুলতা রায়। ক্লাসে তাদের পদার্পণে বিরূপ সমালোচনার ঝড় ওঠে। জল গড়ায় বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্নর পর্যন্ত। যদিও সহশিক্ষা ব্যাপারটি সে-সময় চালু হয়নি। তবে অজানা পথের বদ্ধ দরজায় আঘাতের শব্দ শোনা যেতে থাকে তখন থেকেই।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর বেথুন কলেজে অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনে সরোজিনী নাইডু ছিলেন অন্যতম বক্তা। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল, শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে নারী যেন পুরুষের সহযাত্রী হয়। নারীশিক্ষা সম্পর্কে অন্যত্র তাঁর বক্তব্য ছিল—

> 'Educate your women, and the nation will take care of itself, for it is true today, as it was yesterday and will be to the end of human life that the hand that rocks the cradle is the power that rules the world."[১৮]

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে একটি পরিসংখ্যান থেকে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয় যে, উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলাদের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষা জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে।

উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলাদের শিক্ষার হার[১৯]

বর্ণ	শিক্ষার শতকরা হার	ইংরেজি শিক্ষিতের হার
ব্রাহ্মণ	৫.৬	.১
কায়স্থ	৮.০	.৪
বৈদ্য	২৫.৯	.৮
ব্রাহ্ম	৫৫.৬	৩০.৯

এদিকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এন্ট্রান্স পরীক্ষার পরিবর্তে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। ইতিমধ্যে শিক্ষার আদর্শ নিয়ে যে সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সবগুলো গতানুগতিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ফলস্বরূপ স্ত্রী-শিক্ষা ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন, এ ভাবনা পাঠ্যতালিকা ও পরিচালন ব্যবস্থা থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। বিশ শতকের প্রথমদিকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। তার মধ্যে একটি হল—

(১) স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার জন্য আর কোন কোন বিষয়ে সুব্যবস্থা প্রয়োজন।

(২) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর কী ধরনের সমস্যা সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয় এবং তার থেকে উত্তরণের উপায় কী। তবে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নবদিগন্ত রচিত হয় ১৯৩২-৩৩

খ্রিস্টাব্দে। কারণ এ সময়ে মহিলা কলেজের সংখ্যা চার থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ছয়-এ। সে-সময় কী দ্রুতগতিতে নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছিল তা স্পষ্ট হয় একটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে—

১৯৩৮-এ বেথুন কলেজে পাশের হার[২০]

এম. এ — ৩৭ জন

বি. এ — ২৪৭ জন

আই. এ— ৫৫৯ জন

লেডি অবলা বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পরিদর্শক হিসেবে আসেন এবং তাঁর প্রতিবেদনে জানান, 'বাংলাদেশের মধ্যে বেথুন কলেজ একমাত্র প্রথম শ্রেণীর মহিলা কলেজ'।[২১] ১৯৩৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকারি কলেজগুলির মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থান ১ম এবং বেথুন কলেজ ২য় স্থান লাভ করে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দেব মহাযুদ্ধের তাণ্ডবের আঘাত ভারতবর্ষেও লাগে। এই অস্থিরতায় শিক্ষাব্যবস্থাতেও বিপর্যয় আসে। ১৯৫০ সালে প্রতিশ্রুতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, নিরক্ষরতা দূরীকরণে কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। ১৯৮৬ সালে গৃহীত হয় Education for Women's Equality— নারীর সমতার জন্য শিক্ষা। সাক্ষরতা প্রকল্প চালু হয় ১৯৯০ সালে। উদ্দেশ্য গ্রামীণ নিরক্ষর মহিলাদের জাগবণ। বয়স্ক শিক্ষা অভিযানের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৮ সালের সরকারি হিসেব অনুযায়ী সাক্ষর পুরুষের সংখ্যা ৩৪.৮০ লক্ষ এবং মহিলা ৪৪.৪৮ লক্ষ।[২২] দেখা যায় এর ফলে নবসাক্ষর মেয়েদের মধ্যে সচেতনতাবোধের উন্মেষ ঘটে।

১৮ মে ২০০০ সালে বেথুন স্কুলের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে অমর্ত্য সেন বলেন— 'নারী শিক্ষার অভাব দেশের অগ্রগতির প্রধান বাধা'।[২৩] দেখা যায় যেখানে নারীশিক্ষার হার ১৯৯১ সালে ছিল ৩৯.৩ শতাংশ, সেখানে ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪ ১৬ শতাংশ।[২৪] এই অগ্রগতির পেছনে সর্বশিক্ষা অভিযান, মিড-ডে মিল প্রকল্পের সহায়তা আছে। 'মহিলা সমস্যা' নামে অন্য আরেকটি প্রকল্প রূপায়িত হতে চলেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগবি শিক্ষার ব্যবস্থা, স্ত্রী আবাস তৈরি হচ্ছে।

নীচের পরিসংখ্যানের দিকে চোখ ফেরালে নারী শিক্ষার অগ্রগতির ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে।[২৫]

	সন		মহিলা কলেজের সংখ্যা
সমগ্র ভারত	১৯৯০-৯১	———	৮৭৪
	১৯৯৫-৯৬	———	১১৪৬
	১৯৯৯-২০০০	———	১৫২০

স্ত্রীশিক্ষা ও মুসলমান সমাজ :

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুসলমান রাজত্বের সমাপ্তি ও ইংরেজ রাজত্বের সাড়ম্বর সূচনা মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ উনিশ

শতক পর্যন্ত শিক্ষা বা ভাবধারা থেকে মুসলমান জনেরা দূরত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। ১৮৬৩ তে মহামেডান লিটারারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৮৭৩-এ হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্রদের অনুপ্রবেশ ঘটে। তখন থেকেই মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু তা শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রেই। নারীদের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন একেবারে উদাসীন, হয়তো বা ইচ্ছাকৃত অনাগ্রহী।

১৮২২ সালে শ্যামবাজার অঞ্চলের একজন মুসলমান মহিলা 'বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিদ্যালয়ের জন্য বালিকা সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজের পাড়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন'।[২৬] বিনয় ঘোষ আবো বলেছেন—

> "কলকাতা শহবের মুসলমান পুরুষবাই যখন ইংরেজদের প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাননি, তখন একজন খ্রীষ্টান মহিলা প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, একজন মুসলমান মহিলাব পক্ষে নিশ্চয় একটি বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু তাই নয়, একজন মুসলমান মহিলা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, মুসলমান নারীর শিক্ষার উদ্দেশ্যে— এটা আরও বিস্ময়কর বলে মনে হয়। এছাড়া মির্জাপুর, এন্টালি, জানবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানরাও দেখা যায়, মিস কুকেব (মিসেস উইলসনের) স্ত্রীশিক্ষাব আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এইসব অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিলেন।"[২৭]

১৮২৩, ২৭ ডিসেম্বর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয় '১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশ ঘন্টার সময় শহর কলিকাতার গৌড়িবেড়ে' 'বালিকাদের বিদ্যাপরীক্ষা'য 'হিন্দু মুসলমানের বালিকা সর্বসুদ্ধা প্রায় দেড়শত পরীক্ষা দিয়াছে'।[২৮]

১৮২৫ সালে 'লেডীজ আসোসিয়েশন'-এর সভানেত্রী হন মিসেস উইলসন। এই সমিতির উদ্যোগে মুসলমান-প্রধান এন্টালি ও জানবাজার অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এমনকী উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম বালিকার পরীক্ষায় অংশ নেবার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৯] উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে খুব কম সংখ্যক মুসলমান মেয়েদের স্কুলে পড়ার খবর পাওয়া যায় সমসাময়িক পত্রপত্রিকায়।

১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকুল্যে স্থাপিত হয় ফয়জুন্নেসা গার্লস স্কুল।

১৮৮১-৮২ খ্রিঃ মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ছিল[৩০]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্রীসংখ্যা	মুসলমান ছাত্রীসংখ্যা	হার
উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	—	—
মাধ্যমিক ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৬	১.১
দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১
দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭,৪৫২	১,৫৭০	৮.৯
শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪১	—	—

আশির দশকে মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কবে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' ও 'ঢাকা সুহৃদ সম্মিলনী'। প্রথম বছর সর্বমোট ৩৭ জন ছাত্রী পরীক্ষায় বসে—১৪ জন উর্দু ভাষায়, ২৩ জন বাংলা ভাষায়। উত্তীর্ণ হয় উর্দু বিভাগে ১২ জন, বাংলা বিভাগে ২২ জন।[৩১]

শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সরকারেরও স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ছিল। শিক্ষিকার জন্যে নানাধরনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী খ্রিস্টান মিশনারিদের শিলচরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বদরপুরের অন্তঃপুরচারী মহিলাদের জন্য 'জেনানা শিক্ষার' দায়িত্ব খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের রোমান ক্যাথলিক মিশনকে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলকাতায় মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ শুরু হয়, কারণ বেথুন স্কুলে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ ছিল না। কাজেই ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম শামসি ফেরদৌস মহলই প্রথম যিনি 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা' নামে একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আদমশুমারিতে দেখা যায়, ৪০০ জন মুসলমান স্ত্রীলোক ইংরেজি জানেন, এর উল্লেখ আছে সাময়িক পত্র 'মিহিরও সুধাকর'-এ

> "আমরা কখনও স্বপ্নে ভাবি নাই ১৯০১ সালের আদমশুমারী আমাদের নিকট ৪০০ (চারিশত) মুসলমান স্ত্রী লোকের ইংরেজী শিক্ষার কথা প্রচার করিবে। এ-কথা প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের কর্ত্তব্য কি? যদি অন্তঃপুরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে আপত্তি কি? যে সব স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার আছে, তথায় তাহাদের ইংরেজী শিক্ষা প্রদানে ক্ষতি কি? কলিকাতার বেথুন স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার নাই। বেথুন কলেজ ছাড়া অন্যান্য স্কুলে তাহারা পড়িতে পারে। বিশেষ আমাদের বালিকা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সর্বোৎকৃষ্ট হয়।"[৩২]

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদের শিক্ষার হার এরকম ছিল[৩৩] :

মুসলমান	৩%
হিন্দু	৯%
বৌদ্ধ	১৬%
য়িহুদি	৪৫%
ব্রাহ্ম	৫৩%
খ্রিস্টান	৭০%

উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা ছিল ৩৮৮৩[৩৪]

মুসলমান	৬ জন
হিন্দু	৪৩৯ জন
দেশীয় খ্রিস্টান	১৮৩ জন
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী	৮৯ জন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলকাতায় আরও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করে বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা খুজিস্তা আখতার বানু ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সোহরাওয়ার্দীয়া বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১৬ সাল নাগাদ অনেকগুলি মুসলিম মেয়েদের স্কুল সরকারি সাহায্য পেতে থাকে। এ ছাড়া সে-সময়ে সরকারের পক্ষ থেকেও মুসলিম মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

তারপর নারীর সমাজিক ও আইনগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংকল্পহেতু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আসেন রোকেয়া। ১৯১১ সালে কলকাতার ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ্ লেনে রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়েল স্কুল স্থাপন করেন। সমস্ত বাধা, বিপত্তি অতিক্রম করে বাঙালি নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন তিনি। তিনি শুধু বাঙালি মুসলিম সমাজেই নন, সমগ্র নারীসমাজের মুক্তি আন্দোলনের আলোকবর্তিকা।

নারী : সংস্কার বিপ্লব, সম-সাময়িক মুখপত্র, সমকালীন সমাজ

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের মূল কথা নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা বা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। সে-যুগে মেয়েরা ছিল জঞ্জাল স্বরূপ, 'বিধাতার সৃষ্টির অপব্যয়', যাকে সমাজের অত্যাচার সহ্য করতে হত নীরবে, এমনকী প্রতিবাদ জানানোর মতো সাহস তার ছিল না, হয়তো বা পরিণামের কথা ভেবেই। সে ছিল সহনশীলতার প্রতীকমাত্র, যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা তার অপরিসীম, কারণ সে নারী। সমাজপতিদের নির্মম বিধানকে যে নিয়ম বলেই মেনে নিত, সে নিয়ম লঙ্ঘন করার উপায় বা সম্ভাবনা সেকালে ছিল না। কৌলিন্য প্রথার বিষময় ফল বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ—এই সামাজিক সমস্যাগুলো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। সেইসময়ে ক্রফোর্ড লিখেছিলেন যে, 'আটদশ বছরের মেয়ের সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ প্রায়শই ঘটত'।[৩৫] ধর্মসূত্রের যুগ থেকেই অল্পবয়সে মেয়ের বিবাহ দেওয়ার রীতির স্বপক্ষে মতামত চলতে থাকে। দৈহিক শুচিতা রক্ষাই এখানে ছিল মূল উদ্দেশ্য। ক্রমে তা প্রথায় পরিণত হয়। মনু ৮ বৎসর বয়সে বিবাহের কথা বললেও পাশাপাশি একটু ব্যতিক্রমী ভাবনার কথাও বলেছেন—'কন্যা বিবাহ-যোগ্য হলেও গুণহীন পাত্রে বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা আমৃত্যু তার পক্ষে পিতৃগৃহে বদ্ধ থাকাই শ্রেয়স্কর' (''কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি। ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছের্ত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥'') (৯.৮৯)। পরবর্তী স্মৃতিকারদের মধ্যে কেউ নগ্নিকা অবস্থায়, কেউ বা দশ, কেউ বা আট এমনকী চার বৎসর বয়সের পর যে কোনো সময়ে বিয়ের কথাও কেউ বলেছেন।

সতী অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাকৃত সতী হওয়ার প্রবণতা কম সংখ্যক নারীর মধ্যেই ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গ সতী হতে বাধ্য করতেন। ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ না থাকলেও অথর্ববেদে পতির চিতার পার্শ্বে পত্নীর শুয়ে থাকার ব্যাপারটাকে 'প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সতীদাহের ঘটনার প্রমাণ আছে। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার ১ম খণ্ডে ৩১৬ অব্দে ইরানের যুদ্ধে একজন ভারতীয় সৈনিকের

মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর সহদগ্ধা হবার কথা Diodorus বর্ণনা করেছেন[৩৬]। স্মৃতিশাস্ত্রকার অঙ্গীরস হারীতও সতীপ্রথার অনুকূলে যুক্তি আরোপ করেছেন। তবে শুধু ভারতেই নয়, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে দাহ করার অনুষ্ঠান ভারত-জার্মান জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রচলিত ছিল। মিশনারিদের লেখায় নিষ্ঠুর এক পিতার পরিচয় রয়েছে সেখানে ১৮০৭ সালে কাটোয়ায় এক হিন্দু তরুণী স্ত্রী প্রথমে সতী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে পরে যখন বাঁচার চেষ্টা করছিল তখন মেয়েটির 'ধর্মভীরু' পিতা মেয়েটিকে মেরে চিতায় ঢুকিয়ে দিতে বলেন, সে অনুযায়ী নির্দেশও পালিত হয়।[৩৭] এমনকী ঢাক-ঢোল-শঙ্খ বাজিয়ে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য তৎকালে মানুষ উপভোগ করতেন। নিঃসন্দেহে এই কুপ্রথা মানবসমাজের নিষ্ঠুর কলঙ্ক। তারপর একসময় এ কলঙ্ক থেকে মুক্তির দিন, সমাজের অবরোধ অবদমনকে অস্বীকার করে এগিয়ে যাবার দিন, অন্যায় নীতি নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানানোর দিনও এগিয়ে এল। নারীদের সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁরা অল্পবুদ্ধি, বিশ্বাসঘাতিনী, অস্থির অন্তঃকরণের অধিকারী—এ সমস্ত অভিযোগ রামমোহন খণ্ডন করেন যুক্তি দিয়ে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের স্বপক্ষে প্রথম প্রতিবাদ সতীদাহের বিরুদ্ধে করেন রাজা রামমোহন রায়। ফলস্বরূপ ১৮২৯ এর ৪ঠা ডিসেম্বর কাউন্সিলে সতীপ্রথা 'Illegal and punishable by the criminal courts'[৩৮] বলে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮৭ সালে দেওয়ালার রূপ কানোয়ার সতী হন, আইন পুনরায় সংশোধিত হয়। তথ্যে আছে, রূপের মৃত্যুর চারমাস আগে সতীদাহে বাধা প্রদান করতে গিয়ে পুলিশকে ২০,০০০ দর্শককে ছত্রভঙ্গ করতে হয়। কারণ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যই শুধু নয়, নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যও সতীদাহে প্রতিফলিত। 'Brief Remarks regarding Modern Encroachment on the Ancient Right of Females according to the Hindu law of Inheritance'[৩৯] রচনায় রামমোহন রায় দেখিয়েছেন যে, যে সমস্ত অঞ্চলে মিতাক্ষরা আইন চালু ছিল সেসব অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় সতীদাহ বেশি। কারণ মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী নারীর প্রাপ্য শুধু জীবিতকালের ভরণপোষণ আর বাংলায় প্রচলিত দায়ভাগা আইনে বিধবাদের স্বামীর সম্পত্তির উপর কিছুটা অধিকার থেকে যায়, ফলস্বরূপ তাকে সতী হাতে বাধ্য করা হয়। তাই রামমোহনের দৃষ্টিতে সতীদাহ হল— 'Suiside and female murder, the most heinous of crimes'[৪০] — দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কোথাও কোথাও সে-সমস্ত প্রথা পালনের প্রবণতা রয়ে গেছে। মূলত এর পেছনে আছে ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। তাই রাজস্থানের রূপকানোয়ারের পর মধ্যপ্রদেশে ২০০২ সালে ৬৫ বৎসরের কুট্রিবাঈ আর ২০০৬ সালের ২৩ এপ্রিল বিহারের ইমামগঞ্জ থানার সীতাদেবী সতী হয়েছেন। আগে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সরবে শ্মশানে সতীদাহ হত, আর এখন হয় ঘরে নিঃশব্দে, নীরবে। এটাই আমাদের সামনে এখন প্রধান সমস্যা। আর আমাদের আন্দোলন এ সমস্ত স্বার্থেরই বিরুদ্ধে। লড়াই শেষ হয়নি, লড়াইয়ের চরিত্র পাল্টেছে মাত্র। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতাকে ঘোচানো সম্ভব না-হলে আন্দোলন বা লড়াই সফল হওয়া সম্ভব নয়।

এ তো গেল সতীদাহের সেকালের এবং একালের কথা। আর সেকালের বিধবাদের অবস্থা যে কী শোচনীয় ছিল, তা বলে শেষ করা যাবে না। বিধবাদের প্রতি সমাজ ও পরিবারের অবহেলা, তিরস্কার তাঁদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অত্যন্ত কঠোর বিধি-নিষেধের

মধ্যে তাঁদের জীবনযাপন করতে হত। তিথি পালন করতে গিয়ে অনাহারে কাটাতে হত। এখানে প্রামাণ্য দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি[৪১] — প্রথম ঘটনাটা সম্ভবত ১৮৮০ সালের।

ছয়/সাত বছরের বালবিধবা মেয়েটিকে ঘরের এক কোণে বসিয়ে মা নিজের হাতে প্রতিদিন খাইয়ে দিতেন। ঘরেব অন্যদিকে ছেলেবা খেতে বসত। তারা মেয়েটিকে তার মাছ কোথায় জানতে চাইলে মা ডালের বড়াকে মাছ বলে দেখিয়ে দেন। দুষ্ট ছেলেরা মাছের কাঁটা দেখালে মা মেয়েকে পবের দিন কাঁটাওয়ালা মাছ দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। পরদিন প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে মা খাবারের চাঙারি ভেঙে বাঁশের চাঁচ দিয়ে চিকন কাঠি তৈরি করে তা ডালের বড়াতে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু এ লুকোচুরি বেশিদিন চলতে পারেনি; মেয়েই একদিন সব কিছু বুঝতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৮৯০ সালের নিঃসন্তান বালবিধবার—১৪ বছর বয়সে বিধবা হয়ে মহিলাটি বাপের বাড়ি চলে আসেন, যখন তিনি ছিলেন গর্ভবতী। মা-বাবার রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য একাদশীর দিনে তার পুকুরে গিয়ে স্নান করা ছিল বারণ। কারণ নির্জলা একাদশীতে পুকুরে গিয়ে মেয়ে যদি লুকিয়ে জল খায় তা হলে নরকবাস হবে। তাই বাড়িতে তোলাজলে স্নান সারতে হত তাকে। ঘটনাচক্রে গ্রীষ্মের একাদশীর রাত্রেই মেয়েটির প্রসববেদনা ওঠে। জলের জন্য মেয়েটি ছটফট করতে থাকে; আগামী জন্মে বৈধব্যের আশঙ্কায় মা একফোঁটা জলও মেয়েকে দিতে পারেননি। বরং সান্ত্বনা দিয়েছিলেন ছেলের মুখ দেখলেই তার তেষ্টা মিটে যাবে। কিন্তু মায়ের এ ভাবনা যে কতটা অমূলক তা প্রমাণিত হয় পরদিন। দ্বাদশীর সকালে মেয়েটি একটি মৃত পুত্রসন্তান প্রসব করে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকে বিধবাদের অবস্থার যে-বিবরণ রয়েছে তাও সজীব এবং জীবন্ত। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে জগৎচন্দ্র গাঙ্গুলির বর্ণনায় আছে—

> "তেরো চোদ্দ বছরের বিধবাদের কষ্ট হতাশা কে দেখতে পারে? গ্রীষ্মকালে যখন পুকুরের জল শুকিয়ে যায়, গাছের পাতা ঝলসে যায় তখন কুসংস্কারের বলে এই মেয়েরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় হাঁপাতে থাকে, অজ্ঞান হয়ে যায়।"[৪২]

মূলত দয়া ও করুণাপ্রার্থী বিধবাদের অধিকাংশই আশ্রিতের জীবনযাপন করতেন। তাই আশ্রয়হীন হবার ভয়েই হয়তো তাঁরা প্রতিবাদ করার সাহস পেতেন না। এই অসহায়, নিরুপায় মানুষগুলোর পক্ষ নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন, বিদ্রোহ করলেন, পাশ হল ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন, যার সাহায্যে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দেওয়া হল। তবে নারীর উন্নতির সবচাইতে বড় কৃতিত্বের দাবিদার ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী লোকেরা। তাঁদের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সংস্পর্শে এসেই নারীর অবস্থার আশাতীত উন্নতি হতে থাকে। তাঁদের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে, চিন্তাধারা পরিশীলিত হয়। আর এ জন্যেই—

(১) যে সমাজে ১২ বৎসর পর্যন্ত কন্যার বিবাহ না হলে সমাজে অচ্ছুৎ হয়ে থাকতে হত, সেখানে বিবাহের ন্যূনতম বয়স বেড়ে গিয়ে প্রথমে ১৪ ও পরে ১৮ তে নির্দিষ্ট হয়।

(২) অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ের পরিবর্তে সিভিল ম্যারেজ (সামাজিক বিবাহ) চালু হয়। আর বর্তমানে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ (আইনী বিবাহ) ভিন্ন বিবাহ স্বীকৃত নয়।

(৩) স্ত্রী-পুরুষে মেলামেশাও শুরু হয় ব্রাহ্মদের উদ্যোগেই।

এদিকে নারীর শিক্ষা তথা সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৮৬৩ -তে স্থাপিত হয় 'বামাবোধিনী সভা'। এই সভা একটি পত্রিকা প্রকাশ করে, নাম ছিল 'বামাবোধিনী পত্রিকা', প্রকাশকাল ১২৭০ বঙ্গাব্দ, প্রথম সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত। বামাবোধিনী সভার ঘোষিত লক্ষ্যে বলা হয়েছিল—

> 'বামাবোধিনী সভাতে স্ত্রীলোকদিগের লেখা সমাদরপূর্বক গৃহীত হইবে এবং যোগ্য বোধ হইলে পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইবে।'[৪৩]

বামাবোধিনী পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল নারীদের সার্বিক উন্নতিসাধন। পত্রিকা প্রকাশকালে সামাজিক কুপ্রথার অবসান হয়নি। এই কুপ্রথাগুলোর সমালোচনায় মুখর হত পত্রিকার একাধিক রচনা। এ ছাড়া ধর্ম, নীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিশুপালন, স্ত্রীশিক্ষা— এসব বিষয়েও আলোচনা থাকত। তবে সব রচনারই লক্ষ্য ছিল নারী এবং উদ্দেশ্য ছিল নারী উন্নয়ন।

উল্লেখ্য যে, আসামেও বামাবোধিনী সভা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে বামাবোধিনী পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হয়।

"আসাম বামাবোধিনী সভা"

আগামী বৈশাখ মাস হইতে উপরি উক্ত নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইবে। আসামবাসিনী স্ত্রী মন্ডলীর মধ্যে জ্ঞান প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য। সভার নিয়জিত বিশুদ্ধ চরিত্র, ভদ্র বংশ জাত এবং প্রাচীন এজেন্ট সকলের দ্বারা অন্তঃপুরস্থ আসামী মহিলাদিগকে বৎসর বৎসর পরীক্ষা করিয়া পুস্তকাদি পুরস্কার দেওয়া যাইবে এবং স্ত্রীলোকের উপযোগী বিষয় সকল চলিত আসামী ভাষাতে লিখিয়া 'বামাবোধিনী' নামে মাসিক পত্র যোগে প্রকাশ পূর্বক যথাসাধ্য স্ত্রীশিক্ষার সাহায্য চেষ্টা করা যাইবে। আশা করি আসামবাসী যাবতীয় কৃতবিদ্য এবং দেশহিতৈষী মহোদয়গণ বামাবোধিনী সভার সভাশ্রেণীভুক্ত হইয়া কোন কার্য্যভার গ্রহণ পূর্বক আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

বিশ্বনাথ, আসাম — এল. কে. দাস এবং কোম্পানী[৪৪]

বামাবোধিনী পত্রিকা ছাড়া অবলাবান্ধব (১৮৬৯), বাঈমহিলা (১৮৭৫), অনাথিনী (১৮৭৫), ভারতী (১৮৭৭), খ্রীষ্টীয় মহিলা (১৮৮১) ইত্যাদি পত্রিকায় মেয়েদের লেখার দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এক, অনেকেই ছদ্মনামে লিখতেন; দুই, মেয়েরা তাঁদের নামের শেষে দাসী বা দেবী, কুমারী বা শ্রীমতী লিখতেন। বিষয়ের মধ্যে প্রার্থনা, শোক, মিলনানন্দ, বিরহ ছাড়া কখনো বা নারীজাতির আদর্শ ও কর্তব্যকেন্দ্রিক প্রবন্ধও তাঁদের লেখায় স্থান পেত। কখনো দেখা গেল, সমকালীন সমস্যা নিয়েও কেউ কেউ প্রবন্ধ লিখছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সমাজের রূপ, অন্তঃপুরচারিণীদের একান্ত ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ ভাবনা ও সমস্যা। কয়েকটি নারী পরিচালিত পত্রিকা সেসময় আত্মপ্রকাশ করেছিল। যেমন বনলতা দেবী প্রবর্তিত 'অন্তঃপুর' (১৮৯৮), সরযূবালা দত্ত সম্পাদিত 'ভারতমহিলা' (১৯০৫) এবং কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' (১৯০৭)।

কিন্তু এ তো গেল শহর কলকাতার কথা। গ্রামবাংলার নারীসমাজ সে-সময় লেখাপড়া তো দূরের কথা, তাঁদের ন্যূনতম অধিকারটুকুও মুখফুটে উচ্চারণ করতে পারতেন না। ছেলের জন্ম

হলে ছেলের মাকে বলা হত 'হীরা বিউনি' (রত্নগর্ভা), আর মেয়ে জন্মালে আঁতুড় ঘরের দরজায় পদাঘাত করে তাঁকে এই পৃথিবীতে অভ্যর্থনা করা হত। গ্রামাঞ্চলের মানুষের ধারণা ছিল—

"পুয়ার যশ মাথে
পুয়ির যশ হাতে"[৪৫]

গারো 'সমাজে একটি প্রবাদ[৪৬] রয়েছে 'Do nok Wagam Gri, Mechik Gisik Gri', অর্থাৎ 'একটি মুরগীর যেমন দাঁত থাকে না, মেয়েদেরও তেমনি কোনো মগজ থাকে না'। অথচ এই গারো সমাজকেই মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়।

কাজেই নারীর জন্য শিক্ষারও কোনো প্রয়োজন নেই। পড়াশোনা, শিক্ষাদীক্ষা কেন্দ্রিক সমস্ত প্রয়োজন শুধুমাত্র ছেলেদের, যেহেতু পুরুষ সংসারের কর্তা, কাজেই বিদ্যার্জন, শাস্ত্রজ্ঞান-এ একচেটিয়া অধিকার শুধুমাত্র পুরুষদের। নারীকে সংসারকেন্দ্রিক কর্মের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে। পুরুষকে সন্তুষ্ট করার সবধরনের বন্দোবস্ত নারীকে করতে হবে। তাকে, রন্ধনপটীয়সী হতে হবে, তাকে স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের তুষ্টির জন্য সতর্ক থাকতে হবে; তাকে সুগৃহিণী, সুমাতা, সুকন্যা হতে হবে। আজীবন দাসত্বের বোঝা বহন করে যেতে হবে। তাকে হতে হবে 'জন্ম হইতে বলিপ্রদত্ত' আর যদি তার আচরণে পান থেকে চুন খসে তবেই সমূহ বিপদ। মিসেস এম. রহমান নিঃসহায় নিরুপায় এই নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

> "তোমরা তাদের সহধর্ম্মিনী গৃহিণী, সঙ্গিনী, সন্তানের মাতা, না নির্ব্বিবাদে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, লাথি ঝাঁটা ও সময়শীরে পাতের মাছটুকু, দুধটুকু পাবার প্রত্যাশী পোষা কুকুর বিড়াল বিশেষ? না প্রমোদের সঙ্গিনী?"[৪৭]

(মিসেস এম. রহমান, জেনানামহফিল)

দেখা যায়, মেয়েরা মায়ের কোল থেকে নাবতে না নাবতেই শুরু হয়ে যেত নিধনযজ্ঞের প্রস্তুতি। কার আগে কে মেয়েকে বলিদান করতে পারেন তার জন্যে ছোটাছুটি। সকলেরই প্রচেষ্টা আট বছরের মেয়েটিকে দান করার জন্য। একান্ত না-পারলে দশের জন্য অপেক্ষা, তা-ও ধরতে না-পারলে এগারোয়। কিন্তু বারোর পরে কিছুতেই নয়, হলেই 'অরক্ষণীয়া' হয়ে সমাজের অচ্ছুত।

কেশব সেনের মা সারদাসুন্দরীর বিয়ে হয় ৯ বৎসর বয়সে, এরপর এক বৎসর বাপের বাড়িতে থেকে দশ বৎসর বয়সে তিনি শ্বশুরবাড়ি আসেন, একথা তিনি নিজেই বলেছেন।

তবে সব মহিলাই নিজেদের আত্মকথা লিখে যাননি। যাঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁরাই প্রদমিত মনোভাবকে আত্মকথারূপে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেকালে কেউ-ই বিদ্যার্জন 'অর্থোপার্জনের নিমিত্ত' একথা বলেননি, হয়তো বা ভাবেনওনি। দু-একজন যদিও বা ভেবেছিলেন কিন্তু বলার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি। এদিক দিয়ে অগ্রণী রোকেয়া। নারীর প্রথাগত ভূমিকার পরিবর্তে কর্মসংস্থানের কথা প্রথম তাঁর মুখেই শোনা যায়। অন্যান্য মুসলিম রমণীরাও তাঁকে অনুসরণ করে নারীর প্রাচীন রূপকল্প সম্পর্কিত ধারণার বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। এর আগে মুসলিম নারী ঘর থেকে বেরুলেও রোকেয়ার মতো প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তা তাদের ছিল না। বিংশ শতাব্দীতেই প্রথম নারীর অধিকার, তাঁদের মর্যাদা নিয়ে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

নারীমুক্তিভাবনা

নারী প্রগতির দুটি অভিব্যক্তি—

(১) নারীমুক্তি (চেতনার স্তরে প্রগতি)

(২) নারীস্বাধীনতা (অধিকারের স্তবে প্রগতি)

নারীমুক্তি নারীর অন্তর্নিহিত চেতনার মুক্তি, আর নারী-স্বাধীনতা হল বহির্জগতে বিভিন্ন দাবি বা প্রাপ্তির ছাড়পত্র। এক কথায়, নারী-স্বাধীনতা আরোপিত। উনিশ শতকে নারী-স্বাধীনতা আসে পুরুষদের প্রয়োজনে, সমাজ সংস্কারকদের চেষ্টায়। আর নারীমুক্তির ঘণ্টা শোনা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর।

সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহরোধ, বহুবিবাহ নিবারণ প্রয়াস, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ইত্যাদি নারীর অন্দরমহলে তথা অন্তরে ঈপ্সিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি যদিও বহিরঙ্গে তথা সমাজদেহে পরিবর্তনের ছোঁয়া ছিল। অন্তরঙ্গে বিপ্লবের স্পর্শ লাগে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে। অথচ সাহিত্যে কোথাও তার উল্লেখমাত্র নেই। পাশ্চাত্যে নারীমুক্তির কথা পঞ্চদশ শতক থেকেই কিছুটা শোনা গেলেও বাংলাদেশে নারীমুক্তির স্ফুরণ ঘটেছিল অনেক পরে এবং কল্যাণকামী পুরুষদের আগ্রহ আতিশয্যে। পুরুষেরা তাঁদের চিন্তায়-চেতনায় সংস্কার চেয়েছিলেন, কোনো বিপ্লব চাননি। আর তাঁদের চেতনাস্থ বাসনাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা, চিন্তাধারার সংস্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

উনিশ শতক পেবিয়ে নারীমুক্তির হাওয়া বিশ শতকেও ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে বাইবে বেরুনোর সুযোগ আসে মেয়েদের জীবনে। আর এ সুযোগ আসে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, ফলস্বরূপ নারীর অবরুদ্ধ জীবনে মুক্তির ছোঁয়া লাগে। বিশ শতকের সূচনাতে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে পুরুষের সহযোগী সত্তা হিসাবে এগিয়ে আসেন মেয়েরা। এই শতকেরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধিজি আহ্বানে জানালেন মেয়েদের। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ নারীর অর্গল ভাঙার এক বৈপ্লবিক প্রয়াস। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের মেয়েদেব সঙ্গে রক্ষণশীল বিধবারাও শুধু আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণেই নয়, সংস্কার অনুশাসনের গণ্ডি ভেঙে কারারুদ্ধ হলেন সরবে। এমনকী শারীরিক এবং মানসিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বিপ্লবী আন্দোলনেও সামিল হতে লাগলেন মেয়েরা। বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে এর আগে মেয়েদের শুধুমাত্র সহায়ক ভূমিকা ছিল। ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় থেকে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিয়ে নেতৃবৃন্দের ভাবনাচিন্তার পাশাপাশি মেয়েরা নিজেদের কঠোর জীবনযাপনের উদ্যোগী করে তুলতে প্রয়াসী হলেন। প্রথমে মেয়েদের এই অংশগ্রহণে পুরুষদের মধ্যে দ্বিধা ছিল। বলেছেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত প্রমুখ তাঁদের আত্মজীবনীতে। ক্রমশঃ নির্ভীকতা, যোগ্যতা, অনিশ্চয়তার জীবন গ্রহণে দ্বিধাহীন মনোভাব প্রমাণ করেছে দেশের জন্যে তাঁদের উদ্যোগ, তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই। এমনকি প্রাণ দিতেও তাঁরা বদ্ধপরিকর। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর মেয়েদের জীবনদৃষ্টি পাল্টে দেয়। রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তাঁরা। ৭০ দশকের মুক্তিসংগ্রামে স্বপ্নলব্ধ তরুণ-তরুণী নতুন সমাজ গঠনে এগিয়ে আসেন, অনিশ্চিত জীবন, গোপন জীবনকে বরণ করে। রাজনীতির চালচিত্রে '৭২-এ নকশালবাড়ি আন্দোলন ভেঙে দেওয়া হয়। জয়া মিত্রের লেখায় ('হন্যমান') রয়েছে সে বিপ্লবের পরিচয়।

শুধুমাত্র বাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই নয়, সার্বিক কর্মকাণ্ডেই মেয়েরা আজ অংশ নিচ্ছেন পুরুষের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে। নিজেদের অধিকাব নিয়েও মুখবিত হচ্ছেন, পুরুষের সমানাধিকার আদায় করে নিতে সংগ্রাম চালাচ্ছেন, সমস্যা সমাধানে তৎপর হচ্ছেন। শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রীব মতে—

"আধুনিক মনোরম বেশভূষায হিন্দুনারীদের রাস্তাঘাটে অবাধ চলাফেরাতেই নারী নিগ্রহের উৎপত্তি।'[৪৮]

অর্থাৎ তাঁর মতে নারী নির্যাতনেব কারণ হল—

(১) মনোরম বেশভূষা

(২) অবাধ চলাফেরা

উৎপত্তি শব্দ ব্যবহারেব দ্বারা স্পষ্ট যে, উনিশ শতকে নারী নির্যাতন ছিল না। যেন সূচনা হল বিশ শতকে বহির্মহলে পা দেবার ফলে। আসলে বক্ষণশীলতার প্রতিভূ শিবেন্দ্র নারায়ণ নারীর বন্ধনমুক্তি, আর স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ জীবন মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁর কাছে বিশ শতকে পরিবারের বাইরের নির্যাতনেব তুলনায় অনেক বেশি শ্রেয়, অনেক বেশি কাম্য বলে মনে হয়েছে উনিশ শতকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ধর্ম ও অর্থের ভিত্তিতে পরিবারের মধ্যে নাবীর উপর চালিয়ে যাওয়া আদেশ নামধারী নির্যাতনকে, অবরোধকে। নারীর প্রচলিত পরিচিতির পরিবর্তন মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি অনেকের, তাই তাঁদের এ ধরনের মন্তব্য নারীকে অবরোধে ফিরিয়ে নেওয়ার এক সুচতুব কৌশল, এক সচেতন প্রয়াস। এত সব বাধা, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দেখা যায়, শতক সূচনায় যেখানে নারীর বিবাহের গড় বয়স ছিল ১৩, সেখানে শতক শেষে নারীর বিয়ের বয়স বেড়ে দাঁড়াল ১৯.২।

নারী-পুরুষ গড় বিবাহের বয়স ১৯০১-৯১[৪৯]

বৎসব	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১
নারী	১৩.১	১৩.২	১৩.৭	১২.৭	১৪.৭	১৫.৬	১৭.২	১৫.৫	১৮.৩	১৯.২
পুরুষ	২০.০	২০.৩	২০.৭	১৮.৬	১৯.৯	১৯.৯	২১.৩	২২.৪	২৩.৩	

তা হলে বিশ শতকের নারীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিক্ষা সচেতনতাকে পাশাপাশি রাখলে আধুনিকা নারীর একটি পূর্ণ রূপ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। এই নারী পুরুষের সহজাত সংস্কার থেকে, রীতিসিদ্ধ চেতনা থেকে মুক্ত, বিচ্ছিন্ন, খোলামেলা এক নারী, যে পুরুষের সহযাত্রী, সহমর্মী হয়ে এক উভলিঙ্গ সমাজ গঠনের দাবি প্রতিষ্ঠায় উদগ্রীব—

"সবার ওপরে সত্য যে মানুষ
তার পাশে মানুষীও যেন ভাল থাকে।
যে রকম সাতরঙা পৃথিবীর প্রতি পরমাণু
ঘাস মাটি বায়ুজল এতদিন পুরুষের ছিল
সমাজ পুরুষ ছিল, এবার উভলিঙ্গ হোক"

— মল্লিকা সেনগুপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছিন্ন শিকল পায়ে

রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন'

(১৮০৯-১৯০০)

"তুমি আমাকে যেমন রেখেছ আমি তেমন আছি
শিকড়ের কোল ঘেঁষে রাঙা বটফলের মতন
তুমি কেমন আছ, কোনওদিন জিজ্ঞেস কোবোনা
এই কথা
আমাকে যেমন রেখেছ, আমি তেমনই আছি
ঠিক তেমন।"

-- অনিতা অগ্নিহোত্রী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ মহিলাই ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন। যাঁবা নিজের চেষ্টায় বা স্বামীর উৎসাহে লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁরাও বই লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, শিখেছিলেন নিজেব অন্তর্নিহিত এক তাড়নাতে। পরবর্তীকালে হযতো বা এই অবদমিত মনোভাবকেই আত্মকথারূপে প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি জীবনই তো অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, ভয়-ভাবনার উপাখ্যান। কিন্তু উনিশ শতকে বাঙালি মহিলাদের মধ্যে কয়েকজনই নিজেদের কথা লিখে রেখে গেছেন। একান্ত নিঃস্ব, হয়তো বা একান্তই আত্মমুক্তির তাড়নায় আপন হতে বাহির হয়ে আপন আনন্দে লেখা ব্যক্তিবিশেষের অর্জিত এ অভিজ্ঞতা আজ সমাজ ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করাব মতো, ওঁরা সবাই আত্মকাহিনি লিখেছেন পরিণত বয়সে, জীবনের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে। অনেক স্মৃতিই তখন তাঁদের কাছে ধূসর, মলিন। তার মধ্যেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোপন থাকেনি তাঁদের হতাশা-নৈরাশ্যের চাপা দীর্ঘশ্বাস। এদিক দিয়ে রাসসুন্দরীর আত্মপ্রতিবিম্ব সামাজিক ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত।

পাশ্চাত্য-সাহিত্যে আত্মজীবনীর মর্যাদা থাকলেও ভারতীয় সাহিত্যে তার প্রচলন ছিল না। যদিও উনিশ শতকে আত্মজীবনী সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারা কিন্তু তা ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবজাত বলেই মনে হয়। আর এখানেই প্রশ্ন জাগে, তাহলে রাসসুন্দরী কি ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন? যে সময় নারীর অক্ষরজ্ঞানই ছিল নিন্দনীয় সে সময়ে রাসসুন্দরীর মত কুলবধূর পক্ষে ইংরেজি শিক্ষণচিন্তা দুঃসাহসিক তো বটেই, অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে

দেবেন্দ্রনাথ গ্রন্থ স্বত্বাধিকার দানপত্রে লিখেছিলেন, 'আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না'। কাজেই আত্মজীবনীর কোন নমুনা তিনি দেখেননি বা সে সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণের সৌভাগ্যও তাঁব হয়নি। সেদিক দিয়ে অদেখা, অজানা এক নতুন শাখা প্রবর্তনার দাবিদার রাসসুন্দরী দেবী।

অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা!

রাসসুন্দবীর জন্ম ১২১৬ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮০৯ খ্রিঃ। সংস্কার আন্দোলনের সূচনা-পর্বেরও আগের মহিলা তিনি ; কলকাতায় তখন মেয়েদের স্কুল খোলার আয়োজন চললেও সেই শিক্ষা আদায়ের দাবি মেয়েদের কণ্ঠে শোনা যাযনি। অন্যদিকে মিশনাবিদের উদ্যোগে পোতাজিয়ায় বাংলা মাধ্যমে ছেলেদের একটি পাঠশালা খোলা হয়েছে। রাসসুন্দরীর পৈতৃক বাড়িতেই ছিল সেই পাঠশালা। তাকে অবশ্য সেকালের অন্যান্য মেয়েদের মতোই জীবন কাটাতে হত—সে কথা তিনি বলেছেন—

> ''তখন সে একদিন ছিল, এখনকার মত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখিত না। বাঙ্গালা স্কুল আমাদের বাটীতেই ছিল। আমাদের গ্রামেব সকল ছেলে আমাদের বাটীতেই লেখাপড়া করিত।''

পবে ঘটনাচক্রে আট বছর বয়সে গুরুজনদের আদেশে বাড়ির সেই পাঠশালায় মেমসাহেব শিক্ষিকার কাছে বসে থাকার সুযোগ আসে। অবশ্য এই আদেশ লেখাপড়া শেখানোব জন্যে নয়, নিজেদের কাজকর্মের সুবিধার জন্য। তাকে সমস্ত দিনই বাড়িব বাইরে ঘাগরা ও উড়ানি পরিয়ে রাখা হত, মধ্যে স্নান-আহার করিয়ে পুনরায় সেখানে রেখে আসা হত, পরে সন্ধ্যার পূর্বে বাড়িতে আনা হত। পরিধেয় অঙ্গবস্ত্রে রাসসুন্দরীর পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের উদারতা ও ভয়হীনতার পরিচয় পাওয়া গেলেও পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেননি। হতে পারে সামাজিক রীতি নিয়মকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। হতে পারে এ ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিক তাগিদও ছিল না। পাঠশালায় তাঁর সামনেই ছেলের দল অক্ষর মটিতে লিখে, সুর করে পড়ার অভ্যাস করত—

> ''তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত।''

তাদের পড়া শুনে রাসসুন্দরী সকলের অজান্তেই কিছুটা আয়ত্ত করলেন। সেই সঙ্গে 'পারসী' (ফার্সি)-ও কিছুটা আয়ত্তে এল। কিন্তু কাউকে তা জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি, পোষণ করে রাখলেন মনের গোপন কোণে। এ পরিবেশ, পরিস্থিতিই রাসসুন্দরীর পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং জনান্তিকে মোটামুটি অক্ষর পরিচয় হয়ে যায়। কিন্তু অসীম অধ্যবসায়ে পড়তে শিখলেও দীর্ঘদিন লিখতে পারেননি তিনি। তারপর নিতান্ত পুত্রের ইচ্ছেতেই তিনি নাকি লেখার অনুশীলন আরম্ভ করলেন। পুত্র এখানে উপলক্ষ মাত্র। তাঁর নিজের অদম্য আগ্রহই তাঁকে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে অনুপ্রাণিত করেছে। পুত্রের লেখা তালপত্রের সঙ্গে মনের অক্ষরের যোগ করে, আবার লোকের কথার সঙ্গে মিলিয়ে দিনের পর দিন মনে মনে পড়ার চেষ্টা করতেন তিনি। ফলস্বরূপ চৈতন্যভাগবত

গুণগুণ করে পড়তে শেখা। আসলে প্রান্তিকায়িত 'অপরসত্তা' হিসেবে নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করার মতো সাহস তাঁর ছিল না—'মনের কথা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, কেহ জানিবে বলিয়া ভয়ে প্রাণ কাঁপিত'।—তাই পুত্রের ইচ্ছের আড়ালে নিজের আগ্রহের আতিশয্যকে লুকিয়ে রাখতে, নিজের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন তিনি। আত্মজীবনী ব্যক্তির বোধ, চেতনা, উপলব্ধি, অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। যেহেতু আত্মজীবনীতে সত্যকে অপ্রিয় করার প্রতিশ্রুতি থাকে তাই আত্মজীবনী লেখা যথেষ্ট দুরূহ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন—

> "Truth naked unblushing truth, the first virtue of more serious history, must be the sole recommendation of this personal narrative."[১]

বাসসুন্দরীব বাসনা ছিল, 'লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব'—কিন্তু উনিশ শতকেব প্রথম দিকে কোনো মেয়ের লেখাপড়া শেখার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না, অধিকারও ছিল না। অনেক কিছুর মতো লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতাই ছিল সবচাইতে বড়ো প্রতিবন্ধক। অন্য সবকিছু মেনে নিলেও শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে রাসসুন্দরী কিন্তু এই সর্বজনীন বিরোধিতাকে মানতে পারেননি। বলেছেন—

> "তখনকাব লোকে বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিল না, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিনসে জড়ভরত, আমাদের কালে এত আপদ ছিল না। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। দিনে দিনে বা আর কত দেখিব। এখন যেমত হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।"

শিক্ষার ফলে মেয়েরা রাজা হযে বসবে—লক্ষণীয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে ভীতি সমাজে বর্তমান ছিল। সাধারণ লোকের আশঙ্কা ছিল শিক্ষার ফলস্বরূপ মেয়েরা বিধবা হবে, সেই সঙ্গে পারিবারিক বিশৃঙ্খলাও দেখা দিতে পারে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত লেখাপড়া-জানা মেয়েদের যে-চিত্র অঙ্কন করেছিলেন, তা তো সমাজে বসবাসকারী এক বিরাট অংশেরই ভাবনা-চিন্তা-মানসিকতার প্রতিফলন। এমনকী শিক্ষিত মহিলাদের সংস্পর্শ থেকে পরিবারকে রক্ষা করার জন্য *'কুলকামিনীগণ আপনাদিগেব তনয়া ও সুসাগগণকে সাবধানপূর্বক রক্ষা করিতেন। যেমন প্রসূতিগণ স্বীয় সন্তানগণকে ডাইন যোগিনী প্রভৃতির নিকটে যাইতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করেন, তেমনি ইহারাও উহাদিগকে দর্শন করিলে আস্তে আস্তে আত্মরক্ষা করিতে যত্নবতী হইতেন।'*[২] এই ভয়েই জ্ঞানদানন্দিনীর মা লেখাপড়া করেছেন গভীর রাত্রে লুকিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে। মেয়েদের লেখাপড়া থেকে এভাবে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য কৈলাসবাসিনী দেবী সরাসরি দোষারোপ করেছেন পুরুষ সমাজকে আর গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থে দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন অংশে উত্তরদাত্রী স্ত্রীলোকটি দায়ী করেছেন 'গতর শোগা মাগি'দের অর্থাৎ অলস প্রকৃতির মেয়েদের।

এমনকী বয়স্ক মহিলাদের কথাবার্তাও শিক্ষাদীক্ষার সপক্ষে ছিল না, তারও প্রমাণ মিলেছে রাসসুন্দরীর লেখায়—

> "বাস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারি বিরুদ্ধ কর্ম জ্ঞান করিয়া, বৃদ্ধা ঠাকুরাণীরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন।"

দেখা যায়, নির্দিষ্ট একটা বয়সের পর মেয়েরা যেন পুরুষের প্রতিনিধি হয়েই অত্যাচারের দণ্ড হাতে তুলে নিয়েছিলেন। হয়তো বা ভেবেছিলেন এতেই হবে কৃষ্টিরক্ষা। মহিলারাও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলতেন। শুধু স্ত্রীশিক্ষা কেন, নারীর যাবতীয় শৃঙ্খল অটুট রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা। কারণ অন্দরমহলের শাসনকর্ত্রী তো ছিলেন তাঁরাই।

রাসসুন্দরী রক্ষণশীল পরিবারের গৃহবধূ। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপ ও আকাঙ্ক্ষার নিগড়কে নিগড় বলে বোধ হয়নি তাঁর, ববং নিয়ম মেনে নিয়েছেন তিনি। একমাত্র পুঁথি পড়ার আকাঙ্ক্ষা দমন করা সম্ভব হয়নি বলেই নীরবে, নিভৃতে গভীর গোপনে সে-চেষ্টায় রত হয়েছেন। অবশ্য এর পেছনে ছিল ভীতি ও আকাঙ্ক্ষার নিরন্তর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রাসসুন্দরীর অপরিসীম একাগ্রতা। তিনি বলেছেন, পুঁথি পড়া আমি ছাড়িতাম না, গোপনে গোপনে বসিয়া পড়িতাম'। পুথি পড়াশোনাই নয়, নতুন যুগের নতুন দিনের চিন্তা-চেতনা, ভাব-ভাবনায় রাসসুন্দরী প্রান্তিকায়িত নারীবর্গের প্রতিনিধি হয়ে নারীসত্তার নতুন দিনের স্বপ্নপূরণের দাবিদার।

বামাসুন্দরী দেবীরও লেখাপড়া শেখার পেছনে ছিল ঐকান্তিক চেষ্টা। রান্নাঘরের হেঁসেল কাঁচামাটির দেওয়ালে আবদ্ধ ছিল। তার উপর কাষ্ঠশলাকা দিয়ে তিনি অক্ষর লেখার চেষ্টা করতেন এবং 'রন্ধন শেষে গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিতেন। আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা যে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলা যায় তার যথার্থ প্রমাণ রয়েছে রাসসুন্দরী ও বামাসুন্দরীব জীবনে।

উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের বিভিন্ন রচনা, তাঁদের চিন্তাভাবনা থেকে মেয়েদের সম্পর্কে সংসার তথা সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাসসুন্দরী সমাজকে দায়ী করেননি, নিজের সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত সময়ে মেয়েদের সুযোগসুবিধা দেখে আহ্লাদিত হয়েছেন—

> "এখনকার মেয়েছেলেগুলা যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার একটি মেয়েছেলে আছে, সে কত যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখায়।"

আমরা জানি, ১৮৬০ সনের আগে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বেথুন স্কুল ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। ১৮৬১ থেকে দেশীয় প্রচেষ্টা শুরু হল। ১৮৬২ সনে 'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা' নামে একটি সভা স্থাপিত হল। ফলে মেয়েরা বিয়ের আগে এবং পরে অন্তঃপুরে বসে শিক্ষার সুযোগ লাভ করল।

১৮৬৮ খ্রিঃ সে-সব মেয়েছেলেদের দেখে রাসসুন্দরী ঈর্ষান্বিত হননি বরং খুশি হয়েছেন, আনন্দিত হয়েছেন। যদিও খুব কম সংখ্যক মেয়ের ভাগ্যেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ঘটেছে, তথাপি মানসিকতার পরিবর্তন যে হতে চলেছে তা-ই তাঁর কাছে অসামান্য রূপে ধরা পড়েছে।

কোন বাধনের গ্রন্থি বাধিল

রাসসুন্দরী লিখেছিলেন আত্মজীবনী, যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন নিজের

ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বকে। আর এজন্যে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হয়েছে নিজেকে। তাই তো আত্মজীবনী আত্মবিনির্মাণের নামান্তর। কিন্তু হঠাৎ করে কেনই বা রাসসুন্দরী আত্মজীবনী লিখতে গেলেন, সে-সম্পর্কে বিশেষ কোনো কারণ উল্লেখ করেননি। ভাবতে অবাক লাগে, জীবনের প্রান্তবেলায় দাঁড়িয়ে আত্মস্মৃতি লেখার পেছনে সত্যিই কি নিজস্ব মনের তাগিদ ছাড়া অন্য কোনো কারণ ছিল না? হতে পারে সমাজের রীতিনীতি ও আচার-আচরণ নারীর স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা, চলন-বলন, কথাবার্তায় যে কঠোর বিধিনিষেধ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করেছিল, আজীবন যা থেকে বাস্তবিক মুক্তি সম্ভব হয়নি, পরিণত বয়সে এসে রাসসুন্দরী তারই বিরুদ্ধাচরণ করতে কলম তুলে নিয়েছিলেন হাতে।

ভাবতে অবাক লাগে কলুর বলদের মতো নিঃশব্দে যিনি সংসারসমুদ্রে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঘেরাটোপের আড়ালে 'কর্মহীন, গর্বহীন, দীপ্তিহীন সুখে' যিনি জীবন কাটাচ্ছিলেন, তাঁর প্রকাশ্যে বা উচ্চস্বরে গান করার স্বাধীনতা পর্যন্ত ছিল না। নারীজীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সাংঘাতিক শব্দ। কারণ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা থাকতে নেই। সে ভাবলেশহীন পুতুলমাত্র। পিতৃতন্ত্রের পেষণে অতি সম্ভাবনাময় জীবনও নিষ্পিষ্ট হয়, তারই প্রমাণ এই নির্বাক, প্রতিবাদহীন গৃহবধূ। দিনের পর দিন সমাজের অনুশাসন তাকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। নারীত্ব, মাতৃত্বের চিহ্নায়ক পরিচয়ের ঘূর্ণাবর্তে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রও 'প্রাচীনা ও নবীনা'য় বলেছেন—

> ''পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী, স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভোগী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বণিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না।''

রাসসুন্দরী তাই বলেছেন, প্রকাশ্যে নয়, 'আমি গোপনে গোপনে গানও করিতাম'—যেন আত্মমুক্তির ক্ষীণ প্রয়াস। তাঁর গানের চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল ক্ষুদ্র গৃহকোণের গভীর গোপন মনের মণিকোঠায়। মনে হয়, গান সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। বিশেষ করে রাগসঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। যার প্রমাণ রয়েছে ষোড়শ রচনা এবং রামদিয়ায় ১২৮০ সালের জ্বরের বর্ণনা সংক্রান্ত কবিতাটিতে। উল্লেখ্য যে, প্রথমটিতে 'জঙ্গলা' রাগ ও 'একতালা' তাল এবং দ্বিতীয়টিতে 'ধানশী' রাগ ও 'খেমটা' তালের নাম রয়েছে। রাগ ও তাল সম্পর্কিত জ্ঞান যাঁর আছে, নিঃসন্দেহে তাঁকে সঙ্গীতকলার যথার্থ বোদ্ধা বলা যায়। এ ছাড়াও হস্তশিল্পেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট সুনিপুণ। কিন্তু উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার অভাব হেতু তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ ঘটেনি। নারীর সত্তা, বাচন, চেতনার উপর পুরুষতন্ত্রের একচেটিয়া মনোভাবেই নারীর বহুজ্ঞতার যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয়নি। বস্তুত 'সামাজিক যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া নারী নামধারী' অধিকাংশ ব্যক্তির সত্তা বাতিল করে দেওয়া হত। ধ্বংস করে দেওয়া হত তাঁদের সম্ভাবনা, তাঁদের প্রতিভা, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা।

রাসসুন্দরীর বিয়ে হয় বারো বৎসর বয়সে, ফরিদপুর জেলার জমিদার সীতানাথ সরকারের সঙ্গে। 'সেই হইতে আমি আমার পিত্রালয়ের অতুল স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণভাবে পরাধীনা হইয়াছি।' যে বিবাহে প্রেম নেই শুধু অভ্যাস আছে, তাকে শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা রাসসুন্দরী কখনো শোনেননি।

তাই হয়তো 'বিবাহ' অনুষ্ঠানটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। 'সকল লোকেই বলিত যে, সকলেরি বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি তাহা আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না; বিবাহ হয় এই মাত্র জানি'—বলেছেন রাসসুন্দরী। রাসসুন্দরীর পরিবার হয়তো মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন—'ভদ্রকুলোদ্ভবা আমি'—তাই বিবাহ বা শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে রাসসুন্দরীব কোনো ধাবণাই গড়ে ওঠেনি। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ে হত অল্প বয়সে, যখন তাদের কাছে বিবাহ স্বপ্ন বলে মনে হত। একটি মেয়ের পৃথক সত্তার অস্তিত্ব কেউই স্বীকার করত না—সমাজ, সংসার, স্বামী। 'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রিকার 'নববধূ' প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে—

> "আমাদের হিন্দু পবিবাবে বাল্যবিবাহ প্রচলিত সুতবাং নববধূ অল্পবয়স্কা হইয়া থাকে। প্রথমাবধি তাহাকে সদ্ব্যবহাবের দ্বারা সন্তানতুল্য পালন করিলে, বধূ ঠিক তদনুযায়ী কন্যাতুল্য হইয়া উঠে, কিন্তু অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অধিকাংশ ঘরে বধূকে নিদারুণ যাতনা দেওয়া হয়।"[৩]

কিন্তু রাসসুন্দরী সেই 'অধিকাংশ ঘরের বধূ' ছিলেন না। তিনি শাশুড়ির অপরিমিত স্নেহ, আদরযত্ন লাভ করেছেন। ভেবেছেন—'কৌশলের বালাই লইয়া মরি। কোন গাছের বাকল কোন গাছে লাগিল।'

শ্বশুরবাড়িতে যাবার প্রাক্কালে রাসসুন্দরী নিজের মনেব অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> "যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।"

হিন্দুবিবাহে কন্যাকে দান করা হয় অপরিচিত এক ব্যক্তির হাতে। আসবাব, বাসন সহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে পিতা কন্যাকে দান করেন নিঃশর্তভাবে। সামগ্রীর মতো কন্যাও প্রাণহীন বস্তু, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনা কিছুই নেই। সেদিক দিয়ে তাকে স্থানান্তরিত করাও খুবই সহজ। আজন্মকাল যে পরিবেশ-পরিজনে সে লালিত, বিবাহ পরবর্তী জীবনে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যায় দূরত্বের, আপনার জন হয়ে ওঠেন শ্বশুরবাড়ির স্বজনেরাই। এ ছাড়া বিবাহকেন্দ্রিক আরোপিত বিভিন্ন রীতি সমাজপতিদের অমানবিক মনোভাবের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। যন্ত্রণা থেকে শান্তি তথা মুক্তি দেয় সময়। কিন্তু রাসসুন্দরীর এ যন্ত্রণার উপশম বৃদ্ধবয়সেও হয়নি ঠিকই কিন্তু এর অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতার চিত্রটি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনি। পৈতৃক বাড়িতে যে-মেয়ের অবাধ বিচরণ ছিল, তাকেই বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যথেষ্ট বিধিনিষেধের মধ্যে চলাফেরা করতে হয়েছে। 'সব ব্যাপারে বৌদিগের কর্মের রীতি ছিল। আমি ঐ রীতিমতোই চলিতাম'— বলেছেন রাসসুন্দরী। সেই রীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসসুন্দরী আমাদের জানিয়েছেন—

> "বিশেষত তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল। সেখানে এখনকার মতো চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা

কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া সকল কাজ করিতাম। ... সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না।"

এই ঘোমটা দেওয়ার পরিণাম স্বরূপ কত অঘটন সংগঠিত হত তা প্রসন্নময়ী দেবীর আত্মকথা থেকে জানতে পারি। শিশুবয়সে পাল্কি করে যাবার সময় মায়ের কোল থেকে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। 'মা বৌমানুষ অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত, কাহারো সঙ্গে কথা বলিতে পারেন না'।[৪] তাই জানাতে বা বোঝাতেই পারেননি। শেষে শিশুর ক্রন্দনে পাল্কিবাহকদের আসল ঘটনা বোধগম্য হল। এই বন্দিদশার জন্যই হয়তো বা স্বামীর ঘোড়ার সামনে বেরুতেও রাসসুন্দরী লজ্জাবোধ করেছেন— 'কি করি কর্তার ঘোড়া পাছে আমাকে দেখে' অথবা 'কর্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা'। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা না-হলেও পুরুষের সামনে বেরুনো রীতিবিরুদ্ধ ছিল। অপরিচিত পুরুষকে দেখে আত্মগোপন করাই ছিল লজ্জাশীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পর্দা বা আবরুর বাড়াবাড়ি তখনকার সমাজের মেয়েদের খাঁচায় বদ্ধ পাখির অবস্থায় নিয়ে ফেলেছিল, ইচ্ছে থাকলেও সামান্য একটু ডানা ঝাপটাবার অবকাশ তাঁরা পাননি। পর্দাপ্রথার এই বাড়াবাড়ি তখনকার দিনের প্রগতিশীল পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুববাড়িতেও কিছুটা ছিল। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বৎসরে একদিন ছাদে ওঠার সুযোগ পেতেন, সেদিনটা হল বিজয়াদশমী। সত্যেন্দ্রনাথ যেদিন সস্ত্রীক ইংল্যান্ড থেকে আসেন 'সেদিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত'। আর কৃষ্ণভাবিনী দাসী তো স্বামীর সঙ্গে ইংলন্ড থেকে ফিরে আসার পর 'কন্যার সঙ্গে আর সম্বন্ধ রইল না। কন্যাকে তাঁহার নিকট কেহ পাঠাইল না। দূর হইতে একবার দেখিতে চাহিলেও কন্যার শ্বশুর বা জামাতা কেহ দেখিতে দিল না'— পিতৃতন্ত্রের প্রতাপ এতই সর্বগ্রাসী যে এর দহনে শত-শত জীবন ছারখার হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানদানন্দিনী, কৃষ্ণভাবিনী আরোপিত জীবন থেকে ঈপ্সিত জীবনে পৌঁছুতে পারলেও এর জন্যে তাঁদের কম লাঞ্ছিত হতে হয়নি, এমনকী কালাপানি পার হওয়া কৃষ্ণভাবিনীকে হারাতে হয়েছেও অনেককিছু, যার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি সারাজীবন ধরে।

মায়ের অসুস্থতার খবর জেনেও রাসসুন্দরীর পক্ষে শেষ দেখা বা মায়ের সেবা করা সম্ভব হয়নি, এজন্যে তিনি নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়েছেন। এ ধিক্কার মূলত তাঁর নারীজন্মকে ধিক্কার—

"আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্নকালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী।"

এ যেন দহনচক্রে বন্দিনি এক নারীর নিঃশব্দ আর্তি। তথাপি এ ঘটনার জন্য কাউকে দোষারোপ করেননি তিনি, সর্বত্রই দায়ী করেছেন নিজের নারীজীবনকে। নিজেকে তিনি বারবারই বলেছেন 'পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী', 'তাহাদের পোষাপাখি', 'পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী জালে বন্দী মীন'— আবার কখনো তাঁর মুখে শুনতে পাই 'তিনি পরাধীনা নন'— কেন এই

পরস্পরবিরোধী আচরণ— মনে হয় ভীতা হরিণীর মতো নিজের কথা বলতে গিয়ে বারবারই আতঙ্কিত হয়েছেন তিনি; লজ্জা, সংকোচ তাঁকে অসহায় করে তুলেছে। সত্যোচ্চারণ করেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাঁকে নিজের সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত কঠোর রাখতে পারেনি, পিঞ্জরে বন্দি পাখির জীবন তো স্বাধীন নয়, মুক্ত হাওয়ায় ডানা মেলে আপন মনে আকাশে উড়ে বেড়াবার স্বাধীনতা তো তাঁর নেই। উপনিবেশীকৃত মন সত্যোচ্চারণে সত্তার কণ্ঠরোধ করে রাখতে চাইলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সত্তার উপস্থিতি, তাঁর সাহসিক উচ্চারণ। তাঁর মতো আরো অনেক মহিলাই নারীজন্মের জন্য সুতীব্র আক্ষেপ করেছেন। ইসাডোরা ডানকান বলেছেন—

> "No woman has ever told the whole truth of her life. The autobiographies of the most famous women are a series of accounts of the outword existence of petty details and anecdotes which gave no realisation of their real life. For the great moments of joy or agony they remain strangely silent".[৫]

কিন্তু তাত্ত্বিকদের মতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখিকার নীরবতাও কিন্তু পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিবাদ। স্পষ্ট করে কিছু না বলার পেছনে থেকে যায় অন্যতর বহুমাত্রিক উচ্চারণের সম্ভাবনা। উনিশ শতকের মহিলা-কবি মানকুমারী বসুর রচিত কবিতায় গভীর অভিমান প্রকাশ পেয়েছে—

> 'জীবনের মত সবি নীরবে নীরবে হবে,
> মরণেরো গায় মোর নীরবতা মাখা রবে'[৬]

স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই নীরবতার পেছনে অন্য কোনো সম্ভাবনার ছবি রয়েছে যা পাঠকের কাছে রহস্যাচ্ছন্নই থেকে যায় অথবা খানিকটা অনুমান-নির্ভর হয়ে ওঠে।

নীরব করে দাও হে

রাসসুন্দরীর রচনা থেকে জানা যায় ঘর-সংসারে কাজে তিনি দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতেন। শিশুবয়সে অসুস্থ কাকিমার সাহায্যার্থে সংসারকর্মের আসরে পদার্পণ। অপটু হওয়া সত্ত্বেও কাকিমার কর্মভার লাঘব করার জন্যে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। নিজের পরিবারের অগোচরেই চলতে থাকে তাঁর কর্মসম্পাদন এবং অচিরেই তিনি রন্ধনকার্য সহ অন্যান্য কর্মেও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। "আমি গোপনে গোপনে কাজ করিয়া রাখিতাম, তাহা দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কত সোহাগ করিতেন"— বোঝা যায় তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিতে গৃহকর্ম তথা সংসারকর্ম উৎসাহব্যঞ্জক, প্রশংসনীয় ছিল, কারণ তা ব্যক্তির নিজের নয়, সবার। পিতৃতন্ত্রের দৃষ্টিতে ব্যক্তি-ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই, যা কিছু করণীয়, পালনীয় সবই বৃহত্তর স্বার্থের কথা মনে রেখেই। মেয়েদের রান্নাবান্না সহ সংসারের খুঁটিনাটি কর্মে পারদর্শী হওয়ার সুফল হল ভবিষ্যতে শ্বশুরগৃহের বিশাল বিপুল কর্মভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া, সেই সঙ্গে স্বামী সহ পরিবারের সবার কাছে 'ভালো বৌ-এর' স্বীকৃতি পাওয়া।

মেয়েদের গার্হস্থ্যকর্মে পুরোদিনটি ব্যাপৃত রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। বনলতাদেবী লিখেছিলেন—

"রমণী সংসারের দাসী হইয়াও সমাজের নেত্রী, পরিবারে মহিমাময় কর্ত্রী, স্বামীর ধর্মপথের সহায় ও কার্য্যপথের উৎসাহ ও পরামর্শদাত্রী, সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধাতৃ নির্দিষ্ট পালয়িত্রী ও 'শিক্ষয়িত্রী'। এই সকল গুরুতর দায়িত্ব উপযুক্তরূপে বহন করিতে পারার নামই গৃহধর্ম্মপালন।"[৭]

অর্থাৎ নারী হবে 'সুমাতা, সুগৃহিণী, সুপত্নী'। 'সে সভ্যতার কেউ নয়, সে গৃহের অন্ধকারের।'

রাসসুন্দরীর বয়স যখন ১৪ তখন শাশুড়ি অসুস্থ ও ঠাকুরানি চক্ষুহীন হওয়ার জন্য ঘর-সংসারের সব কাজ তাঁকেই করতে হত। সমাজের দৃষ্টিতে নির্বাক, ধীরস্থিব, সহনশীলা, রন্ধনপটীয়সী, মিতব্যয়ী, জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ নারীই ছিলেন আদর্শ গৃহিণী। রাসসুন্দরীরও এ গুণগুলি ছিল। তাই নিজেকে নিয়ে ভাবনার অবকাশ ছিল কম! 'যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম বৈ আর কোন কর্মই নাই'। বাড়ির কর্তার জন্য একবার, পরে অন্যান্য লোকের জন্য দশ বারো সের চাল পুনরায় রান্না করতে হত। এভাবেই বেলা ৩/৪ টা সময় অতিবাহিত হয়ে যেত।

"আমি একাই দুবেলা পাক করিতে পারগ হইলাম, এবং সমুদয় কাজ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। তখন মেয়েছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না, সংসারে খাওয়া দাওয়ার কর্ম সারিয়া যে কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন তাঁহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত।"

বাড়িতে কর্মীর সংখ্যা কম। কাজেই রাসসুন্দরীকেই দশভুজারূপে সামলাতে হত গৃহকর্ম ও সংসারকর্ম। এসব কিছুর পরও তিনি নিজেকে অসুখী মনে করেননি। প্রকাশ্যে কোনো অভিযোগ-অনুযোগও করতে শোনা যায়নি। আমরা জানি 'আঘাত যত গুরুতর হোক প্রতিহত না হলে বাজে না'। তাঁর দিক থেকে প্রতিহত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না অথবা গায়ে বাজলেও সমাজের অনুশাসনে তা প্রকাশের সাহস হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত ছড়া থেকে বোঝা যায়, মেয়েরা ঘরসংসারের কাজকর্মকে কতটা প্রাধান্য দিত। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়ার মধ্যে রয়েছে গৃহিণীর গুণাবলি সহ ঘব-সংসারের কাজের তালিকা—

"হাঁড়ি হানশাল রান্না
তিন নিয়ে ঘরকন্না
পান পানি চূণ
তিন গৃহিণীর গুণ
আসন বাসন বসন শায
লালন পালন মেয়ের কায
রাখা ঢাকা শিল্পী-কর্ম্মা
বলে গেছেন রামশর্মা।"[৮]

১৮ থেকে ৪১ বৎসর পর্যন্ত রাসসুন্দরীর ১২ বার আঁতুড়ঘরে যাতায়াত। ১২টি সন্তানের জন্মদাত্রী তিনি। প্রথম সন্তান পুত্র। গৃহবধূর কর্মপালনের সঙ্গে যুক্ত হয় সন্তান পালনের যাবতীয় কাজকর্ম। আত্মীয়-পরিজন, অতিথি-অভ্যাগতদের সেবার মধ্য দিয়ে যাঁর দিনগুলি অতিবাহিত হতে থাকে তাঁর মুখে কোনো বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়নি। কারণ তিনি নিজেই

বলেছেন— 'বলিলেও লজ্জা বোধ হয় এবং বলাও বাহুল্য'। স্পষ্টতই বোঝা যায় 'না বলা কথা' অনেক কিছুই রয়ে যায়, যা আমরা জানতেও পারি না। কথায়ই তো আছে 'মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'। তারা শুধু অবলাই নয়, অবোলাও বটে। রাসসুন্দরীর বাড়িতে 'সেসময় ঘরের কাজের লোক ছিল না'— কোনো সাহায্যকারীও ছিল না। বৃহৎ সংসারের দায়, নিত্য ভোগ সহকারে প্রতিষ্ঠিত দেবতার সেবা, বাড়ির বাইরের ২৫/২৬ জন দাসদাসী সহ অতিথি অভ্যাগতদের জন্য প্রতিবেলায় ১০-১২ সের চাল রান্না, ঘর-গৃহস্থালির অন্যান্য কাজ, সর্বোপরি তিন বিধবা ননদিনিব বিগ্রহতুল্য সেবা। Piponnier বলেন, নারীর মর্যাদা বা ভাগ্য যা-ই হোক না কেন, নিজ পরিবারের সেবা করাই তার প্রাথমিক ভূমিকা ছিল। পরিবারের সদস্যদের সেবা বলতে অসংখ্য কাজের বিরামহীন পুনরাবৃত্তি।[৯] রাসসুন্দরী হয়তো বা তৃপ্ত ছিলেন কিন্তু তিনি কি মানুষের মর্যাদা পেয়েছিলেন? না সংসারে ব্যবহৃত হয়েছিলেন প্রতিবাদহীন শ্রমশক্তি বা দাসী হিসেবে—"সে সময় ঘরের কাজের লোক ছিল না, ঘরের মধ্যে আমি একামাত্র ছিলাম'। স্বামীগৃহে নারীকে দাসী করে রাখার বিধান তো মনুই দিয়েছিলেন—

> "স্বামী ও স্বজনগণ স্ত্রীলোকদের দিবারাত্রিব মধ্যে কখনো স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না, কাজে ব্যস্ত বেখে সব সময় তাদের নিজেদের বশে রাখবেন।"[১০]

তাঁর কাজের পরিধি এতই বিস্তৃত ছিল যে, 'কাজের গতিকে কোন দিবস একবার আহারও ঘটিত না'। এমনি একদিন কাজের চাপে খাওয়া হয়নি রাসসুন্দরীর। দ্বিতীয় দিনও সারাদিন উপবাসের পর গভীর রাতে খেতে বসেছেন ছেলে কোলে নিয়ে। কারণ ছেলে কাঁদলে কর্তাটি "কাঁদে কেন, কাঁদে কেন, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সোর করিবেন"। কিন্তু ক্ষুধার্ত মহিলাটির সেদিনও আর খাওয়া হল না। বাড়া ভাত শিশুটির প্রস্রাবে 'ভাসিয়া গেল'— এই অবহেলা অত্যাচার নয়? বাড়ির একটি মানুষের প্রতি এই উপেক্ষা ও উদাসীনতা উৎপীড়ন নয়? বাঙালি পবিবারের এই গৃহিণীদের পরিচয় ছিল 'সর্বগুণান্বিতা দাসীরূপে'। কফোর্ডের মতে স্বামীদের কাছে স্ত্রীর আমোদ-আহ্লাদের কোনো মূল্য ছিল না। কারণ তাঁদের আশঙ্কা ছিল, এর ফলে স্বামীসেবা বা সন্তানপালন জাতীয় কর্মে অধিকতর মনোযোগী না-হয়ে অনীহা দেখা দিতে পারে।

মূলত এই ছিল বাঙালির অন্দরমহলের প্রকৃত চিত্র। গৃহস্থালির সমস্ত কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার মধ্যেই গৃহিণীরা এক ধরনের আত্মসুখ অনুভব করতেন। পুরুষশাসিত সমাজে, বয়স্কাচালিত সংসারে তাঁদের সুখীর অভিনয় না-করেও বোধহয় কোনো উপায় ছিল না। এই মহিলা সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—

> "... বাঙালীর গৃহে গৃহিণীগণ কিরূপ ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্তরূপে এই চিত্রখানি আমরা বিশ্বের দ্বারে সগৌরবে উন্মোচন করিয়া দেখাইতে পারি।"[১১]

সত্যিই কি তাই? সাংসারিক কাজের চাপে দুদিন অনাহারে থাকেন; খাওয়ার সুযোগ পর্যন্ত ঘটে না, কেউ সে খবর পর্যন্ত রাখে না, অথচ কারো প্রতি অভিযোগ-অনুযোগ করেননি তিনি। বরং বলেছেন, 'ও সকল কথা আমি কাহারও নিকট বলিতাম না ও কেহ জানিত না'। এমন একজন

মহিলার জীবনচিত্র কি সগৌরবে উন্মোচনের বিষয়? অতি সাম্প্রতিককালে একজন গৃহবধূর শ্রমকে আর্থিক মানদণ্ডে বিচার করা হচ্ছে, যা রাসসুন্দরীর কালে কেউ ভাবতেও পারেনি। শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারেই মেয়েদের উপার্জনহীনতা সীমাবদ্ধ ছিল, দেখা যায় নিম্নবিত্ত মহিলারা কিন্তু উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। কেউ বা গল্প বলার বিনিময়ে পেতেন চাল, ডাল, শাক-সব্জি; কেউ বা পটচিত্র অঙ্কনের দ্বারা উপার্জনের চেষ্টা করতেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও এরকম ভেকধারী বৈষ্ণবীর সাক্ষাৎ পাই, নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে যার যাতায়াত ছিল।

রাসসুন্দরীও পটচিত্র অঙ্কনে পটু ছিলেন। তথাপি তিনি পুরোদস্তুর একজন গৃহবধূ, সংসারের অর্থোপার্জনের বিষয়ে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। তবে তিনি যে এক্ষেত্রেও পারদর্শী হতে পারতেন, এরকম ধারণা হয়, যখন দেখি স্বামীর ঘোড়ার সামনে বেরুতে যিনি লজ্জাবোধ করতেন তিনিই তিন পুরুষ ধরে চলে-আসা মোকদ্দমার সমাধান করে ফেললেন অতি সহজেই। বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার নিদর্শন এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনে শুধু সংসার, স্বামী, সন্তানকেন্দ্রিক অন্দরমহল নয়, বহির্মহলের ক্রিয়াকর্মের সুষ্ঠু সমাধানও তাঁর পক্ষে সম্ভব।

'আমার জীবন'-এর প্রথম মুদ্রণ ১২৭৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৬৮ খ্রিঃ। বাংলা সাহিত্যে 'আমার জীবন'ই প্রথম প্রকাশিত আত্মজীবনী যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী প্রথম প্রকাশিত না-হলেও প্রথম লিখিত আত্মজীবনী। নির্বাক, সদাসন্ত্রস্ত, সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহবধূ রাসসুন্দরী যিনি কিনা উপার্জনের চিন্তাও করতে পারেননি, তিনিই জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে স্বরচিত মৌলিক কর্মের মধ্য দিয়ে উপার্জনশীল হয়ে উঠলেন। আত্মজীবনীর শেষাংশে তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা জানিয়ে উপার্জনের ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাবিধিও লিখে গেলেন—

> "আমার এই বইখানি ছাপান হইলে ঐ বই বিক্রয় হইয়া ছাপানর দাম দিয়া পরে যে কিঞ্চিৎ থাকিবে ঐ টাকা আমানত থাকিবেক। আমার ছেলেদের ত কথাই নাই। পরে আমার বংশের মধ্যে যে থাকিবেক প্রতি বৎসর মদনগোপালের নিকট ঐ টাকা দিয়া মহোৎসব হইবেক, এই আমার প্রার্থনা।"

প্রভু আমার প্রিয় আমার

রাসসুন্দরী ছিলেন শঙ্কিত স্বভাবের মহিলা। তাঁর পুরো জীবন কেটেছে নিভৃত গৃহকোণে। তাই তাঁর রচনায় বৃহত্তর সমাজ অনুপস্থিত। একবার স্বামীর অবর্তমানে জমিদারি সংক্রান্ত উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। যিনি স্বামীর ঘোড়াকে (জয়হরি) দেখলেই ঘোমটা টানতেন, তিনিই কিনা সীতানাথ সরকার এবং মিরালি আমুদের সঙ্গে তিন পুরুষ ধরে চলতে থাকা মোকদ্দমার অবসান ঘটিয়ে দিলেন। নিজের ছেলেকে উপলক্ষ করে একটি পত্রের মাধ্যমেই দীর্ঘকালের দ্বন্দ্বের অবসান হল। রাসসুন্দরীর ভাবনা ছিল, স্বামী নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন 'এই ভাবিয়া আমি মৃতপ্রায় হইলাম, এমনকি ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল'। কিন্তু সীতানাথ সরকার পুরো ঘটনার বিবরণ জেনে 'অত্যন্ত

সন্তুষ্ট' হলেন। তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, 'আমার জীবন' রচনার কোনো স্থানে স্বামী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি তিনি। স্বামীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— 'বাস্তবিক তিনি বেশ লোক ছিলেন'— কিন্তু এই বেশ লোকটিরই স্নান হওয়া মাত্র ভাতের দরকার— কাজেই অসংখ্য কাজের মধ্যেও তাঁকে কর্তাব জন্য আলাদাভাবে বান্না করতে হত। আবার শিশু কাঁদলে 'কাঁদে কেন, কাঁদে কেন' বলে বিরক্তি প্রকাশ করবেন, এই ভয়ে শিশু কোলে নিয়েই তাঁকে খেতে হত এবং মাবা গেলে 'মোলো নাকি তা যাক' উক্তি যার মুখ থেকে শোনা যেত সেই মানুষটি সম্পর্কে 'আমার জীবন' রচনার কোনো স্থানে অভিযোগ কবেননি তিনি, এমনকী সামান্য অভিমানও হয়নি তাঁর। সত্যি বলতে কি, তখনো তো, এই সব মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা জোগায়নি। 'আমার যে সব দিতে হবে' জেনেই তাদের সংসারে আসা। স্বামী সম্পর্কে জানাতে গিযে বলেছেন—"বস্তুত কর্তা বিশেষ বড় লোক ছিলেন, তিনি অনেক সৎকার্য করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন। কর্তার জীবনচরিত এই যৎকিঞ্চিৎ লিখিত থাকিল।" রাসসুন্দরী স্বামীকে নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী না-হলেও তখনকার বেশিরভাগ মহিলাই কিন্তু এ ব্যাপাবে উৎসাহী ছিলেন। এ অনুমান দৃঢ হয, শরৎকুমাবী চৌধুরীর বক্তব্যে। 'কলিকাতার স্ত্রীসমাজ'-এ তিনি লিখেছেন যে, তখন শাশুড়িকে ছেড়ে স্বামীরাই হয়ে উঠেছেন মহিলাদের আলোচ্য বিষয়। কেশবজননী সারদাসুন্দরী স্বামীর সম্পর্কে ধারণার বিবরণ দিয়েছেন খোলাখুলিভাবে, নির্জন অবসবেব মুহূর্তে স্বামীর কাছে পড়তে বসার কথা জানিয়েছেন অকপটে।

নারীমন উপনিবেশীকৃত, তার ভাষা, ভাবনা সবই পিতৃতন্ত্রের দ্বারা অধিকৃত। রাসসুন্দরী সমাজেব আধিপত্যকে, ভাবাদর্শকে মান্যতা দিয়েই লিখতে চেয়েছেন। তাই স্বামীকেন্দ্রিক আলোচনায় তিনি যেমন আগ্রহ দেখাননি, অন্যদিকে তাঁর রচনায় দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্রও অনুপস্থিত। স্বামীর কাছ থেকে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা পাননি বাসসুন্দবী। মনে হয়, তিনি এরকম আশাও করেননি। ইচ্ছে করলে সীতানাথ সরকার স্ত্রীর পুথিপাঠে সহযোগী ভূমিকা নিতে পারতেন। তৎকালীন সমাজে স্বামী স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর ঘটনা অকল্পনীয় বা সমাজে নিন্দনীয় হলেও এরকম ঘটনা বিরল নয়। সারদাসুন্দরী বা নিস্তারিণীদেবীকে লেখাপড়া শেখানো বা শিখতে সাহায্য করেন তাঁদের স্বামীরাই। অথচ রাসসুন্দরীর স্বামী শিক্ষিত হলেও সহমর্মী ছিলেন না, তাঁর কাছে লেখাপড়ার কোনো গুরুত্বই ছিল না। সমাজপতিদের দৃষ্টিতে শিক্ষা যেহেতু অর্থোপার্জনের নিমিত্ত, কাজেই নাবীর শিক্ষার প্রয়োজন নেই, তাঁর ধারণা তা-ই হয়তো ছিল। বিপিন পালও তাঁর মা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরকমই একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন—

> "পুরুষেরা মেয়েদের সম্বন্ধে হিংসা করত বলে যে তারা লেখাপড়া মেয়েদের শেখাত না তা নয়। লেখাপড়ার তেমন কোন মূল্য ছিল না।"[১২]

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু

রাসসুন্দরীর জীবনে বিস্ময়ের বিষয় মৃত্যুভাবনা। আর বিস্ময়কর ঘটনা হল, স্বামীর মৃত্যুর পর মস্তকমুণ্ডন। তিনি বলেছেন— 'মৃত্যুর অধিক ফল মস্তকমুণ্ডন'। ৯০০ খ্রিঃ পরবর্তী সময়ে বেদব্যাসের মতো স্মৃতিকারেরা নারীর মস্তকমুণ্ডন প্রথা চালু করেন। সহমরণে যেতে অনিচ্ছা

প্রকাশ করলে মস্তকমুণ্ডন করতে হত। আনুমানিক ১২০০ খ্রিঃ থেকে সমাজের চাপে বিধবারা মস্তকমুণ্ডনে বাধ্য হন।[১৩] ৬০০ বছর পর ১৮৬৮ সালেও যে পরিস্থিতি পরিবেশ, ভাব-ভাবনায় কোনো পরিবর্তন আসেনি, রাসসুন্দরী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনুশাসনের পিঞ্জরে আবদ্ধ রাসসুন্দরী জানতেন, অভিযোগ করে লাভ নেই, অভিমান করাও হবে নিরর্থক। তাই সমাজের আচার-বিচারকে নিঃশব্দে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেকালে স্বামী না-থাকাকে মেয়েরা তাদের জীবনের চরম দুর্ভাগ্য বলে মনে করতেন— যার স্পষ্ট উল্লেখ আছে রাসসুন্দরীর রচনায়—

> "শত পুত্রবতী যদি পতিহীনা হয়
> তথাপি তাহাকে লোকে অভাগিনী কয়।"

তৎকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিধবাদের পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির গলগ্রহ হয়ে থাকতে হত। ১৮১৮ খ্রিঃ ১৩ই ডিসেম্বর হেস্টিংস তাঁর দিনলিপিতে বিধবাদের বিবিধ দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে তাদের অবস্থা আরো দুর্বিষহ হয় যদি কোনো সন্তান না-থাকে। আর যদি তাদের ছেলে বা মেয়ে থাকে তা হলে ছেলের বউ বা তার নিজের মেয়ে বাড়ির কর্ত্রী হয়ে বসে। বিধবার অবস্থা হয় অনেকটা দাসীদের মতো। তখন তাদের বেঁচে থাকাটাই খুব কঠোর হয়ে পড়ে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, অকালবৈধব্য অনেকের জীবনে বিপর্যয় হিসেবে নেমে এসেছিল। যদিও স্বামীর মৃত্যুর পর রাসসুন্দরীকে শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছিত বা নির্যাতিত হতে হয়েছে বলে জানা নেই।

নারীজীবনে অভাগিনি হবার যন্ত্রণা সবচাইতে বেশি। কারণ বৈধব্য অবস্থায় মানসিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক বঙ্গ মহিলা বলেছেন—

> "স্বামীসুখেই বঙ্গাঙ্গনা বেশ বিন্যাস করে। বঙ্গমহিলার সবই স্বামীময়। মন, প্রাণ, গৃহ, গৃহকর্ম্ম, আমোদ আহ্লাদ, ধন, মান, ভরণ, পোষণ, বেশবিন্যাস সবই স্বামীময়।"[১৪]

আত্মজীবনীকারদের অনেকেই বিধবা হবার পর তাঁদের লেখায় ছেদ টেনেছেন— 'বিধবার তরে জগৎ নয়'— কৈলাসবাসিনী স্বামীর মৃত্যুর পর সেসময়কার কথা আর লিখে রাখেননি। তাঁর মনে হয়েছিল এ পৃথিবীতে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাসসুন্দরীর কিন্তু এরকম মনে হয়নি। তাই হয়তো লিখেছেন—

> "যাহা হউক, আমি তাহাতে দুঃখিত নহি, পরমেশ্বর আমাকে যে অবস্থায় রাখেন, সেই উত্তম।"

শুধুমাত্র স্বামী কেন, সাতটি সন্তানের মৃত্যুতেও তিনি ছিলেন স্থিতধী। এক জায়গায় বলেছেন— 'এ সামান্য বিপদ নহে, যাহার নাম পুত্রশোক' — আবার কখনো বলেছেন— 'শোক হইলে লোক মৃত্যু ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু মৃত্যু হয় না, মৃত্যুর অধিক ফল হয়।' সর্বাবস্থায় তাঁর আশ্রয় মাতৃপ্রদত্ত মন্ত্র 'দয়াময়'। তাই কত অনায়াস উচ্চারণে বলেছেন—

> "১২টি সন্তান তুমি সাজাইয়া তোমার যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দিয়াছিলে, ছয়টি পুত্র এক কন্যা আমাকে দেখাইয়া লইয়া গিয়াছ, এক্ষণে চারিটি পুত্র এক কন্যা তোমার যাত্রার আসরে রাখিয়া আমাকে দেখাইতেছ।"

চরম দুঃখেও ঈশ্বরের মঙ্গলময় করস্পর্শ আস্তিক্যবাদী রাসসুন্দরীর অনুভূতিতে ছিল। তাই স্বামীর মৃত্যুর পরও তাঁকে দেখি মূর্তিময়ী স্থিতপ্রজ্ঞা—"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহাঃ"।[১৫]

নমি নমি চরণে

রাসসুন্দরীর রচনাতে কয়েকটি কবিতা আছে। প্রায় সবগুলোতেই রয়েছে পুথির অনুসরণে সংযোজিত ভণিতা, আব কবিতাব বিষয়বস্তুতে রয়েছে গভীর ঈশ্বরপ্রীতি। মনে হয়, রাসসুন্দরীর এই ঈশ্বরভক্তির পেছনে ছিল চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, জৈমিনি ভারত ইত্যাদি পুঁথিপাঠের প্রভাব।

> "চৈতন্যচরিতামৃত তরঙ্গের এক বিন্দু, তাব কণা লিখে কৃষ্ণদাস।
> রাসসুন্দরী মূঢ়মতি, তাহে শূন্য প্রেমভক্তি, যুগলচরণ অভিলাষ।"

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে হাটখোলা, বালখানা, দরজিপাড়া ইত্যাদি স্থানে বাংলা ছাপাখানা গড়ে ওঠে। এসব ছাপাখানা থেকে যেসব বই প্রকাশিত হত, তার অধিকাংশ ছিল ধর্মগ্রন্থ। যেমন— 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'কাশিদাসী মহাভারত', 'চৈতন্যবিষয়ক বিভিন্ন কাব্য', 'ভক্তিবিলাস', 'পদকল্পলতিকা' ইত্যাদি। মেয়েদের পঠন-পাঠনে নির্দিষ্ট ছিল শুধু ধর্মগ্রন্থ। এর বাইরে অন্য সবকিছুই চরিত্র গঠনে সহায়ক নয়— কাজেই নাটক, নভেল পড়ার অধিকার তাদের ছিল না। লক্ষণীয় যে, মুদ্রিত ধর্মগ্রন্থের অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ক। রাসসুন্দরীর উল্লিখিত বইয়ের বেশিরভাগই বৈষ্ণবধর্ম বা চৈতন্যবিষয়ক—

> "চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত আঠার পর্ব জৈমিনিভারত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকি পুরাণ— এই সকল ঐ বাটীতে ছিল। কিন্তু বাল্মীকি পুরাণের আদিকাণ্ড মাত্র ছিল, সপ্তকাণ্ড ছিল না।"

সপ্তকাণ্ড বাড়ির সংগ্রহে না-থাকলেও পরবর্তী সময়ে রাসসুন্দরীর চাহিদা মেটাতে বাল্মীকি পুরাণের সপ্তকাণ্ডের মুদ্রিত পুস্তক বাড়িতে আসে। 'আমার জীবন'-এ মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী সরস্বতীর বন্দনা গান করে শুরু করার এবং স্থানে স্থানে ভণিতা ব্যবহারের পেছনেও রয়েছে হয়তো বা মধ্যযুগীয় এ সমস্ত কাব্যেরই প্রভাব।

শ্বশুরবাড়ির মদনগোপালকেই ছেলেবেলায় দয়ামাধব হিসেবে জানতেন রাসসুন্দরী। তাঁর উপস্থিতি বারবার অনুভূত হয়েছে রাসসুন্দরীর জীবনের বিভিন্ন পর্বে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে— 'এ প্রভু, অধমতারণ, হে করুণাময় বিপদভঞ্জন হরি, তোমার দয়ার তুলনা নাই।' আর জীবন সায়াহ্নে এসেও তাঁকেই তাঁর একান্ত আপনার জন বলে মনে হয়েছে। তাই দয়ামাধবচরণে নিবেদিতপ্রাণা এই মহিলা তাঁর লেখা আত্মজীবনী 'আমার জীবন' থেকে উপার্জিত অর্থ তাঁরই চরণে উৎসর্গ করার আবেদন জানিয়ে গেলেন। আত্মীয়বর্গ, বন্ধু পরিজনদের উদ্দেশে বলে গেলেন তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনার কথা। ঈশ্বরের প্রতি রামকৃষ্ণের যে টান তা বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর, পতির প্রতি পত্নীর এবং সন্তানের প্রতি মাতার টান একত্রে। রাসসুন্দরীরও শিশুকাল থেকেই দয়ামাধবের প্রতি টান ছিল

গভীর। সে-টান আন্তরিকতার, যেখানে কোনো বাহ্যিক আড়ম্বর নেই, বিশ্বাস ও ভালোবাসার উপকরণে তা পূর্ণ। তাঁর ধর্ম একান্তই নিজস্ব, একান্তই ব্যক্তিগত, যা তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

"হে নাথ দয়াময়। ধন্য, ধন্য, তোমাব ঠাকুবালী, ধন্য। তোমাব নামামৃত আমাব শ্রবণে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মানবদেহ সফল হইল। আমি কৃতার্থ হইলাম।"

সকলের মধ্যে রাসসুন্দরীর মতো আত্মনিবেদনের সুর শোনা না-গেলেও তাঁদের জীবনে একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকত ঈশ্বর-বিশ্বাস, ভাগবত প্রেম। নীরদচন্দ্র চৌধুরী আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে মহিলারা যেখানে প্রকাশ্যে চিৎকার করে না, সেখানে তারা 'send up their secret thoughts to God, the unfailing Dispenser of Justice'।[১৬] সে-সময় মহিলাদের অধিকাংশ ছিলেন ঈশ্বরবিশ্বাসী। সেইজন্য সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়া ঠাকুরঘরে তাদের অনেক সময় কেটে যেত। রাসসুন্দরীও সংসার, পরিবার ও প্রাণেব ঠাকুরকে নিয়েই ছিলেন তৃপ্ত। বাইরের কোনো ঘটনাই তাঁর জীবন স্পর্শ করতে পাবেনি। তাই তিনি যখন তাঁর বইয়ের খসড়া করছিলেন তখন পূর্ববঙ্গে বাল্যবিবাহ আন্দোলন শুরু হয়েছে ; সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন পাশ হয়েছে, বিধবা বিবাহও আইনের দ্বারা অনুমোদিত। অথচ এতগুলো যুগান্তকারী ঘটনা বা সংস্কার-আন্দোলন নাড়া দিতে পারেনি তাঁর মনকে না কি এক্ষেত্রে নিজেকে নির্বাক ভূমিকায় রাখাই সমীচীন বলে বোধ হয়েছে তাঁব? অবশ্য তাঁর মুখে— 'আমার যে কথা স্মরণ না থাকে তাহা তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও'— একথা শুনে মনে হয না এ ঘটনা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়াতে চেয়েছেন তিনি। হতে পারে পরিবারের ব্যক্তিবর্গ আরোপিত আচারবিধি ও প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাননি। বিদ্যাসাগব, রামমোহনেব সংস্কাব-আন্দোলনের মূল কথা ছিল নারীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা। অথচ বিদ্যাসাগবের বিধবাবিবাহের প্রবল বিরোধিতা করেছিল তৎকালীন সমাজ, যা একটা পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়। দেখা যায়, ১৮৫৫ খ্রিঃ বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে ত্রিশজন পণ্ডিত পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সতীদাহ রদ করার বিপক্ষে ছিল, এই আইন প্রত্যাহাবের জন্য রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ সরকারের কাছে আবেদনও জানিয়েছিলেন। রাসসুন্দবী ছিলেন গ্রাম্য কুলবধূ, তাঁর পরিবার রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন। মনে হয়, বিদ্যাসাগর-রামমোহনের সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের ঢেউ অন্দরমহলে তখনো প্রবেশ করেনি, নতুবা তাঁর অন্তর স্পর্শ করেনি। আবার এ-ও হতে পারে সমাজের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে নীরবতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। জেরাল্ডিন ফৌবস বলেছেন, 'সেসব মেয়েরা যারা পিতৃতন্ত্রের প্রতি তাদের সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বস্ত, তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই নৈঃশব্দ্য বজায় রাখেন,'[১৭] রাসসুন্দরী তাই হয়ত নীরবতার রাজনীতিকেই আশ্রয় করেছিলেন।

রাসসুন্দরী শুধুমাত্র গৃহবধূই নন, মাতৃত্বের দায়িত্বপালনে একনিষ্ঠ কর্মী— তাঁর এই চিহ্নায়ক পরিচয়ের অন্তরালে স্পষ্টভাবেই উদ্ভাসিত তাঁর ব্যক্তিসত্তা। আত্মজীবনীর একজায়গায় নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

'আমার নাম মা, আমাব পিত্রালয়ে যে নাম ছিল, তাহাতো অনেককাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিপিনবিহারী সবকাব, দ্বাবকানাথ সরকার, কিশোরীলাল সবকার, প্রতাপচন্দ্র সবকার এবং কন্যা শ্যামাসুন্দবী আমি ইহাদিগেরি মা! এক্ষণে আমি সকলেরি মা।' 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে' দাঁড়াবাব ক্ষমতা তাঁব ছিল না। নিতান্ত আপন প্রাণের টানেই লিখেছিলেন আত্মজীবনী। তাঁর এই আত্মজীবনী মুক্ত চিন্তা, মুক্ত ভাবনা, মুক্ত মানসিকতা ও মুক্ত আকাঙ্ক্ষার দলিল। ভাবতে অবাক লাগে, তথাকথিত শিক্ষাবর্জিত শুধুমাত্র পুঁথিপড়া জ্ঞান নিয়ে তাঁর যে আত্মোপলব্ধি তা যে ভারতদর্শনেরই মর্মকথা। কী করে তিনি বলেন—

"লোকে কেন বলে আমাব শবীর, আমার বাটী, আমার ঘব? ফলতঃ আমার সকলই মিথ্যা। মনুষ্যেব মনের ভ্রম আব যায না।"

মৃত্যু মানুষের অবশ্যম্ভাবী পবিণতি বুঝেছেন— সংসাবকে দেখেছেন 'মনিহারীব দোকান' রূপে— এমন অবগুণ্ঠনবতী মহিলাকে সাধারণ বা বলি কী করে? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর একক নিবলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অথচ তাঁর পববর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্রের সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা কাবো অজানা নয়। আজ সমগ্র দেশজুড়ে নারীবাদ নিয়ে যখন নিবিড়পাঠেব আয়োজন চলছে তখন বাসসুন্দরীকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। যে মহিলা সমাজেব ভ্রান্তধারণা ভ্রান্তবিশ্বাসেব বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, জীবনের শেষ সময়েও তাঁকে কিন্তু অন্ধবিশ্বাসেব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে দেওযা হল না, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাঁকে গঙ্গাযাত্রা কবানো হযেছিল, পুত্রেব আগ্রহ-আতিশয্যে। জীবন থেকে বড়ো হয়ে উঠল প্রথা, 'প্রথাই অমর এখানে'।

তৃতীয় অধ্যায়

ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছি

বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা'

(১৮৬৩-১৯৪১)

'কে তোকে বলেছে নির্ভবশীল হতে
লজ্জা করে না? এমন শক্ত পাযে
হেঁটে যাবি বহুমাইল পথ
একা একা শুধু একলাই একা একা'

— শতরূপা সান্যাল

বিনোদিনী দাসীর জীবনক্ষেত্র ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। তাঁর কোনো ঘর ছিল না, তিনি জানিয়েছেন, 'কবে কোন এক স্মরণাতীত কালে বিয়ে হযেছিল এই পর্য্যন্ত, স্বামী কখনও গ্রহণ করেননি, তাঁকে আর কখনও দেখিও নি'। অতএব চিরদরিদ্র ঘরের অসহায় মেয়েটির বিচবণ ক্ষেত্র হয়েছিল বৃহত্তর সমাজের এক ব্রাত্য অঙ্গনে। তাঁর আত্মজীবনীর পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আধিপত্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পঙ্কিল আচরণ, কদর্য মনোভাব, এক গাঢ় কুটিল চিত্র।

নিজের সম্বন্ধে বিনোদিনীর অকপট সম্বোধন 'ভাগ্যহীনা বারনারী', 'ঘৃণিতা বারনারী', কখনো 'ঘৃণিতা সমাজবর্জ্জিতা বারবণিতা', কখনো বা 'সমাজপতিতা ঘৃণিতা বারনারী'—কিন্তু প্রচলিত অর্থে তিনি বারাঙ্গনা নন। নিষিদ্ধ পল্লিতে তাঁর জন্মও নয়, বাসও নয়। তবে তিনি একাধিক ব্যক্তির 'পরিচর্য্যাকারী বটে'। প্রথমে সম্ভ্রান্ত রাজাবাবুর পরিচর্যা করেন সাংসারিক প্রয়োজনে, গুর্মুখ রায়ের আশ্রিতা হন থিয়েটারের মহত্তর প্রয়োজনে আর মহাশয়ের অনুগৃহীতা হন জীবন সায়াহ্নে নির্ভরতা পাওয়ার জন্যে। এই মহাশয়কেই তিনি জীবনদেবতা বলে গ্রহণ করেছেন এবং আত্মজীবনীখানি উৎসর্গও করেছেন। 'মহাশয়' বিনোদিনীর জীবনে যেন সাহারার মরুপ্রদেশে দুর্লভ বৃষ্টির মতো। বিনোদিনী তাই বারাঙ্গনা নন, তিনি 'নটী' সেই অর্থে, যে-অর্থে অহীন্দ্র চৌধুরী 'নট', যে-অর্থে গিরিশ ঘোষ 'নটরাজ'। অমৃতলাল বসু সম্বন্ধে শিশির ভাদুড়ী বলেছিলেন—

> "অমৃতলাল খুব... বড় নট। ... তার একটা রূপ আমার কাছে সবচেয়ে বেশী নিকট, বেশী অন্তরতম, সে হচ্ছে তার নটরূপ, তিনি নটশ্রেষ্ঠ ছিলেন, নট নায়ক ছিলেন— তাই তিনি নটজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন।"

বিনোদিনী সেই অর্থেই নটী।

বিনোদিনীব আত্মজীবনীর বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল তিনবাব। যদিও এগুলো একে অপবেব পরিপূবক। 'আমাব কথা' প্রকাশিত হয ১৩১৯ (১ম সংস্করণ) ও ১৩২০ (২য সংস্কবণ)-এ। এব আগে ১৩১৭ সালে 'অভিনেত্রীব আত্মকথা' নাট্যমন্দিব পত্রিকায দুটি সংখ্যায ছাপা হয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় বন্ধ হযে যায। একই ঘটনাব পুনবাবৃত্তি ঘটে ১৩৩১-৩২ সালে 'আমাব অভিনেত্রী জীবন' লেখাটির ক্ষেত্রেও। শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায এবং নির্মলচন্দ্র চন্দ্রেব যৌথ সম্পাদনায প্রকাশিত 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় লেখা এই অসম্পূর্ণ স্মৃতিকথাই তাঁব শেষ বচনা। 'আমার জীবন' বিনোদিনীর মোটামুটিভাবে পূর্ণ জীবনালেখ্য। শৈশবেব অনাবিল দিন থেকে বার্ধক্যেব আশাহত অপমানিত দিনগুলি পর্যন্ত। তাঁব অভিনেত্রী জীবনে প্রতিফলিত হযেছে তাঁব অভিনয জীবনেব সার্থকতা-স্বীকৃতি, আশা-নিবাশা-বঞ্চনা-অবমাননাব ইতিহাস। ফুটে উঠেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজেব কুটিল চিত্র। নাবীব অবমাননা সেই চিত্রেব উৎকট দিক, আব বঙ্গরঙ্গালযেব ইতিহাস তাব গৌণ দিকমাত্র।

শেষজীবনে বিনোদিনী যখন শয্যাশাযী, মনোভঙ্গেব বেদনায কাতব, সে-সময 'তাহাব চঞ্চল চিত্তকে কার্য্যান্তবে ব্যাপৃত বাখিবাব জন্য আমি তাহাকে 'নাট্যজীবনী' লিখতে অনুবোধ কবি', গিবিশচন্দ্র এ-কথা জানালেও তাঁব অনুবোধেই যে বিনোদিনী নিজেব জীবনকথা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন একথা পুবোপুবি সত্য নয, আংশিক সত্য মাত্র। কেননা 'আমাব অভিনেত্রী জীবন' এব শুরুতেই বিনোদিনী নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছেন, 'পুরানো স্মৃতিকে ঘসে মেজে জাগিয়ে তোলার আবার চেষ্টা করছি কেন?' এই প্রশ্নের জবাবও আবার নিজেই দিয়েছেন— 'কোনও কিছু বলতে গেলে তাই আগে মনে পড়ে সেই কথা, যা আমার কাছে এখনো সুখ স্বপ্নের মত মধুর, যার মাদকতাব আবেশ ও আবেগ এখনও আমি ভুলতে পারিনি আর যা বোধহয় আমার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সঙ্গেব সাথী হয়েই থাকবে। তাই বোধহয আমার এই অভিনেত্রী জীবনেব কথা বলবার সাধ।'

আবার 'আমার কথা'য় তাঁর ভাষ্য— 'আমি লিখিলাম আমার সান্ত্বনার জন্য। হয়তো প্রতারণায় বিমুগ্ধ নরকপথে পদবিক্ষেপোদ্যতা কোন অভাগিনীর জন্য।' আবার কখনো বলেছেন— 'কাহার নিকটেই বা প্রাণের বেদনা জানাইব, তাই কালিকলমে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি'। এইভাবে বিনোদিনীব লেখা আত্মজীবনী হয়ে উঠল বহুমাত্রিক। একদিকে আমরা পেলাম সমাজে ব্রাত্য নারীর অবস্থান, সমাজে পতিত নারীর জীবনচর্যা বা জীবনচর্চার অজানা তথ্য, তাব সঙ্গে পেলাম বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিহাস এবং তার অন্তর্নিহিত বিস্তৃত চিত্র।

কোথা কি কণ্টক কিবা কীট আছে তার

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গোলকনাথ দাস গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফের বাংলা থিয়েটার 'কাল্পনিক সংবদল'-এর জন্য অভিনেত্রী জোগাড় করেছিলেন লোকনাট্যধারার কোনো গ্রামীণ রীতির শিল্প সমাজ থেকে। এরা কেউ নিষিদ্ধ পল্লির লোক ছিলেন না। পুরুষের সঙ্গে মহিলার প্রকাশ্য অভিনয়ে ধনী ব্যক্তিবর্গের আপত্তি না-থাকলেও পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবী মহলের চিন্তাধারায় পালাবদল ঘটে। ফলস্বরূপ থিয়েটারে মহিলার প্রবেশাধিকার সংকুচিত হয়ে যায়। ১৮৩৫-এ শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে আবার চারজন অভিনেত্রীর সন্ধান

পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন— রাধারানী, জয়দুর্গা, রাজকুমারী ও বৌহরো ম্যাথরানী। এরা আসেন নিষিদ্ধ পল্লি থেকে। কিন্তু এরপরই রক্ষণশীলতার সোচ্চার বিরুদ্ধাচরণে মঞ্চে অভিনেত্রীদের প্রবেশপথ রুদ্ধ হয়ে যায় অনেকদিন পর্যন্ত।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে 'দি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' প্রযোজিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে বিদ্যা ও সুন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করেন দুজন মহিলা।

উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল নারী মুক্তি। কাজেই যাদের সংস্পর্শে থিয়েটাবের পরিবেশ কলুষিত হবে বলে মঞ্চে অভিনেত্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল সেই পতিতা সমাজ থেকেই আবার অভিনেত্রীদের আনা হল ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। সেসময়কার বেশির ভাগ মহিলাই ছিলেন অন্দরবাসিনী। আব বাইরে যাঁরা বেরোতেন তাঁরা মূলত ছিলেন ইউরোপীয়। আর যাঁবা ঘরের বাইবে ছিলেন প্রকৃত অর্থে তাঁদের ঘরই ছিল না। অথচ কলকাতা শহরের সংস্কৃতিচর্চায় এদের অবদান অনস্বীকার্য। সাহেবদেব কাছে তাঁরা পরিচিত ছিলেন 'nautch girls' হিসেবে। সে সময় ইউরোপীয় মহিলাদের মধ্যে নৃত্যগীতে পটীয়সীর অভাবহেতু 'nautch girls'-দের চাহিদা বেড়ে যায়। তাঁদের 'Bai nautch' দেখে একজন সাহেব কৌতুক করে বলেছিলেন—

"They sang wild airs
Which affected your hairs"[১]

মঞ্চে মহিলাদের অভিনয়কে নিযমিতকরণের দায়ভার বেঙ্গল থিয়েটাবের প্রাপ্য। শরৎচন্দ্র ঘোষ ছিলেন থিযেটাবের উদ্যোক্তা। উৎসাহদাতারা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। সিদ্ধান্ত হল স্ত্রী চরিত্রে মহিলাদের অভিনয় করানো হবে। কিন্তু বাদ সাধলেন ঈশ্বরচন্দ্র, এ জন্য তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। অথচ নারীর বৈধব্য তাড়িত অসহনীয় যাতনা থেকে মুক্তি দিতে, নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে তিনিই ছিলেন কিনা অগ্রগামী। নাট্যকার মনোমোহন বসুও বিরূপ সমালোচনা করলেন। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করে ১৮৭৩-এর ১৬ আগস্ট মাইকেল মধুসূদন দত্তের উৎসাহে, বেঙ্গল থিয়েটারের ব্যবস্থাপনায় 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করলেন মহিলারা। দেবযানী ও দেবিকার ভূমিকায় অভিনয় করলেন জগত্তারিণী ও এলোকেশী। ১৮ আগস্ট ১৮৭৩-এর ইংলিশম্যান পত্রিকার মন্তব্য ছিল 'স্ত্রীলোক দুজন, পেশাদার মহিলা তাবা ছিলেন সর্বাপেক্ষা সবল'।[২] তারপরও বলা হল, 'নাট্যপ্রযোজনা অভিনেত্রী ছাড়াই হওয়া উচিত'। ইংলিশম্যানের এই মনোভাবের পেছনে মূল কারণটি ছিল, আঠারো শতকে মঞ্চে অভিনেত্রী নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধিতা। ১৫ই এপ্রিলের সুলভ সমাচারে লেখা হল,

> "সিমলার কতকগুলি ভদ্রসন্তান বেঙ্গল থিয়েটার নাম দিয়া আর একটি থিয়েটার খুলিতেছে। ... যে যে স্থানে পুরুষদিগকে মেয়ে সাজাইয়া অভিনয় করিতে হয় সেই সেইখানে আসল একেবারে সত্যিকারের মেয়ে মানুষ আনিয়া নাটক করিলে অনেক টাকা হবে এই লোভে পড়িয়া তাহারা কতকগুলি 'নটী'র অনুসন্ধানে আছে। ... মেয়ে নটী আনিতে গেলে মন্দ স্ত্রীলোক আনিতেই হইবে, সুতরাং তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইবে। কিন্তু দেশের পক্ষে তাহা নিতান্ত অনিষ্টের হেতু হইবে।"[৩]

কিন্তু সব আলোচনা-সমালোচনাকে অগ্রাহ্য কবে উদ্যোক্তারা উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হলেন। যোগ দিলেন শ্যামা, গোলাপসুন্দবী। 'ভারত সংস্কাব', 'মধ্যস্থ', পত্রিকায় তাঁদের আক্রমণ করা হল তীব্র ভাষায়। এই বিবোধিতা শুধুমাত্র মঞ্চে অভিনেত্রীদের যোগদানেব ক্ষেত্রেই নয় নারীব অন্যান্য অগ্রগতিতেও পুরুষশাসিত সমাজ ছিল প্রধান এবং একমাত্র প্রতিবন্ধক। ১৮৭৭-এ জোড়াসাঁকো ঠাকুববাড়ির মেযেরা 'অলীকবাবু' নাটকে অভিনয় করেন। ১৮৮১ খ্রিঃ 'বাল্মীকি প্রতিভা' মঞ্চস্থ হয জোড়াসাঁকোর তেতলার ছাদে। আট বছর পর 'রাজা ও রানী' নাটকে যখন ভাসুর দেওর তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে অভিনয় করেছিলেন তখন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায মন্তব্য করা হল 'ঠাকুরবাড়ীব নতুন ঠাট'। যদিও এই রক্ষণশীলতা রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির পরিজনদেব নিবৃত্ত করতে পারেনি, তথাপি সময়টা এতই প্রতিকূল ছিল যে মঞ্চে অভিনয়ের জন্য নিষিদ্ধ পল্লি বা বাঈজীদের ঘরেই অভিনেত্রীর সন্ধান করতে হত। প্রথম মহিলা নাটক 'অপূর্বসতী' (১৮৭৫ খ্রিঃ) লিখেছিলেন যে গোলাপসুন্দরী, তিনিও এসেছিলেন নিষিদ্ধ পল্লি থেকে। গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামে এক ভদ্রলোক গোলাপসুন্দরীকে বিয়ে কবে তাঁকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেন। এ ঘটনা সে-যুগে নিঃসন্দেহে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাই তো তিনি বিদ্ধ হযেছিলেন কলকাতার লোকসমাজেব বিদ্রুপাত্মক ছড়ায।

'আমি সখেব নারী সুকুমাবী
আমবা স্ত্রী পুরুষে এক্টো করি
দুনিয়ার লোক দেখে যা রে।'[৪]

'বেঙ্গল থিয়েটাব' অগ্রগামী ভূমিকা নিলেও অল্পকাল পবেই প্রতিষ্ঠিত 'গ্রেট ন্যাশনাল থিযেটার' নারী চরিত্রে মহিলাদেব অংশগ্রহণে উৎসাহ দেখাননি। শেষ পর্যন্ত দর্শকদেব চাহিদাতেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিয়োগ করলেন রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, কাদম্বিনী এবং হরিদাসী নামের পাঁচজন অভিনেত্রীকে।

বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীতে রঙ্গালয সম্পর্কে উচ্চসমাজের বিরূপ মনোভাবের প্রতিফলন হিসেবে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যথাক্রমে চরিত্রহীন ও বারাঙ্গনা বলে পরিচিত হতে থাকেন। কাজেই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মান-সম্মান নেই, তারা পরিত্যক্ত, তারা অস্পৃশ্য, একঘরে। গিরিশ ঘোষও বলেছিলেন 'বারাঙ্গনা সহচরী, কে কোথায় রাখে তার মান'। মূলত ঘৃণাভাজন ছিলেন অভিনেত্রীজন। আর তাদের সাহচর্যে থাকার অপরাধে অভিনেতাদের উপর নেমে এসেছিল সমাজের ন্যায়-নীতি-অনুশাসনের খড়্গ।

'লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাজন''[৫]

'আমার অভিনেত্রী জীবন'-এ বিনোদিনী বলেছেন তাঁর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যাবার বেশ কয়েক বৎসর আগেও পুরুষ স্ত্রীলোকের 'পার্ট' করত। কাজেই প্রাক্‌পর্বে নারীচরিত্রে অভিনয়ের জন্যে এরকম ছেলেদের নির্বাচন করা হত যাদের মধ্যে মেয়েলি হাব-ভাব, মেয়েলি আচার-আচরণ নজরে পড়ত। পরবর্তীকালে যেহেতু তথাকথিত ভদ্রকুল থেকে নারীচরিত্র যোগাড় করা সম্ভব ছিল না, প্রয়োজনবোধে তাই সেখানে বারাঙ্গনারাই বাঞ্ছিত ছিলেন—

যাবা সমাজেব সবচাইতে অবহেলিত, অবাঞ্ছিতজন— যাদেব আদব, সমাদব অথবা ন্যূনতম অধিকাব পাবাব যোগ্যতা নেই। আব এ-কাবণেই বেঙ্গল থিয়েটাবে যেদিন প্রথম অভিনেত্রীদেব আনা হল, সেদিন গিবিশচন্দ্র সহ অন্যান্য শিল্পীসম্প্রদায় অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন। সমাজে ক্ষমতাবান অনেক ব্যক্তিব গোপন ভোগ্য বস্তু এ বাবাঙ্গনাবা এতদিন লোকচক্ষুব অন্তবালে ছিলেন কিন্তু যেদিন তাঁদেব অন্ধকাব থেকে বাইবে নিয়ে আসা হল আলে" সে-মুহূর্তে সৃষ্টি হল আলোড়ন। তাঁদেব সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদেবও হীন-পতিত তালিকাভুক্ত কবা হল। ১২৮১ সালেব ১লা পৌষ কেশব সেনেব 'সুলভ সমাচাবে' একটি সংবাদ পবিবেশিত হল—

> "বেশ্যাদ্বাবা অভিনয় কবাইলে নাট্যমন্দিব আব বিশুদ্ধ আমোদেব স্থল বহিল না। বেশ্যাব অভিনয়ে দুইটি দোষ, যে সকল পুরুষ বেশ্যাব সঙ্গে অভিনয় কবেন তাহাদেব চবিত্র ভাল বাখা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ যাবা বেশ্যাব অভিনয় দেখেন তাঁহাদেবও মন কলঙ্কিত হইবাব অধিক সম্ভাবনা। শুনিলাম কতকগুলি সুশিক্ষিত লোক নাকি বেশ্যাব অভিনয়ে উৎসাহ দিয়া থাকেন। যে সুশিক্ষাব ফল বেশ্যাব আমোদ, সে সুশিক্ষাব মুখে আগুন। যদি ভদ্র পবিবাবেব স্ত্রীলোকেবা বেশ্যাব অভিনয় দেখে, তাহা হইলে তাদেব যে কি সর্বনাশ হইবে তাহা ভাবিয়া শেষ কবা যায় না। ভাইসকল ক্ষান্ত হও, তোমাদেব পায়ে পড়ি। দেশ ডোবে, আব কুনীতি বিস্তাব কবিও না।"[৬]

শুধু কেশব সেনই নন, বিদ্যাসাগব, ববীন্দ্রনাথ এবং পতিতা উদ্ধাবকাবী শিবনাথ শাস্ত্রীব মতো বুদ্ধিজীবী সমাজসংস্কাবকদেবও শিল্পাঙ্গন থেকে বাবাঙ্গনাদেব দূবে বাখাব পেছনে নৈতিক সমর্থন ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীও অভিনয় শিল্পে বাবাঙ্গনাব যোগদানকে সমর্থন কবতে পাবেননি। দেখা যায়, হেবম্ব চন্দ্র মৈত্র সহ ব্রাহ্মসমাজেব অনেক নেতাই ছিলেন মঞ্চবিবোধী। কেশবচন্দ্র ছিলেন নাবী উন্নতিব পৃষ্ঠপোষক, আব বিদ্যাসাগব নাবীত্রাতা, নাবীব জীবনদাতা। সে-জীবন শুধুমাত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস •ম, তা উপভোগেব। অথচ তিনিই কিনা মঞ্চে নাবীব অনুপ্রবেশকে সমর্থন কবতে পাবলেন না। তাঁব এ আচবণ আবো অনেক লোককেই অবাক কবে দিয়েছিল। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন—

> 'বিদ্যাসাগব যিনি সাবাজীবন স্ত্রী স্বাধীনতাব জন্য প্রাণপাত কবলেন তিনিই মেয়েদেব মঞ্চে আনাব প্রতিবাদে মঞ্চেব সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ কবলেন।'[৭]

অথচ প্রকৃত সত্য হল, এইসব অভিনেত্রী তথা নটী না হলে বাংলা থিয়েটাব দাঁড়াতই না। তাঁদেব অংশগ্রহণ, আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদনেব মূল্যেই আজ বাংলা থিয়েটাব তথা বঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে উন্নত সংস্কৃতিব স্মাবক।

তুমিই করেছ মোরে এত গরবিনী

নটী বিনোদিনী ব্রাত্যঘবেব মেয়ে ছিলেন না, ছিলেন না নিষিদ্ধ পল্লিব বাসিন্দা। তিনি থাকতেন ১৪৫ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে মা এবং মাতামহীব সাথে নিদারুণ দাবিদ্র্যেব মধ্যে। মাতামহীব বাড়িব অন্তর্গত অনেক খোলাব ঘবে থাকত দবিদ্র ভাড়াটিযাবা। সেই ছিল বিনোদিনীব

পরিবারের আয়ের উৎস। আর একটি ছিল পাকা ঘর। সে ঘরটি ভাড়া নিয়েছিলেন 'গঙ্গাবাঈজী'। সেই গঙ্গামণির ঘরে যাতায়াত ছিল বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ শেঠের। দয়ার্দ্রচিত্ত এই দুই ব্যক্তি বিনোদিনীর পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা দেখে প্রস্তাব করেন বিনোদিনীকে থিয়েটারে দেবার। দুঃস্থ পরিবার গ্রাসাচ্ছাদনের আশায় এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। বিনোদিনীর কথায় 'তখন পূর্ণবাবু আমাকে সুবিখ্যাত 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' ১০ টাকা মাহিনাতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন'। সাংসারিক কষ্টের লাঘব হবে বিবেচনায় ১১ বৎসরের বিনোদিনীর মঞ্চজগতে পদার্পণ, ১৮৭৪ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। অভিনয়-জগতে তিনি এসেছিলেন নিতান্তই ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায়। তৎকালীন অগ্রগণ্যা অভিনেত্রী বিনোদিনীর অভিনয়-জগতে প্রবেশ ছোট্ট একটি চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। বিনোদিনীর উক্তি—

> 'আমায় 'বেণীসংহার' পুস্তকে একটি ছোট পার্ট দিলেন, সেটী দ্রৌপদীর একটি সখীর পার্ট।'

প্রকৃতপক্ষে ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' অবলম্বনে নাটকটির প্রকৃত নাম ছিল 'শত্রুসংহার'। বালিকা বয়সে এত গভীরতা থাকার কথা নয় বলেই হয়তো এ ত্রুটি। সেই হল সূচনা। অঙ্কুরেই তিনি চিনিয়ে দিলেন তাঁর প্রতিভাকে। করে যেতে লাগলেন একের পর এক অভিনয়। তারপর ১৮৭৬ এর ৮ এপ্রিলের অভিনয়ের পর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৭ মাস গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ থাকে।

বিনোদিনী তখন চলে এলেন মাননীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'বেঙ্গল থিয়েটারে'। যদিও তিনি বলেছেন—'সঠিক মনে পড়ে না কি কারণবশতঃ আমি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ করি'। তবে এ কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করেছেন—'এই স্থানে শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতে আরম্ভ করি'। আবার সোচ্চারে বলেছেন— 'বেঙ্গল থিয়েটারই আমার কার্য্যের উন্নতির মূল'।

১৮৭৭-এর ৬ অক্টোবর গিরিশচন্দ্র 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর লিজ নেবার পর সেই রঙ্গালয়ের নাম হল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' এবং বিনোদিনী তখন সেখানেই যোগ দিলেন। এ প্রসঙ্গে বিনোদিনী বলেছেন যে, গিরিশ ঘোষই নাকি শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন— আপনি যদ্যপি বিনোদকে আমাদের থিয়েটারে দেন, তবে বড়ই ভাল হয়'। কিন্তু স্বয়ং গিরিশচন্দ্র 'বঙ্গরঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী'তে বলেছেন—

> "বিনোদিনী হয়তো কেদারবাবু বা অন্য কাহারও নিকট শুনিয়া থাকিবে যে, আমি শরৎবাবুর নিকট হইতে বিনোদিনীকে যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছি। বিনোদিনীর প্রশংসার জন্য এ কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।"[৮]

ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৮-এ 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্রের হাত ভেঙে গেলে সাময়িকভাবে তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর নেন। এ সময় থেকেই ন্যাশনাল-এর দুর্নাম শুরু হয়। ১৮৭৯, ১৯শে এপ্রিল 'সুলভ সমাচারে' কেশব সেন লেখেন—'ন্যাশনাল থিয়েটার-এর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আসিতেছে। থিয়েটারের লোকেরা মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করে...'। ১৮৮৩ এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'রাবণবধ' অভিনয়ের পরে প্রতাপচাঁদ জহুরীর সঙ্গে

অবনিবনা হওয়ায় বিনোদিনী, গিরিশচন্দ্র এবং আরো অনেকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছেড়ে দিলেন। বিনোদিনী নিজেই বলেছেন—

> "প্রতাপবাবু ভিতরে আসিলে আমি আমার মাহিনা চাহিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—'মাহিনা কেয়া? তোম তো কাম নেহি কিয়া!'... 'বটে মাহিনা দিবেন না' বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আর গেলাম না।"

গিরিশচন্দ্র তখন 'ক্যালকাটা ষ্টার কোম্পানী' নামে এক নতুন থিয়েটার খোলেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছেড়ে আসা অমৃতলাল মিত্র, নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোর পাঠক, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, বিনোদিনী-দের নিয়ে। সবশেষে ১৮৮৩-এর জুলাই থেকে ১৮৮৭-এর জানুয়ারিতে 'ষ্টার' থিয়েটার-এ বিনোদিনীর অভিনয়ের পরিসমাপ্তি। এত অল্পসময়ে মোট ৮০টি নাটকে ৯০টিরও বেশি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। নিজেই বলেছেন— 'আমি নানারকম পাঠ অভিনয় করিয়াছিলাম'। কখনো একই নাটকে ৭টি ভূমিকায় ('মেঘনাদবধ'— চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, বারুণী, রতি, মায়া, মহামায়া ও সীতা), আবার কখনো বা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্রে ('বিষবৃক্ষ'— কুন্দ, 'সধবাব একাদশী'— কাঞ্চন) অভিনয় প্রতিভার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছেন তিনি।

কখনো বা অপ্রস্তুত অবস্থায় আদেশ এসেছে নবাবপুত্রী আয়েষার পোশাক ছেড়ে দাসী আসমানীর পার্ট করতে হবে। তাই করতে হয়েছে বিনোদিনীকে 'বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া'। নির্বিবাদে এইসব ঘটনা যেমন তাঁর অভিনয়-ক্ষমতাকে প্রকাশ করেছে তেমনি প্রকাশ করেছে তাঁর নিষ্ঠা ও আনুগত্যকে। তাঁর নিজের উক্তিতেই দেখি—

> "বুদ্ধির দোষে ও অদৃষ্টের ফেরে আত্মরক্ষা না করিলেও কখনও অভিনয় কার্য্যে অমনোযোগী হই নাই। অমনোযোগী হইবার ক্ষমতাও ছিল না। অভিনয়ই আমার জীবনের সার সম্পদ ছিল।"

বিনোদিনীর এই সৃজনীপ্রতিভা সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু বলেছেন—

> "বঙ্গীয় অভিনেত্রীদিগের মধ্যে বিনোদিনীর মত ললিতকলার মাধুর্যে মগ্ন হইবার বা আপনার অভিনেয় ভূমিকাব সহিত তন্ময় হইবার শক্তি সচরাচব দেখা যায় না।"

একবার বিনোদিনী পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পান। সারারাত্র গরম সেঁক দিয়ে পরদিন যথারীতি থিয়েটারে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু আঘাত এতই গুরুতর ছিল যে, এরপর একমাস তাঁকে বিছানায় কাটাতে হয়। শুধু অভিনয় নয়, তাঁর রূপসজ্জা ছিল নিখুঁত। অভিনয়ে তাঁর সাজসজ্জা এতই নিপুণ হত যে, একটি ভূমিকায় তাঁকে দেখে অন্যভূমিকায় তাঁকে শনাক্ত করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। গিরিশচন্দ্র বলেছেন—

> "সজ্জিত হইতে শেখা অভিনয় কার্য্যের প্রধান অঙ্গ, এ শিক্ষায় বিনোদিনী বিশেষ নিপুণা ছিল।"[৯]

শুধুমাত্র গিরিশ ঘোষই নয়, 'ইংলিশম্যান', 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় কেউ তাকে 'সাইনোরা', কেউ বা 'ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ ষ্টেজ' অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। 'কপালকুণ্ডলার'

অভিনয় দেখে কেদারনাথ চৌধুরীর মনে হয়েছিল 'এই মেয়েটি যেন কপালকুন্ডলা'। এমনকী 'মৃণালিনী'তে মনোরমার চরিত্র দেখে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

> "আমি মনোরমার চরিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিব তাহা মনে ছিল না, আজ মনোরমাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার মনোরমাকে সামনে দেখিতেছি।"[১০]

এছাড়া ফাদার লাফোঁ, এডুইন আর্নলড, কর্নেল অলকট প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেন। শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় তো তাঁর 'রিজ এন্ড রায়ৎ' পত্রিকায় বিনোদিনীর সম্পর্কে প্রশংসনীয় মন্তব্য করেন—

> "But last not least shall we say of Binodini? She is not only the Moon of Star Company, but absolutely at the head of her profession in India... She is certainly a lady of much refinement of feeling as she shows herself to be one of inimitable grace."[১১]

এ ছাড়া উনিশ শতকের শেষে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা ও বইয়ে এই নাট্যাভিনেত্রীর খ্যাতির পাশাপাশি হত বিরূপ সমালোচনাও। তবে তা অভিনয়কেন্দ্রিক ছিল না, ছিল অভিনেত্রীকেন্দ্রিক। এমনকী যেহেতু অভিনেত্রীদের বেশিরভাগ ছিলেন বারাঙ্গনা শ্রেণিভুক্ত কাজেই সেসব সমালোচকদের স্থূল ধারণা ছিল 'এইরূপ লোকদ্বারা এরূপ উচ্চঅঙ্গের চরিত্র অভিনয় করাই দোষ'। অথচ 'চৈতন্যলীলা' থিয়েটারে বিনোদিনীর অভিনয় দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন 'চৈতন্য হোক' বলে। বিনোদিনীর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশীর্বচন সুদূরপ্রসারী। 'চৈতন্যলীলা' ছাড়া আরো পাঁচটি নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনীর অভিনয় দেখেন। বিনোদিনীর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাশীর্বাদ লাভের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন অক্ষয়কুমার সেন, তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ পুথিতে :

> "একদিন মঞ্চমধ্যে প্রভুর গমন
> নিরখিয়া শ্রীগিরিশ পুলকিত মন
>
> * * *
>
> কি লম্পট কি কপট হীন হেয় মন,
> বেশ্যা বাবাঙ্গনা জাতি অভিনেত্রীগণ।
>
> * * *
>
> গিরিশের আশ্বাস-বচনে পেয়ে বল।
> উপনীত অবশেষে বারাঙ্গনাদল।।
>
> * * *
>
> তার মধ্যে একজন বিনোদিনী নাম।
> মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে ধরায় অজ্ঞান।।
> প্রসারিত ঠাকুরের শ্রীচরণতলে।
> দিব্য-ভাব সমুদিত অন্তর-অঞ্চলে।।"[১২]

চরম প্রাপ্তির পরম তৃপ্তিতে ভরপুর বিনোদিনী সেদিন সব কিছু উপেক্ষা করে অনায়াসে বলেন :

> "জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করিনা। কেননা আমি জানি যে 'পরমারাধ্য পরম পূজনীয় 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' আমায় কৃপা করিয়াছিলেন"।

বিনোদিনীর অভিনয় নিয়ে শেষকথা বলেছেন গুরু গিরিশচন্দ্র— 'বিনোদ রঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেত্রী হইবে তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছিল'। বলেছেন মোক্ষম কথা :

> "কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়— তাহা আর আমায় নূতন করিয়া লিখিতে হইবে না। বিনোদিনীর 'নাট্যজীবন' উক্ত প্রবন্ধের সম্যক উদ্দেশ্য সাধন করিবে।"[১৩]

কি চাই কি নাহি পাই কিসের কারণ

প্রতাপচন্দ্র মহাশয়ের থিয়েটার ত্যাগের পর বিনোদিনীর তখন অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। 'আমি যে সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তিনি তখন বিবাহ করেন ও ধনবান যুবকবৃন্দের চঞ্চলতাবশতঃ আমার প্রতি কতক অসৎব্যবহার করেন'। আত্মাভিমানী বিনোদিনী নিদারুণভাবে আহত হলেন। তখন গুর্মুখ রায় একটি থিয়েটার করার জন্য ব্যস্ত, শর্ত বিনোদিনীকে লাভ। গুর্মুখ রায়ের একমাত্র শর্ত ছিল বিনোদিনী একান্ত তাঁর বশীভূত না-হলে তিনি থিয়েটারের জন্য কোন কার্য করবেন না। গোটা 'ক্যালকাটা ষ্টার কোম্পানী' তখন বিনোদিনীর পদপ্রান্তে। বিনোদিনীর তখন উভয়সঙ্কট। দ্বিধাদ্বন্দ্বে জর্জরিত বিনোদিনী একবার ভাবলেন 'শারীরিক মেহনত দ্বারা নিজে ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে যদি সক্ষম হই, তবে আর দেহবিক্রয় দ্বারা পাপ সঞ্চয় করিব না ও নিজেকেও উৎপীড়িত করিব না'। আবার ভাবেন 'আমা হইতে যদি একটি থিয়েটার ঘর প্রস্তুত হয় তাহা হইলে আমি চিরদিন অন্নসংস্থান করিতে পারিব'। কিন্তু 'একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যায়রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি বাধা দিতে লাগিল'। শেষপর্যন্ত 'সম্ভ্রান্ত নাট্যবিশারদদের' অনুরোধে ও থিয়েটারের বৃহত্তর স্বার্থে বিনোদিনী আত্মত্যাগ করলেন। 'ক্যালকাটা ষ্টার কোম্পানী'র অভিনেতাদের কাতর অনুরোধে পূর্বরক্ষকের আশ্রয় ত্যাগ করলেন।

> 'গুর্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম'। এই আশায় 'যাহাদের সহিত চিরদিন ভাই ভগ্নীর ন্যায় একত্রে কাটাইযাছি, যাহাদের আমি চিববশীভূত... আমার দ্বারা থিয়েটার স্থাপিত হইলে চিরকাল একত্রে ভ্রাতাভগ্নীর ন্যায় কাটিবে।'

থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসাবশত বিনোদিনী গুর্মুখ রায়ের দেওয়া অর্ধলক্ষ টাকার প্রলোভন ত্যাগ করলেন। এদিকে বিনোদিনীর চাপে গুর্মুখ রায় থিয়েটার প্রস্তুতির জন্য অর্থ ব্যয় করে চললেন। কাজও চলতে লাগল প্রবল উদ্যমে দিবারাত্র। উৎফুল্ল সহকর্মীরা বিনোদিনীকে প্রশংসায় উদ্বেলিত করে বললেন :

> "এই যে থিয়েটার হাউস হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরও তোমার নামটি বজায় থাকিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম 'বি' থিয়েটার হইবে।"

কাজ শেষ হল, রেজিস্ট্রিও হল কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো থিয়েটাবের নাম 'বি' থিয়েটার হল না। যুগাতীত চিন্তা করার ক্ষমতা বিনোদিনীর ছিল না বলেই পুরুষের চেতনা, ভাষা তিনি বুঝতে পারেননি, তাই তাঁকে প্রতারিত হতে হয়েছে বারবার। বিনোদিনী থিয়েটারের নাম কী হয়েছে জানতে চাইলে দাশুবাবু প্রফুল্লভাবে বলিলেন যে 'ষ্টার'।

রঙ্গালয়ের ইতিহাসে রচিত হল এক কলঙ্কময় প্রতারণার অধ্যায়। থিয়েটারের জন্য বিনোদিনী প্রবৃত্তির প্রতিকূলে গিয়ে আত্মবলিদান করেছিলেন, তাঁর কোনো শর্ত ছিল না, তবে তাঁকে এমন প্রতারণা কেন? বিনোদিনী বলেছেন :

> "পরে মনে মনে ভাবিলাম যে, উঁহারা কি শুধু আমায় মুখে স্নেহ মমতা দেখাইয়া কার্য্যউদ্ধার করিলেন। ... আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে উঁহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমনভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন।"

শুধু তাই নয়, তিনি যাতে থিয়েটারে বেতনভোগী হিসেবে না থাকতে পারেন, তার জন্যও সকলে চেষ্টা করতে লাগলেন। এ যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রচিত 'তিনকড়ি' এবং 'বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী' একত্রে প্রকাশনার মুখবন্ধে নাট্য ঐতিহাসিক শ্রী হরীন্দ্রনাথ দত্ত একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন :

> "থিয়েটারের 'বি-থিয়েটার' নামকরণ না করা বিনোদিনীর মনে ক্ষোভের কারণ হলেও ভবিষ্যতেব দিকে দৃষ্টিপাত করলে অযৌক্তিক হয়েছিল বলে মনে হয় না।"

এমন কথা নিতান্তই অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক, যেখানে বিনোদিনী নিজেই বলেছেন 'এত টাকার স্বার্থত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট না হইয়াছিল তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অতিশয় মনোকষ্ট হইয়াছিল'। এমনকী লাহোরে অভিনয় দেখে গোপাল সিং নামে 'একজন মস্ত বড়লোক' তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই নিশ্চিত ও আরামপ্রদ জীবনও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন শুধুমাত্র থিয়েটারের স্বার্থে।

'বি' থিয়েটারের নাম না-হওয়াতে বিনোদিনী ক্ষুব্ধ হননি, তিনি বেদনার্ত হয়েছিলেন বিশ্বাসভঙ্গের আঘাতে, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের যন্ত্রণায়। প্রথার জঞ্জালে আবদ্ধ হরীন্দ্রনাথ দত্ত সে কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, ভাবতে কষ্ট হয়। থিয়েটারের নাম 'বি' থিয়েটার হয়নি বটে, কিন্তু কলঙ্কিত নায়কেরা থিয়েটার থেকে বিনোদিনীর নাম বিলোপ করতে পারেননি আজও এবং ইতিহাসও এই অভাজনদের ক্ষমা করেনি।

তবু এরই মধ্যে ১৮৮৩-র ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' দিয়ে 'ষ্টার থিয়েটারের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। বিনোদিনী সেখানে 'সতী'র ভূমিকা নেন। ১৮৮৩-এর শেষের দিকে স্বত্বাধিকারী গুর্মুখ রায় 'সমাজ পীড়নে বা অন্য কারণে হোক' শর্তাধীনে 'ষ্টার' থিয়েটারের স্বত্ব হস্তান্তর করতে চাইলেন। সেই শর্ত বিনোদিনীকে স্বত্বদান— ন্যূনপক্ষে অর্ধস্বত্ব। কিন্তু অভিনেতাদের প্রতিরোধে এ স্বত্বও তিনি পেলেন না। এ-ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকাও প্রশ্নাতীত নয়। মাত্র ১১ হাজার টাকায় 'ষ্টার'-এর স্বত্ব কিনে নিলেন অমৃতলাল মিত্র, দাশুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল বসু।

তবু অপমানের অত্যাচার শেষ হল না। 'পরিশেষে নানারূপ মনোভঙ্গ দ্বারা থিয়েটার কার্য্য

করা দুরূহ হইয়া উঠিল।... কাজেই আমাকে থিয়েটার হইতে অবসর লইতে হইল।'— বলেছেন বিনোদিনী।

১৮৮৭-এর ১লা জানুয়ারি 'বেল্লিকবাজার' নাটকে রঙ্গিনীর চরিত্রে অভিনয়ই তাঁর শেষ অভিনয়। আত্মাভিমানী বিনোদিনী আশাহত ব্যথাহত হয়ে নাট্যজগৎ থেকে বিদায় নিলেন।

নারী আবরণমাত্র উপরে আমার

যাই হোক না কেন, থিয়েটার জগৎ থেকে বিনোদিনীর অবসরগ্রহণ অনেকের কাছেই রহস্যাচ্ছন্ন মনে হয়েছে। কেউ বা তাঁর মধ্যে ঈর্ষাজনিত অভিমান, বিদ্বেষজনিত ক্ষোভ দেখতে পেয়েছেন। কেউ বা রামকৃষ্ণের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর মঞ্চ পরিত্যাগের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে শিক্ষাগুরু গিরিশচন্দ্রের নীরব ভূমিকা লক্ষ করার মতো। সমাজ পরিত্যক্তা করুণাপ্রার্থী বিনোদিনী নিজেকে বলেছেন 'নরকের কীট'— তার মতো অভাগিনীর তো করুণাই সম্বল, তাই শেষ পর্যন্ত নিজেকেও দোষারোপ করতে হয়েছে। এই দোষারোপ বোধহয় তাঁর নিজেকে নয়, তাঁর নারীসত্তাকে :

> "সে যাহাই হউক, একসঙ্গে থাকিতে হইলে ক্রুটী হইয়া থাকে, আমারও শত সহস্র দোষ ছিল।"

এ কি অভিমানভরা স্বীকারোক্তি? অসহায় বিনোদিনী দুর্বল, তাই তাঁর প্রতি এ আচরণ, বিনোদিনী অবলা নারী, তাই কি এই সাহস? নতুবা কেন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসরক্ষা করতে পারলেন না থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা? এ ঘটনা একদিকে যেমন স্বার্থান্বেষী পুরুষতন্ত্রকে চিনতে সাহায্য করে, তেমনি বোঝা যায়, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নারীর ওপর চলছিল একধরনের নির্যাতন, আর বিনোদিনী এই নির্যাতন থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেই। বিনোদিনী লিখেছেন :

> "ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করাকালীন এত ঘাত প্রতিঘাত সহিতে হইয়াছিল যে ইহার জের থিয়েটার হইতে অবসর লওয়ার পরও শেষ হয় নাই।"

বিনোদিনী এবার কলম তুলে নিলেন হাতে। সে যেন মসী নয়, অসি। ক্ষুরধার আক্রমণ করলেন সমাজকে। 'সোহাগ' কবিতায় সমগ্র পুরুষজাতিকে অভিযুক্ত করেছেন তিনি :

> "জানি হে পুরুষজাতি নিঠুর নিদয়
> থাকে যবে যার কাছে
> যেন সে তাহার আছে
> অদর্শনে কোন কথা প্রাণে নাহি রয়।"[১৪]

গিরিশচন্দ্রের কথায় এ যেন 'সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ'।

নাট্যঐতিহাসিক হরীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কেউই বিনোদিনীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে বোধ হয়নি। হরীন্দ্রনাথ দত্ত এক জায়গায় বলেছেন :

> "বারবণিতার নামানুসারে থিয়েটারের নাম হলে সেটি যে কখনও জনসমর্থন পেত না এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।"[১৫]

আর বিনোদিনী আত্মজীবনীর একজায়গায় বলেছেন :

> "যে সকল ধনবান পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঘৃণা করিয়া থিয়েটারে আসিতেন না তাঁহাদের দ্বারাই দুই একদিন পূর্বে টিকিট ক্রীত হইয়া অধিকৃত হইত।"

অথবা বিনোদিনী যখন বলেন :

> "বারাঙ্গনা জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে? কিন্তু সে কলঙ্কিনী ঘৃণিত কোথা হইতে হয়?... অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চিরকলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা? যাঁহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আদৃত তাঁহাদেব মধ্যে কেহ কেহ নন কি?... ঐ অবলা প্রতারকেরাই সমাজপতি হইয়া নীতি পরিচালক হন। ... শত দোষ করিলে ক্ষতি নাই— কিন্তু নারীর নিস্তার নাই টলিলে চরণ।"

এই প্রত্যুত্তর দ্বিচারী সমাজপতিদের মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত নয়? এখানেই শেষ নয়, প্রশ্ন করেছেন, 'আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহা অনুসন্ধান করিয়াছেন?' তাঁব এই প্রশ্ন আমাদেব কযাঘাত করে না? অথবা 'অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয় হইয়া স্থানাভাবে আশ্রযাভাবে বারাঙ্গনা হয় বটে; কিন্তু তাহারাও প্রথমে রমণী-হৃদয় লইয়া সংসারে আসে।'— এইধরনের উক্তি কি আমাদের সমস্যার উৎস সন্ধানে ব্রতী করে না?

জীবন শুকাল তবু বারি না মিলিল

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির কারণে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনে ছিল একধরনের সম্পর্কহীনতা। আর এই অতৃপ্তির প্রকাশ ঘটত মেয়েদের মধ্যে বিচিত্রভাবে। কারো মধ্যে দেখা যেত স্বামীর প্রতি অপরিসীম ঘৃণা, কেউ বা দায়ী করতেন নিয়তিকে, কেউ বা স্বামীকে। আর অবস্থা বিপাকে এদের মধ্যে কেউ বা পঙ্কিল জীবনের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হতেন। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে অন্যের আগ্রহই বেশিরভাগ মহিলাদের এপথে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করত। আর তখন তাঁদের পরিচিতি হত একজন বারাঙ্গনা বা পণ্যানারী হিসেবে। এমতাবস্থায় জীবিকার্জনের জন্য রঙ্গমঞ্চই তাঁদের দিয়েছিল নতুন একটি পথের সন্ধান। দেখা যায়, বিনোদিনীকেও অভিনয় জগতে নিয়ে আসেন গঙ্গামণি নামে এক অভিনেত্রী।

দারিদ্র্যের সংসারে অনেকক্ষেত্রে বিয়েটা ছিল উপলক্ষ, লক্ষ্য হল বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ, বিনোদিনী তাঁর বাল্যজীবনে এ ঘটনা লক্ষ করেছেন, তাই তো বলেছেন :

> "তখন আমার মাতামহী একটা মাতৃহীন আড়াই বৎসর বয়সের বালিকার সহিত আমার পঞ্চমবর্ষীয় শিশুভ্রাতার বিবাহ দিয়া তাহার মাতার যৎকিঞ্চিত অলঙ্কারাদি ঘরে আনিলেন। তখন অলঙ্কার বিক্রয়ে আমাদের জীবিকা চলিতে লাগিল।"

আর এসব ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যসম্পর্ক উপেক্ষিত হত। কারণ অর্থসংগ্রহ যেহেতু ছিল মূল উদ্দেশ্য, কাজেই অন্য সবকিছুই সেখানে অবহেলিত। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর ব্যভিচারের পেছনে একমাত্র কারণ ছিল স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অবহেলিত সম্পর্ক। বিনোদিনীরও বিয়ে হয়েছিল ৪/৫ বছর বয়সে কিন্তু স্বামী তাঁকে গ্রহণ করেননি অথবা গ্রহণে হয়তো ছিল পরিবারের বাধা। আর এজন্যেই 'আমাদের অবস্থা গতিকে আমাকে একটা সম্ভ্রান্ত যুবকের

আশ্রয়ে থাকিতে হইত'— বলেছেন বিনোদিনী। তবে সত্যি বলতে কি, সামাজিক নিরাপত্তা তাঁদের জীবনকে অন্যপথে চালিত করতে সক্ষম ছিল, যা তাঁরা পাননি। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, ব্যভিচারী নারী সমাজের চোখে যতটাই নিকৃষ্ট হোন না কেন, ব্যভিচারী পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু বিপরীত বিশেষণই প্রয়োগ হত। কারণ একটাই, সে পুরুষ। তসলিমার 'সনদপত্র' কবিতায় আছে—

"পুরুযেরা ভদ্রলোক,
পুরুষেব জন্য সতীত্বের সনদ লাগে না।"

সমাজ বিনোদিনীকে বারাঙ্গনা আখ্যা দিয়েছে। বিনোদিনী নিজেও অজস্রবার একথা উচ্চারণ করেছেন, অকপটে স্বীকার করেছেন নিজের নাটকীয় জীবনের কথা। 'যে অবস্থা গোপন রাখা আত্মজীবনী লেখার কৌশল, সে কৌশল ক্ষুণ্ণ হইয়াছে' বলে গিরিশচন্দ্র বললেও আমরা সপ্রশংসচিত্তে লক্ষ করি বিনোদিনীর মধ্যে কোনো দ্বিচারিতা ছিল না। দ্বিচারিতা ছিল তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিনোদিনীর মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করেননি। বিনোদিনী তাই সমাজকে তীব্র কশাঘাত করেও নিজের সত্তাকে গোপন করেননি। বিনোদিনী সত্যাশ্রয়ী, তাই সম্ভ্রান্ত নাট্যবিশারদেরা যখন তাকে অন্যায় পরামর্শ দেন তাঁর আশ্রয়দাতা সেই সম্ভ্রান্ত যুবককে সামান্য ছলনা করতে, তাতে তিনি আহত হলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমি ঘৃণিতা বারনারী হইলেও অনেক উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, প্রতারণা বা মিথ্যা ব্যবহারকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম'। সে-ক্ষেত্রে আমরা কি সত্যদ্রষ্টা গুরু গৌতমের কথা বলতে পারি না: তুমি দ্বিজোত্তমা, তুমি সত্যকুল জাতা? বিনোদিনী সেই দৃষ্টিতেই আমাদের কাছে ব্রাত্য নন, না জন্মে, না কর্মে।

ছাড়িয়ে আশার আশা হয়েছি দুঃখিনী

গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, 'যদি বঙ্গরঙ্গালয় স্থায়ী হয় বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী আগ্রহের সহিত অন্বেষিত ও পঠিত হইবে'।[১৬] সত্যদ্রষ্টা নাট্যকারের এ কথা মিথ্যা হয়নি। বিনোদিনী দাসী স্মরণীয় মূলত দুটি কারণে— প্রথমত তিনি রঙ্গমঞ্চের নটী, দ্বিতীয়ত তিনি আত্মজীবনীর লেখিকা। তাঁর এই আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন সাহিত্যের গবেষক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে :

> "রাসসুন্দরী দাসীর যে আত্মজীবনী সেটি খুব স্মরণীয়, তবে তিনি ভদ্রঘরের মহিলা ছিলেন। কিন্তু বিনোদিনীর ক্ষেত্রে handicapped টা আরো বেশী ছিল, সেইজন্য বিনোদিনী এই যে লিখেছিলেন, এই লেখা অসামান্য।"[১৭]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মেয়েরা লিখতে শুরু করেন। তার মধ্যে অধিকাংশ লেখিকার প্রতিবেদনের বিষয় ছিল সুগৃহিণীর আদর্শকর্তব্যকেন্দ্রিক প্রবন্ধ, স্ত্রীশিক্ষার উপর বিভিন্ন রচনা, স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক প্রবন্ধ। প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম মহিলার আত্মজীবনী 'আমার জীবন'। কিন্তু সেখানে লেখিকা রাসসুন্দরী কাউকে সরাসরি দোষারোপ করেননি। যে মহিলা স্বামী সম্পর্কেই কিছু বলেননি, দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে তাঁর রচনায় কোনো মন্তব্য আশা করা যায় না। সেদিক দিয়ে বিনোদিনী যথেষ্ট খোলামেলা। নিজের জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার কাহিনি যেমন স্পষ্ট করে বলেছেন তেমনি বঞ্চনার কথাও তুলে ধরেছেন অকপটভাবে

একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ একাকী বিনোদিনী আত্মজীবনী লিখতে অগ্রসর হলেও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঘৃণিতা বারনারীর জীবনকাহিনি শোনার লোক এ সংসারে নেই। তাই লেখার মধ্যে হয়তো আত্মমুক্তির পথ খুঁজেছিলেন। ব্রাত্যজীবন সবার কাছে ব্যক্ত করার জন্যে নয়, লেখনীর মাধ্যমে নিজের কাছে মেলে ধরা বা খুলে ধরার জন্যেই। তিনি লিখেছেন নিজের জীবনকথা খোলাখুলিভাবে, আবার উন্নাসিক পাঠকবর্গের উদ্দেশে বলেছেন :

> "যাঁহারা এই ক্ষুদ্র লেখা দেখে ঘৃণা বা উপহাস করিবেন, তাঁহারা যেন এ পুস্তক পাঠ না করেন।"

বিনোদিনী নটী, কাজেই ভদ্রসমাজে তাঁর যাতায়াত যেমন নিষিদ্ধ, তাঁর লেখারও তেমনি ভদ্রসমাজে প্রবেশাধিকার নেই, যথার্থ স্বীকৃতি আশা করা তাঁর কষ্টকল্পনা। এজন্যে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর যথাযোগ্য স্থান হয়নি। বিনোদিনী আপন জীবনকথা লিখেছেন, লিখেছেন অনেক কবিতা। লেখিকা হিসেবে তাঁর চর্চার ব্যাপ্তি ৪০ বৎসর। কিন্তু তবু সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নামোল্লেখ নেই। তাঁর আত্মজীবনী অথবা তাঁর কাব্যসম্ভার এখনও বাংলা সাহিত্যের পদবিভুক্ত হয়নি। ব্রাত্য নারীর রুদ্ধ ধারা হয়ে বন্দি হয়ে রয়েছে। 'ভাগ্যহীনা পতিতা, কাঙ্গালিনীর এই নিবেদন' তাঁর আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যের অবহেলিত সম্পদ, নাট্যজগতের এক ঐতিহাসিক দলিল, নারী-নির্যাতনের প্রকৃষ্ট চিত্র। অথচ তাঁরও তো 'ছিল অন্য নারী সম হৃদয় কোমল'; 'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই' কিন্তু পেলেন কোথায়? আজ নারীবাদ নিয়ে চারদিকে যখন সমধিক চর্চা, বিস্তর আলোচনা চলছে, নারীকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তার একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে চলেছে তখন অজানা অচেনা বিনোদিনী এবং তাঁর প্রতিবেদন নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিনোদিনীর 'আমার কথা' তাঁর অভিনয় জীবনের বৃত্তান্ত, অভিনয় জগৎ সম্বন্ধীয় ইতিহাস, একটি নারীর যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনকাহিনী এবং তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সার্থক সমন্বয়। আর একারণেই তিনি শুধু স্মরণীয়া নন, 'আমার কথা' তাঁর প্রতিভার যথার্থ প্রস্ফুটন। অভিনেত্রী মহিলারা যে অবাঞ্ছিত নয়, বারাঙ্গনা বলে ফেলনা নয়, বিনোদিনী সেই ভাষ্যেরই সূত্রধার। গিরিশচন্দ্র ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, তাই বিনোদিনী সম্পর্কে তাঁর উদার স্বীকারোক্তি :

> "তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নিকট আমি সম্পূর্ণ ঋণী একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। ... দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ যদিও বহুবছর যাবৎ কোনও রঙ্গালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, কিন্তু সে যে সুনাম— যে সুযশ— যে সুখ্যাতি— যে আদর— যে আপ্যায়ন সর্বসাধারণের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিল, আদর্শ অভিনেত্রী বলিয়া সকল অভিনেত্রীর জিহ্বায় আজ পর্যন্ত যাহার নাম উচ্চারিত হয়... এবং সে স্তম্ভচ্যুত হইয়া দেশীয় রঙ্গমঞ্চ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।"[১৮]

উনিশ বা বিশ শতকের সমাজে নারীর এক আদর্শায়িত প্রতিমা নির্মাণই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সবাই সেই প্রতিমার অনুকরণে নিজেকে তৈরি করতে চেয়েছেন। প্রথাগত নারীর আদর্শ আর শিক্ষিত নারীর আদর্শ— নারীর এই দুই রূপের কথা মনে রেখেই নিজেদের সত্তা বা অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন বিভিন্ন নারী তাঁদের আত্মজীবনীতে। তথাপি তাঁদের মধ্যে থেকেও

বিনোদিনীকে স্বতন্ত্রভাবে শনাক্ত কবা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে শুধুমাত্র তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য এবং ব্যতিক্রমী সামাজিক অবস্থানের জন্য।

বিনোদিনীর ভাষায় তিনি 'সমাজপতিতা ঘৃণিতা বারনারী' অথচ তাঁব এই একমাত্রিক পরিচয়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় এক প্রতারিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উঁচুদরের অভিনেত্রী এবং লেখিকার বহুমাত্রিক জীবনকাহিনি।

নটীর প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বিনোদিনীকে নটী শ্রেণিভুক্ত করা যায় না। তথাপি হয়তো বা পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টিতে তাঁর পরিচয় শুধুমাত্র বিনোদিনী নামেই নয়, আগে নটী তারপর বিনোদিনী। আবার এমনও হতে পারে যে, নটসাম্রাজ্যেব সম্রাজ্ঞী, তাই তিনি নটী বিনোদিনী। তবু প্রশ্ন জাগে, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এমন স্বীকৃতি কি সম্ভব? কারণ আমরা দেখি, তথাকথিত মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজে তাঁব স্থান হযনি, তাঁদেব জন্যে যে সম্মান, মর্যাদা নির্দিষ্ট ছিল, বিনোদিনীর জন্যে তা ছিল না, কারণ তিনি ব্রাত্য, তিনি মন্ত্রহীন, তিনি সমাজ-পবিত্যক্ত। তাই তো 'সত্য যদি অপ্রিয় ও কটু হয়, তাহা সকল সময়ে প্রকাশ করা উচিত নয়'— গিরিশচন্দ্রের এ উপদেশ মনে রেখেই সচেতনভাবে লেখা শুরু করেছিলেন তিনি শুধুমাত্র আত্মমুক্তি ও আত্মতৃপ্তির জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যের আহ্বানে তিনি স্বয়ংপ্রকাশ হয়েছেন। বঞ্চিত জীবনের করুণকাহিনি বলে সহানুভূতি পাবার চেষ্টার কথা বললেও হয়তো বা লেখার মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখতে চেয়েছিলেন, দেখাতে চেযেছিলেন পববর্তী প্রজন্মের কাছে শেষ বিচারেব আশায়। আত্মজীবনী তো আত্মপ্রকাশেরই নামান্তর। 'অশান্তি যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে'— এজন্যেই গিবিশচন্দ্রের সবকিছু প্রকাশ না-কবার পবামর্শ বিনোদিনীর পক্ষে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। 'নারীর দুঃখেব দশা অপমানে জড়ানো' জেনেও তিনি পেছন ফেবেননি। সত্তা ও অপরতার দ্বন্দ্বে আলোড়িত বিনোদিনীর ব্যক্তিসত্তার জয় হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনী তাঁর দুঃখপূর্ণ জীবনকথাই শুধু নয়, তৎকালীন সমাজের পুরুষতন্ত্রেব বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার। এ-ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের অনুমান, 'যে পাঠক এই জীবনী পাঠ করিবেন... লেখনীর কঠোরতায়, প্রারম্ভে যে সহানুভূতি প্রার্থনা আছে— তা ভুলিয়া যাইবে'— আজ একবিংশ শতকের পদপ্রান্তে তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। তবে তিনি এ জীবনীপাঠের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে যে বলেছেন—

> "এ জীবনীপাঠে ধর্মাভিমানীর দম্ভ খর্ব্ব হইবে, চরিত্রাভিমানী দীনভাব গ্রহণ করিবে, এবং পাপীতাপী আশ্বাসিত হইবে"।[১৯]

এ কথা মোক্ষম সত্য।

বিনোদিনী জীবনে একটার পর একটা আঘাত সহ্য করেছেন। তাঁর আশা ছিল অনেক, কিন্তু অনেক আশাই অপূর্ণ থেকে গেল, তাই তো 'স্বপ্নে আশা' কবিতায় তাঁর অভিমানাহত কণ্ঠটি শুনতে পাই :

> "কেটে গেল যুগান্তর তবু কেন এ অন্তর
> আসে আসে এই আশা ছাড়িতে নারিল,
> কতদিন হয়ে গেল আশা না পূরিল।"[২০]

ঠিক একই আর্তি রয়েছে এই শতাব্দীর শেষের দিককার কবি তসলিমার মধ্যে: "তবু আমি তৃষ্ণার্তই থেকে যাই অধিক জীবন।"

যুগে যুগে দেশে দেশে এই আর্তিই ধ্বনিত হচ্ছে নারীকণ্ঠে। যুদ্ধ করতে হয়েছে 'আমিও মানুষ' পরিচয়ের জন্যে, বিদ্রোহ করতে হয়েছে অধিকার আদায়ের জন্যে। আর এ সবকিছুর মধ্যেও শান্তি পেতে চেষ্টা করেছেন বিনোদিনী। ১৯৪১ ইংরেজিব ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলা ১৩৪৭ এর ২৯ মাঘ মঙ্গলবার মাঘিপূর্ণিমার দিন অভিনেত্রী বিনোদিনী, লেখিকা বিনোদিনী, বারাঙ্গনা বিনোদিনী, প্রতারিতা-শোষিতা-বঞ্চিতা বিনোদিনী চিবশান্তি লাভ কবেন। অথচ মৃত্যুব পর সংবাদপত্রে থিয়েটারের কারণে সর্বস্ব দেওয়া বিনোদিনীর জন্যে কোন শোকসংবাদ বেরোল না।[২১] এর চাইতে লজ্জাকব, যন্ত্রণাদায়ক, বেদনাতুর ঘটনা আর কী হতে পারে?

চতুর্থ অধ্যায়

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়

মনোদাদেবীর 'একজন গৃহবধূর ডায়েরি'

(১৮৭৮-১৯৬৪)

"এই জীবনটা নিয়ে এবার কোথায় যাবো সখী?
দূরে যাচ্ছে সরে যাচ্ছে সার্থকতার ছবি,
সার্থকতার অলীক কুসুম কোন্ গাছে গো ফোটে?
মেয়ে জন্মের খুদ কুড়োটি কোনখানে গো জোটে?

** ** ** **

অধীনতার সোনার মুকুট মাথায় পরায় কে?
কে পরাল? পরম্পরা, পরম্পরা রে!"

— কৃষ্ণা বসু

'সেকালের গৃহবধূর ডায়েরি' মূলত স্মৃতিকথা। আক্ষরিক অর্থে গ্রন্থখানি গৃহবধূর ডায়েরি নয়, বৃদ্ধ বয়সে লেখা মনোদার শৈশবস্মৃতি । ১৯৫৩ সালে মনোদাদেবীর দৌহিত্র বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডাক্তার সমররঞ্জন সেন তাঁকে একটি ডায়েরি উপহার দিয়ে স্মৃতিকথা লিখতে অনুরোধ করেন। মনে হয় পূর্ণাঙ্গ ডায়েরি লেখার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু কোনো কারণবশত সম্পূর্ণ লেখা সম্ভব হয়নি। লেখিকার জীবনের সংক্ষিপ্ত সময়সীমা রচনার বিষয়ভুক্ত কিন্তু বইখানি পাঠে তা মনে হয় না। সাত থেকে দশ বছর বয়সের সময় কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬-এর মধ্যে শৈশবের অভিজ্ঞতা এবং পরিণত বয়সের মানসিকতার সম্মিলন বলেই লেখাটি এত মনোজ্ঞ। নিঃসন্দেহে তা লেখনীরই বিশিষ্ট স্টাইল। আর তা হৃদয়ের মর্মস্থল থেকে জাত, তাই তা মর্মগ্রাহী, মর্মস্পর্শী।

মনোদাদেবীর জন্ম ১৮৭৮ খ্রিঃ অর্থাৎ নারী আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণা রোকেয়ার ২ বৎসর পূর্বে এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা আত্মীজীবনীকার রাসসুন্দরী দাসীর ৬৯ বৎসর পরে। দুজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক। রাসসুন্দরী যখন নিজের শিশুবয়সের সঙ্গে পরবর্তী মেয়েদের তুলনা করতে গিয়ে আনন্দিত হয়েছেন, মনোদাদেবীর জন্ম হয়েছে তখন। যদিও উভয়ই ছিলেন গৃহবধূ তথাপি উভয়ের ক্ষেত্রেই সামাজিক অবস্থান, মানসিকতা, মূল্যবোধ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসব কিছুর পরিবর্তন হওয়াই তো স্বাভাবিক। তাই গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও রাসসুন্দরী স্কুলের চৌকাঠে পা দেওয়া তো দূরের কথা,

বাড়িতেও লেখাপড়া কবতে পাবেননি। বলা যায়, সুযোগই দেওয়া হয়নি, সামাজিক বিধি মেনে এবং অতি সঙ্গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যা করেছেন তা শুধুমাত্র নিজের অধ্যবসায় ও একাগ্রতার জন্যেই। অন্যদিকে মনোদা ছিলেন ইডেন স্কুলের ছাত্রী। বাড়িতে মাস্টারমশাই লেখাপড়ায় সাহায্য কবতেন, সেইসঙ্গে ছিল মাতার সতর্ক দৃষ্টি। তাই তো 'মেঘনাদবধ' 'বৃত্রসংহার'ই নয়, 'বিক্রমপুর সম্মিলনীব পবীক্ষায সর্বোচ্চ ক্লাসেব বই' পড়ানোব ব্যাপারে মনোদার মাতা ছিলেন সচেষ্ট।

দেখা যায়, সে-সময় মেয়েরা নামেব শেষে দাসী বা দেবী ব্যবহার কবতেন। পুরুষ নারীকে চায় দাসী ও সম্ভোগের বস্তুরূপে, আবার কখনো আরাধনা কবে দেবীরূপে, এর বাইরে নারীব কোনো ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকাব কবেনি পুরুষতন্ত্র। রাসসুন্দবী বা বিনোদিনী নামের শেষে দাসী লিখেছেন ঠিকই কিন্তু মনোদার নামেব শেষে রয়েছে দেবী। হতে পারে যুগপরিবর্তনের প্রভাবেই নারী 'দাসী'র বদলে 'দেবী' ব্যবহাব করেছেন, তবু ব্যক্তি হননি। আবার এরকমও হতে পাবে তৎকালীন সমাজে নিজেদেব অবস্থান অনুযায়ী আরোপিত হয়েছে পদবি। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার কথা— পূজা কবে মাথায় রাখার অথবা অবহেলাভবে পুষে বাখার পাত্রী তিনি হতে চাননি। দেবী বা দাসীর চিহ্নায়ক পরিচয়কে অস্বীকাব করে উত্তরণ চেয়েছেন ব্যক্তিস্বরূপে। এখানেই বাসসুন্দবী বা মনোদার সঙ্গে তাঁব ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম অন্যত্রও— চিত্রাঙ্গদা তো পুরুষেব কলমে কল্পনাসৃষ্ট নাবী, আর রাসসুন্দরী বা মনোদা তো সে-সময়কাব বাস্তব চিত্রণ, তা-ও আবার নারীব লিখনে। আবোপিত বিধিনিষেধকে অঙ্গে ধাবণ করে পুরুষতন্ত্রের অলিখিত বিধান বা শর্তকে স্মরণ রেখেই তাদেব লিখন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ।

'সেকালের গৃহবধূব ডায়েরি'তে বালিকা বধূ মনোদাব খুব সামান্য পরিচয় হয়তো আছে, আছে শিশুবয়সে দেখা বিভিন্ন ঘটনার নিখুঁত বিবরণ, রযেছে নানা ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থানকে চেনার সুযোগ, সেইসঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই তৎকালীন সমাজ তথা পারিবারিক চিত্র। শিশুর দৃষ্টি ও শিশুসুলভ মনোভাবের পরিচয় রচনার কোথাও নেই। রচনাটি বৃদ্ধবয়সে লেখা বলেই তাতে আমরা পাই প্রৌঢ়া মনোদার লেখনীতে শিশুমনোদাকে।

'ছত্রিশখানা ঘর সংযুক্ত বাড়ীখানাব' মেয়ে মনোদা। বাড়ির বর্ণনাতেও উচ্চবিত্ত সহ উচ্চচিত্তের প্রকাশ। এ হেন মনোদার জীবনে আলো-বাতাসের খেলা ছিল। এরই মধ্যে একটি ঘরের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সেই ঘরটি 'চাউলের' ঘর। ঘরটির বিশেষত্ব হল 'বৌ-ঝিরা ঐ ঘরখানাতে নিরুদ্বেগে ঘোমটা খুলিয়া, গলা ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে হাসিঠাট্টা আনন্দ করিয়া খুব খুশী হইত।' ঐ ছোট্ট কোণটিই ছিল জায়া-জননীর খোলস ছেড়ে বৌ মেয়েদের আপন সত্তার উন্মোচন। অন্যত্র দিদির বিয়ে উপলক্ষে যে সমস্ত গায়িকারা দলবদ্ধভাবে গান করতেন তাঁদের সম্পর্কে মনোদা বলেছেন— 'কিছুতেই তাদের মুখ দেখা যাইত না। গানের সুর তাদের গ্রামান্তরে যত কেন চলিয়া যাউক না— কিন্তু তাদের তেল সিন্দুরলিপ্ত মুখগুলি সকলের অদৃশ্যেই থাকিয়া যাইত।' স্পষ্টতই বোঝা যায়, মেয়েদের অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। অবরোধ পুরোপুরি বজায় ছিল। যেমন ছিল রাসসুন্দরীর সময় সেই একই আবক্ষ অবগুণ্ঠন। তাই রাসসুন্দরীর ৬৯ বছর পর জন্মে, প্রগতিশীল পরিবারে বড়ো হয়েও অবগুণ্ঠনের যন্ত্রণা থেকে মনোদার অব্যাহতি ঘটেনি। বিয়ের পর

নিভৃত একটি কক্ষ নির্দিষ্ট হল দিনের বেলার জন্যে। শ্বশুরবাড়ির এই সিদ্ধান্তে মনোদা যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। ডায়েরির এক জায়গায় বলেছেন— 'আমিও যেন বাঁচিয়া গেলাম। ঘোমটাটা একটু কমাইতে বাড়াইতেও পারা যাইবে'। অন্যত্র বলেছেন 'আমি আমার একখানা কাপড় দিয়া পরদার মতো করিয়া দিয়া লইলাম। ইহাতে সর্বক্ষণ অর্ধহস্ত ঘোমটাটাকে কখনো কখনো একটু কমাইয়া দেওয়ার সুযোগ হইত'। অর্থাৎ উনিশ শতকের মানচিত্রে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল ঠিকই, সমাজ-মানসিকতাও তা থেকে বঞ্চিত ছিল না, কিন্তু অন্দরমহলের ঘেরাটোপে আবদ্ধ জনদের অবস্থার বিশেষ কোনো তারতম্য হয়নি, অর্থাৎ অন্দরমহলের চিত্র ছিল অপরিবর্তনীয়।

বন্ধ হয়ে যায় উৎফুল্লতার দরজা

মনোদা শহুরে উচ্চপদস্থ বাড়ির শিক্ষিত, প্রগতিশীল পরিবারের মেয়ে। সেই ম্লেচ্ছঘেঁষা ডেপুটি পরিবারের সঙ্গে বড়লাট ছোটলাটের আনাগোনা, খাদ্যাখাদ্য খানাপিনা। সে-বাড়ির মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে, সাঁতার কাটে, খেলাধূলায় পুরস্কার পায়, ঢাকার বিখ্যাত ইডেন স্কুলে পড়ে। অতএব সে-মেয়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত, প্রাত্যহিক প্রয়োজন কিংবা পরিবেশের প্রভাব উন্নত। এককথায় সামাজিক অবস্থান উন্নততর। হয়তো বা বৃহত্তর সমাজ থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন, যে দলের নাম 'বিলেতফেরত গুরুপ্রসাদী দল'। নিত্যদিনের নিত্যকর্মের ঘেরাটোপের বাইরে সে-পরিবারে আছে চড়ুইভাতি, ঝুলন, ছায়াবাজি, সাপের খেলা, ম্যাজিক, গ্রিনবোটে বেড়ানো, জন্মাষ্টমীর মিছিল, ঝুড়ি ঝুড়ি কমলা-কলার দিনে ঐরূপ মহোৎসব— 'খৃষ্টমাসডে', উপলক্ষে তৈরি 'খৃষ্টমাস কেইকের এক একটি গম্বুজ'। তার মধ্যেও তফাত ছিল। ঘোড়ায় চড়া পুরো হল না— 'ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া গেলে তোর বিয়া হইবে না' এই যুক্তিতে। অথচ ছোটকাকার বেলায় এই যুক্তি প্রযোজ্য হল না। মনোদা লিখেছেন, 'আচ্ছা, ছোটকাকার যদি ঠেঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়— তবে তো তারও বিবাহ হইবে না— আমার বেলায় ঘোর আপত্তি'। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস সম্বল করে গুরুজনদের আদেশ শিরোধার্য করতে হল।

লিঙ্গবৈষম্যের এ রাজনীতি চলছে অনাদিকাল থেকে— কর্মে, আচরণে, জীবনাচরণ পদ্ধতিতে। আমবাগানে আমকুড়ানো 'পথের পাঁচালী'র গ্রাম্য বালিকা দুর্গার কথা মনে পড়ে। অপু দুর্গার ঝগড়া হলে দুর্গাকে সর্বজয়া বলে— 'তোতে আর ওতে'। এই বৈষম্যের পেছনে দায়ী আজন্মলালিত সংস্কার। নারীকে নারী করে তোলার জন্যে জন্ম থেকেই চলে আসছে সমাজ সংসারের পণভাঙ্গা প্রয়াস। আজও যা বর্তমান।

মনোদার পড়াশুনা শুরু ঢাকার ইডেন স্কুলে। ইডেনে যেতে হত স্কুলের গাড়ি করে। মনোদার মা-ও 'লেখাপড়া জানা মহিলা'। লুকিয়ে দেবরের কাছে তাঁর পড়াশুনা শুরু। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তিনি প্রদীপ জ্বালিয়ে বই পড়তেন আর অঙ্কের খাতা বাড়ির পেছনের ঝোপে লুকিয়ে রাখতেন। এর পেছনে একমাত্র কারণ ছিল শাশুড়িকে ভয়। কিন্তু যখন শাশুড়ি পুত্রবধূর এ কীর্তির খবর জানতে পারলেন তখন 'তার ভাবধারা একেবারে বদলে গেল'। মনোদা ইংরেজি জানতেন। আর এজন্যে তাঁকে শ্বশুরবাড়িতে দিতে হয়েছে 'ছেলেদের কাছে

ইংরাজির পরীক্ষা'। তবে এ মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আস্তে আস্তে নারীশিক্ষার কদর বাড়তে শুরু করে, মেয়েরাও নির্যাতনেব হাত থেকে রেহাই পান।

ইডেন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে প্রথম হয়ে অনেকগুলো পুরস্কার পান মনোদাদেবী। সেই আনন্দঘন মুহূর্তের কথা বলতে গিয়ে তিনি দাদামশায়ের মহাখুশি হওয়ার কথাও বলেছেন। 'তুই আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিস'। সেই দাদামশায়-ই কিনা লেখাপড়ায় খেলাধূলায় সর্বোচ্চ উপস্থিতিতে অসংখ্য পুরস্কার পাওয়া এই মেয়েটির পড়াশোনায় যবনিকা টেনে দিলেন প্রথমত চাকুরিসূত্রে স্থান পরিবর্তন এবং পরে বাল্যবিবাহের শিকার করে। এমন দৌড়ঝাঁপ দেওয়া, সব প্রাইজ নিয়ে আসা মেয়েটারও ইডেনে পড়ার ইতি ঘটল অতর্কিতে। দাদামশাই-এর চাকরির কারণে ঢাকা পরিত্যাগ করতে হল। মনোদাদের যেতে হল গ্রামের বাড়িতে। অতএব 'সবই বুঝিলাম সকলেও বুঝিয়া গেল আমার ইডেন স্কুলে পড়া খতম হইয়া গেল'। মনোদা লিখেছেন—

> 'ঢাকা হইতে বিদায় লইযা মধুময় স্কুলজীবন জন্মের মতো পরিত্যাগ করিয়া গ্রামেব বাড়িতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম।'

একটি দশ বৎসরের প্রাণবন্ত বালিকা, একটি সম্ভাবনাময় প্রাণ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেল শুধু কি মেয়ে-সন্তান বলেই? সেইসঙ্গে শুরু হয়ে গেল গোত্রান্তরের পাত্রান্তরের ব্যবস্থা, মেয়েদের অগতির গতি। কারণ মনোদার দিদিমার 'চক্ষের নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছিল মেয়েরা বড় হইয়াছে বলিয়া'। আর এজন্যেই বাড়ির অভিভাবকদের ইচ্ছা তিন বোনের বিবাহ একই সঙ্গে সম্পন্ন করা। তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা এমনই ছিল যে ১১ বৎসরেব মেয়েকে আমন্ত্রণে-নিমন্ত্রণে নিয়ে যাওযা হত না কারণ তার অপরাধ সে তখনো অবিবাহিতা। গুরুজনদের ধারণা ছিল, বিবাহ সম্পন্ন হলে 'কন্যাদানের অফুরন্ত পুণ্য অর্জন করিবে সবাই এবং পিতৃপুরুষও এই উপলক্ষে জলপিণ্ড দানে পরিতৃপ্ত হইবেন। ইহা তো শুধু কথার কথা নয়, সেই অনাদিকালের শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা যে'। অতএব এই অনন্ত পুণ্যের আশায় সমাজের বিধি থেকে ইডেনে পড়া, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা মেয়েটিও রক্ষা পায়নি। যে-বিধিব্যবস্থা খণ্ডন বা সমালোচনা তার মতো শিশুর পক্ষে সম্ভব হয়নি, পরিণত বয়সে ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকিয়ে তারই স্মৃতিচারণ করেছিলেন ডায়েরিতে।

মেতে উঠলে লিঙ্গনির্ধারণে

আগে মেয়েদেখার রীতি ছিল অন্যরকম। বাড়ির পুরানো দাসীর পছন্দ অনুযায়ী বৌ নির্বাচিত হতেন। জ্ঞানদানন্দিনীকেও নিয়ে এসেছিলেন ঠাকুরবাড়ির দাসী। মনোদার পিতারও বিবাহকার্য সম্পন্ন করে বৌ নিয়ে আসেন বাড়ির পুরানো দাসী 'ধাইপিসী'। পরবর্তীকালে মনোদার দিদি প্রমদার সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন থাকা, মনোদার নিজের বিবাহে এবং কন্যা আশার শ্বশুরবাড়িতেও ধাইপিসিই ছিলেন সঙ্গী।

পাত্রীপক্ষের নিজস্ব তাড়ণা বা উদ্যোগে বিয়ে স্থির করা হত। কেননা নারীর জীবনে বিয়েই তো একমাত্র অবলম্বন। নারী প্রথমে জায়া, পরে জননী। এই তাঁর পরিচিতির চৌহদ্দি। এরই জন্য পাত্রী নির্বাচনের নিক্তি ছিল তাঁর রূপ, বর্ণ, গুণ তা-ও

গৃহকর্মনিপুণাতেই তাঁর সীমাবদ্ধতা। অনেকক্ষেত্রে পাত্রের অভিভাবকের বদলে পাত্র নিজেই পাত্রী পছন্দ বা কথাবার্তায় অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। মনোদার সহপাঠী ঊর্মিলার বড়ো বোন নির্মলার বিয়ে হয় নীলরতন সরকারের সঙ্গে। মনোদা লিখেছেন 'মেয়ে দেখিতে ও অন্যান্য কথাবার্তা ঠিক করিতে নীলরতন সরকার নিজেই আসিয়াছেন'। ১৮৯৮ খ্রিঃ সরলাদেবী তাঁর দিনলিপিতে স্বামীকে সম্বোধন করেছেন নাম ধরে। 'তিনি' 'উনি'র গণ্ডি ছাড়িয়ে সরাসরি নাম সম্বোধন।[১] এর পেছনে হয়তো বা ছিল কনভেন্টে পড়াশোনার জন্য বিদেশি ভাবধারার প্রভাব এবং রোমান্টিক উপলব্ধিজাত প্রেমচেতনা। বিশ শতকে লিখতে বসে মনোদা স্বামী সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বামীকে সম্বোধন করেছেন 'তিনি', কখনো 'বরটি' কখনো বা 'প্রেসিডেন্সির ছাত্রটি', 'নির্লজ্জ লোকটি'। উনিশ শতকে তো বটেই এমনকী বিশ শতকের স্মৃতিকথায় স্বামী সম্পর্কিত সেকেলে ভাবনায় সরলাদেবীর সাহসী পদক্ষেপ বিস্মিত করে তোলে, সমাজ-মানসিকতা নিয়ে একপেশে চিন্তায় আলোড়ন ওঠে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব জ্ঞানের বিস্তার প্রসারিত করার পাশাপাশি আচরিত কর্ম, ভাব-ভাবনা, জীবনবোধেও সঞ্চারিত হয়। জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন, তার খোঁজখবর, তার শারীরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত— সমাজপতিদের চোখে অথবা জন্মলব্ধ ভাবধারায় যতই অসম্ভব বলে মনে হোক না কেন কখনো কখনো বাস্তব ছিল স্বতন্ত্র। আর ইংরেজি শিক্ষা বা ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বাঙালির মধ্যেই যে তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ছিল, তারই সত্য চিত্র হল, প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন মনোদার স্বামী।

মনোদার ক্ষেত্রেও পাত্রীদেখা পর্বে এক বৈশিষ্ট্য নজরে এল। একে হয়তো পূর্ণ সমাজচিত্র বলা যায় না এবং বালিকা মনোদা স্বয়ং বিষয়টিকে সুনজরে দেখেননি। প্রথাগত ব্যবস্থা নয় বলেই হয়তো তাঁর এই বিরূপতা। মনোদা লিখেছেন :

> "গ্রামের ছেলেটি গোপনে তার এক আত্মীয়বাড়িতে আসিয়া বন্ধুগণসহ আমাকে দেখিয়া গেলেন। ব্যস, আমি তো লজ্জায় মরিয়া গেলাম ও ঐ নির্লজ্জ লোকটির উপর বিষম রাগিয়া রহিলাম।"

স্বামী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত চিত্র না-পেলেও মনোদার লেখনীতে সেই 'নির্লজ্জ লোকটি'র মমতাময় চিত্র আমরা পাই। স্ত্রীর সম্পর্কে সচরাচর খবর জানার আগ্রহ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শরীর সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ পত্রের মাধ্যমে জানাতে ভোলেননি। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনোদা জানিয়েছেন তাঁর স্বামী মায়ের পাঠানো জিনিসগুলো দেখতে গিয়ে,

> "ডাকটিকিটগুলো যেখানে ছিল তাহা আরও দ্বিগুণ করিয়া বাড়াইয়া দিলেন আর হাত খরচের টাকাটাও দ্বিগুণ করিয়া রাখিয়া দিলেন। আর দিলেন জোয়ানের পুটলি একটি আর স্প্রিট ক্যাম্ফারের একটি শিশি।"[১০]

এখানে রাসসুন্দরীর কথা মনে পড়ে। মনোদার স্বামী যেখানে স্ত্রীর শরীর নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত সেখানে অভুক্ত রাসসুন্দরীর স্বামী তাঁর কোনো খবরই রাখেননি। বোঝা যায় দিনবদল হচ্ছিল, সেইসঙ্গে মনোভাবেও তার হাওয়া এসে লেগেছিল।

নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন বর্ণপরিচয়

বগলামোহন দাশগুপ্তের সঙ্গে মনোদার বিবাহে পাত্রেব হিন্দু মনোভাবাপন্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। এই বিবোধিতাব পেছনে কারণ ছিল তিনটি।

প্রথমত "সর্বকনিষ্ঠ ভাইটিকে নাকি এক শ্যামাঙ্গিনী বিবাহ করাইয়া তাদেব সাদা ধপধপে বংশখানাকে মসীলিপ্ত করিযা দিবেন।"

দ্বিতীয়ত "ঘটক ও বিশারদ বংশে বহু পুরুষ যাবৎ একটু রেষারেষি ভাব চলিয়া অসিতেছিল।"

তৃতীয়ত "দাদামহাশয় ডেপুটি ম্লেচ্ছঘেঁষা ও একেবারে বিলাতফেরত গুরুপ্রসাদীদলেব সর্বপ্রধান নেতা।"

অবশ্য প্রতিবন্ধকতা কেটেও যায় আরেক উদারমনস্কার হস্তক্ষেপে— 'পাত্র যখন নিজেই পাত্রী দেখিয়া মনোনীত করিয়াছে আর আর যাহা যাহা এই বিবাহের প্রতিকূল বলিযা তুমি আপত্তি করিতেছ, সেগুলিকে আমি কিছুতেই মানিব না।' এদিকে অভিভাবকদের এ বিয়েতে সম্মত হওয়ার পেছনে আরও একটি কারণ ছিল। কারণটি হল পাত্রের প্রেসিডেন্সিতে পড়' ' জন্য প্রয়োজনীয় টাকা যখন পাত্রীপক্ষ দিতে রাজি হলেন তখন রায়বাহাদুবের শ্যামাঙ্গিনী নাতনিকে কুলবধূ হিসেবে মেনে নিতে আর কারো আপত্তি রইল না। বিবাহ তো স্থিব হল, আমরা দেখতে পেলাম প্রগতিশীল দুই পরিবারেব বিয়েতেও বরযাত্রীদের কন্যাপক্ষকে নির্যাতনের চিত্র। এ ঘটনা রবীন্দ্রনাথের 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পের কন্যাপক্ষ উৎপীড়নের কথা মনে করিয়ে দেয়। কারণ এটাই ছিল তখনকার সমাজচিত্র। কিন্তু তখনো শ্বশুরবাড়ির কদর্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়ার কিছুটা বাকি ছিল। ২০০ বরযাত্রী আনাও এক প্রকার অত্যাচার, তার ওপর বিয়ের দিনে সকালে জানানো হল ৩০০ জন বরযাত্রী আসবেন। যেন তাঁরা 'অপদস্থ করিবারই সুযোগ খুঁজিতেছেন'। তারপর বরপক্ষের বরদক্ষিণা নিয়ে দরকষাকষি, চিরাচরিত লেনদেন নিয়ে কদর্য অশান্তি। মনোদা লিখেছেন

> "দাদামহাশয় শাস্ত্রসম্মত ৮০রতি (১ তোলা) সোনা দিয়া আংটি একটি গড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা আনিয়া বরের হাতে দেওয়া মাত্রই বরকর্তা একেবারে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন— 'ইহাতে বরদক্ষিণা হইবে না',— একখানি সুলতানি মোহর চাই।"

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেল যে মনোদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দাদামশাই 'ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন'। শত হলেও তিনি কন্যাপক্ষ তো বটে। মনোদার বাল্যবয়সের স্মৃতিচারণে আক্ষেপ, দীর্ঘশ্বাস, অনুযোগ-অভিযোগ থাকলেও নিজের কণ্ঠে কোনো প্রতিবাদ নেই। কিন্তু কানপাতলে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের আওয়াজ যে সে-সময়ও শোনা যেত সেরকমই একজন মুক্তকণ্ঠী প্রতিবাদী চেতনার সাক্ষাৎ পাই মনোদার লেখায়। তিনি হলেন মনোদার ঠাকুরমা। বরকর্তার জেদে ৫টি হরীতকীই বরদক্ষিণা হিসাবে গ্রহণ করতে হল বরপক্ষীয়দের। এই নির্লজ্জকর পরিস্থিতিতে অবগুণ্ঠিতা শুভ্রবসনা বৃদ্ধা মনোদার দিদিমার প্রতিবাদী সত্তার উন্মোচনে বিস্মিত হতে হয় বৈকি। "সভার লোকদিগের প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে এই যে, আজ আমার দৌহিত্রীর বিবাহে

আমার অতিমান্য বৈবাহিকটি মনস্তাপে জর্জরিত হইলেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ দৈবগতিকে আমাব পুত্র জানকীনাথ সেন এই বিবাহসভায় উপস্থিত না-থাকার দরুন, সে উপস্থিত থাকিলে এইরূপ ঘটনার পূর্বেই তাহা কর্তন হইয়া যাইত। সে সেনহাটি (খুলনা) গ্রামের বিকর্তন, তাকে খণ্ডন করা সহজসাধ্য নয়, বিক্রমপুরের গণবংশের (বরকর্তা গণবংশসম্ভূত)। আর একটি কথা আমি এই বলিতে চাই যে, আজ যে মেয়েটিকে আপনারা ঘরে নিতেছেন তার মতো উভয় কেন চতুর্দিকে শুদ্ধ মেয়ে আপনাদের ঘরে, এমন কি ২/৪/১০ গ্রামেও পাইবেন কিনা যাচাই করিয়া লইবেন। এই মেয়ের পিতৃবংশ, মাতুলবংশ এবং পিতা ও মাতার মাতুল বংশকে পরাস্ত করা বিক্রমপুরের লোকদের সহজসাধ্য নয়''। স্পষ্টবক্তা নির্ভীক দৃপ্তকণ্ঠের অনাবিল উচ্চারণের সত্যভাষণ প্রথম প্রতিশ্রুতির সত্যবতীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

পুরুষতন্ত্রের সমর্থক মনোদার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নারীকে চাননি, চেয়েছিলেন অর্ধেক রাজত্বসহ রাজকন্যা। কারণ তাঁরা জানতেন, মনোদা রায়বাহাদুরের নাতনি, কাজেই পিতৃহীন নাতনির জন্য রায়বাহাদুর অনেক কিছুই করতে পারেন। কন্যাপণের ক্ষেত্রে মেয়ের আত্মীয়স্বজনকে যৌতুক দেওয়া হয়। আর বরপণের ক্ষেত্রে কন্যা ও কাঞ্চন দুইই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির প্রাপ্য। সাঁওতালদের মধ্যে কন্যাপণ ছিল, ছিল আদিবাসী ও হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে। কিন্তু সমাজের রং-রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতিনীতি তথা সমাজ কাঠামোতেও তো আসে পরিবর্তন। কাজেই কন্যাপণ ব্যবস্থার পরিবর্তে বরপণ চালু হয়েছে সাঁওতাল ও নিম্নবর্ণের মধ্যে। কন্যাপণ ব্যবস্থায় মেয়ের পিতামাতাকে (কখনো আত্মীয়স্বজন) পণ দেওয়া হয়। আর কন্যাক্রয় ব্যবস্থায় কন্যাকে ক্রয় করা হয় বিক্রীত বস্তুর মতো। সম্পদ বা অর্থের বিনিময়ে কন্যা হস্তান্তরিত অর্থাৎ কন্যাপণ আর কন্যাক্রয় একই ব্যবস্থার রকমফের মাত্র। আর বরপণের ক্ষেত্রে বরের অভিভাবকদের প্রাপ্তির তালিকায় রাজকন্যা ও সঙ্গে রাজত্ব বা রাজস্ব। এখানে নারী সরাসরি বিক্রীত নয়, নারীকে গ্রহণ করার স্পর্ধা দেখানোর জন্য চাহিদার মধ্য দিয়ে সম্পদ বা অর্থপ্রাপ্তি; ইদানীংকালে চাহিদা বা প্রাপ্তি শব্দের নতুন সংস্করণ স্বেচ্ছাকৃত দান। অর্থাৎ কন্যাপণ বা বরপণ উভয়ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু পাত্র নয়, পাত্রী; পুরুষতন্ত্রের নির্দেশিত অনুশাসনে হয় সে বিকৃত, নয় সে বিক্রীত।

মনোদার স্মৃতিকথায় বরপণের পাশাপাশি কন্যাপণেরও উল্লেখ রয়েছে। মনোদার মা এবং দিদিমা কাঙ্গাইলা নামের মাতৃহীনা ৫ বছরের একটি ছেলেকে পালন করেন। কাঙ্গাইলা ভাই 'কুৎসিৎ কদাকার ও কালো', তার জন্য আনা হল 'একটি অতি ফর্সা টুকটুকে বৌ'। মনোদা বলেছেন, 'এক ঠাকুরবাড়ির মৃতা দাসীর ৫ বৎসরের একটি মেয়েকে অতি সস্তায় মধ্যস্থের হাত দিয়া ৫০০ শত টাকায় কিনিয়া লইলেন 'আমার ঠাকুমা'। আর নিজের বিয়ের ক্ষেত্রে বরপণের নির্ধারিত টাকার কিছু অংশ আগাম দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মনোদা। বলেছেন— শ্বশুরবাড়ির জুলুমবাজির কথা, বরদক্ষিণার নামান্তরে চরম নির্লজ্জতার কথা, আড়ম্বরপূর্ণ সাজুর (এখন বোধহয় তত্ত্ব বলা হয়) বিবরণ— যেখানে ছিল ৪০ রকম মিষ্টি ও খাবার। দেয় বস্তু গ্রহণে আহ্লাদিত হলেও দাতাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাতে পেরেছেন মনোদার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। তাই গ্রন্থিমোচনের পর 'গুরুপ্রসাদী দলের বাড়িতে ভাই ও বধূকে

পাঠাইবার ঘোর আপত্তি' দেখা গেল। প্রশ্ন জাগে, সামান্য সৌজন্যবোধটুকু দেখাতেও তাঁদের এত কার্পণ্য কেন?

নারী অঙ্গ নিয়ে জন্ম অপরাধ নাকি

বিয়ের আগে মনোদা চলাফেরা করেছেন স্বাধীনভাবে, কিন্তু বিয়ের পরই তাঁর চলন-বলন, আচার-আচরণে এল পরিবর্তন। সে-পরিবর্তন অবশ্য শ্বশুরবাড়ির ইচ্ছেতেই। তাই তো নৌকায় চারদিন যাবৎ অবগুণ্ঠিতা মনোদাকে নিশ্চুপে বসে থাকতে হল, 'যাহা এই চঞ্চল মেয়েটির পক্ষে অসাধ্যসাধনস্বরূপ'। এমনকী নৌকা থেকে গাড়িতে ওঠার সময় যে আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন হল তারও বিবরণ দিয়েছেন ডায়েরিতে :

> "সেই নৌকায় পিড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দিকে কাপড় দিয়া ঘেরা হইল, উপরেও চালের মতো কাপড় দেওয়া হইল, অর্থাৎ একখানা মশারী তৈয়ার হইল এবং ঐ মশারিখানার মধ্য দিয়া এক পা-হাঁটি-পা-পা করিয়া নৌকা হইতে অবতরণ ও ক্রমে গরুর গাড়িতে উঠিয়া যাওয়া।"

শ্বশুরবাড়িতে নববধূকে দেখে তার রূপ, রং, গঠনকেন্দ্রিক বর্ণনায় বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা ছিলেন মুখর। তাই, মনোদাকে দেখে কেউ বললেন, "আগের বড় ভুঁইয়াদের বৌদের মত অত সাপ (ফর্সা) না।" কেউ বললেন, "গড়ন পিটন মোটা-সোটা আছে, বেশ বড় সড় সেয়ানা বৌ।" ইংরেজি শেখার অপরাধে আবার কেউ বললেন, "১৪/১৫ বয়স হইবে, আংরাজী পড়া বৌ, বড় ক্যান হইব না।" নববধূকে নিয়ে সমালোচনা আজকের যুগেও কমেনি। তাই তো, "কেউ বা দেখে মুখ; কেহ বা দেহ/বিচার করে সবে করে না স্নেহ"।

বধূবরণের পরদিন থেকে শুরু হল নববধূকে দেখার পালা, আর এ অনুষ্ঠান গড়ায় অধিক বেলা পর্যন্ত। অথচ শিশুটি যে ক্ষুধার্ত সে কথা কারো মনেই থাকে না। শুধু তাই নয়, বিদগা থেকে পিতৃগৃহে যাবার পথে প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে মনোদার বড়ো ননদ 'তাঁর পুত্র ও ভ্রাতার জন্য চিৎকার দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন'। অথচ নৌকার আরোহীদের মধ্যে সবচাইতে অল্পবয়সি শিশুটির জন্য কারো অন্তর কেঁপে উঠল না, সামান্য একটু চিন্তাও হল না! কারণ সে তো মেয়ে নয়, সে বৌ। কথায়ই তো আছে— 'মেয়ে আর বৌ এক হয় না', আরো চরম কথাও প্রচলিত আছে— 'অভাগার গরু মরে ভাগ্যবানের বৌ'।

মনোদা শ্যামাঙ্গিনী সত্ত্বেও স্বামীর একনিষ্ঠ আগ্রহেই বিয়েটা হয় এবং এ নিয়ে কখনো তাঁর স্বামীর অক্ষেপও ছিল না। মনোদা বলেছেন 'ইহাতে খোদ কর্ত্তার ভবিষ্যতে মনে মনে একবিন্দু অনুশোচনার ভাব দেখি নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি'। কখনো বা বলেছেন 'নববধূ' দেখার বিড়ম্বনার সঙ্গে যখন নানা কটূক্তি সংযোজিত হয়েছে তখন হিন্দুস্কুলে বি.এ. পড়া কিশোর বরটি বালকদের শাসনও করে দেন যাতে এমন ঘটনার পুনরুক্তি না-ঘটে।

এদিকে মনোদার পৈতৃক বাড়ি থেকে পাঠানো তত্ত্ব দেখতেও ছুটে আসেন সবাই, সঙ্গে চলে সমালোচনা। পোশাক দেখে অনেকে সেদিন মন্তব্য করেছিলেন 'সাহেব বিবির

পোষাক'। এমতাবস্থায় মায়ের গুছিয়ে দেওয়া গরদের রুমাল নিয়ে মনোদা নিজেই ছিলেন বিব্রত, সেইসঙ্গে বৃদ্ধানারী সমালোচনাকারীদের অনেক মন্তব্যে ভীত ও লজ্জিত হয়ে উঠেছিলেন।

> 'কি সর্বনাশ! রুমাল রুমাল, বৌর হাতে রুমাল! বৃদ্ধারা তো একেবারে হতবাক। ডেস্কে সেলাইর সব জিনিষ— উল, কার্পেট, সাবান, কাঁচি সুঁই সুতা! ওমা এযে একটা দোকান গো! মাথা নত করিয়া ঘরেব এককোণে দাঁড়াইযা সবই শুনিতে পাইলাম।'

এমনিতেই তাকে করা হয়েছিল সাহেব-বিবি পর্যায়ভুক্ত। তার উপর প্রগতিশীল স্বামীর লেখা 'মিসেস মনোদা' শিরোনামে পত্র। চারিদিকে সমালোচনার ঝড় উঠল— এই কি ছিল তখনকার সমাজে প্রগতিশীলতার পরিণাম? কামিনী রায়ের লেখায়[২] রয়েছে সচেতনতা, দায়িত্বশীলতার করুণ পরিণাম। তার পিতা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে স্ত্রী বামাসুন্দরীকে চিঠি লেখেন। কিন্তু চিঠিখানি গ্রামের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তগত হয়। তিনি বামাসুন্দরীর শ্বশুবের কাছে পাঠিয়ে দেন। লজ্জিত শ্বশুর মহাশয় সে-চিঠিটি নিয়ে তাঁর বৈবাহিকের কাছে যান। কামিনী রায় লিখেছেন ''তিনিও জামাতার এই নির্লজ্জতার পরিচয় পাইয়া বড় অপ্রতিভ হইলেন। চিঠিখানি পাইয়া বাড়িতে একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। যাঁহার নিকট আসিয়াছিল তাঁহাকে সেখানি দিবার আবশ্যকতা কেহ দেখিলেন না'। কারণ সমাজের দৃষ্টিতে মেয়েদের অবস্থা ছিল 'মেয়ে হব, ঘর নিকুব, পরবো পাটের শাড়ী'— আর এর ব্যতিক্রম ঘটলেই সমাজ ও পরিবারের গলায় 'গেল গেল' রব। বাড়ির বধূকে অনুগত রাখতে, বশ্যতা স্বীকার করাতে সবার চেষ্টার অন্ত ছিল না। রীতিপালন যাতে ত্রুটিমুক্ত হয় সেদিকেই তাদের নজর ছিল বেশি। সেখানে অসহায় বধূটির প্রাণান্তকর অবস্থা দেখেও কারো মনে দয়ার উদ্রেক হত না। নিজের ঘরের বৌ হলে হবে কি? আসলে তো সে পরের বাড়ির মেয়ে। মেয়ে হওয়া, বধূ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য তো এ সকল কটূক্তি; অনেক পাওয়ার মাঝে পূর্ণ স্বীকৃতি না-পাওয়ার বেদনার সুর তাই মনোদার জীবনবীণাতেও বার বার বেজেছে। 'পাড়ার প্রতিবেশীরা সবাই চায় বউকে অনুগত রাখিতে'— আর তিনিও যে ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তা-ও বলেছেন। তাই তো তাঁকে অর্ধহস্ত ঘোমটার আড়ালে থাকতে হত। ভাগিনা যোগেশচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বইয়ের প্রাপ্তিস্বীকার করে শুধুমাত্র ধন্যবাদ জানানোই সম্ভব ছিল, 'কিন্তু, কথা বলা তো আর চলে না— বিশেষত ১৫/১৬ বৎসরের ছেলের সঙ্গে'। এই মেনে চলা আর মানিয়ে চলার নীতিশিক্ষাই ঘরের বৌ-এর সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকা। এই লিঙ্গ নির্দিষ্ট ভূমিকার মধ্যেই বৈষম্য-ভাবনার বীজ নিহিত।

অন্যান্য নারীর সঙ্গে তুলনা করলে দেখি মনোদা তবু অনেক পেয়েছিলেন বাড়ির বৌ-ঝিদের, জা-মামিশাশুড়ির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। বই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, স্বামীর মমতার মানবিক স্পর্শ পেয়েছিলেন, ঘরে পর্দা দিয়ে ঘোমটা খাটো করার সুযোগ বা স্বাধীনতাও পেয়েছিলেন। চিরঅভ্যাসমতো 'জোরে অর্থাৎ স্বর ফুটাইয়া কথা বলা

ও শব্দ করিয়া হাসিবার' স্বভাব মনোদা সহজে ছাড়তে পারেননি। সমালোচনাও কম হয়নি। অগত্যা এমন প্রার্থনাও করতে হয় তাঁকে 'হে ভগবান তুমি আমার মুখের হাসি তুলিয়া লও, আমি যেন হাসি না'। সারদাসুন্দরীকেও উপদেশ দিতেন তাঁর স্বামী, 'কখনও খুব চেঁচিয়ে হাসিও না, কাহারও সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কহিও না'। আরোপিত বাধানিষেধের ধারাপাতে শিক্ষিত হতে হত বাল্যকাল থেকেই। তাই নীরবতার সংস্কৃতিকে মান্যতা দিতে বাধ্য হতেন অনেকে।

এ তো শুধু শৈশবের মৃত্যুই নয়, স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব-উপলব্ধিকে বিনাশের এককথায় অঙ্কুরিত সত্তাকে বনসাই-এ রূপান্তরের এক রাজনীতি। Emphatically such a Being '[illegible]es/an inmate of this active universe'[৩] —এই Being একান্তই পুরুষের, অন্তত উনিশ শতকে যেসমস্ত মেয়েদের জন্ম তারা তো জন্মমুহূর্ত থেকেই সংসার স্বামী, সন্তানের জন্য বলিপ্রদত্ত, কাজেই তারা inmate of this universe হবে কীভাবে, হবার কথা তাদের অস্থি-মজ্জায় নেই। অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাবনাও কোণঠাসা। অধিকারই যার সংকুচিত, বিশ্বের পরিধি যার কাছে গৃহাভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ, তার চলমান বিশ্বের অংশীদার হবার স্বপ্ন, সাধ কোনোটাই থাকতে নেই।

> "যে মিলিয়ে নিতে চাইছে তার সময়কাল, তার যৌবন। হেসে হেসে সে চোখের জলকে করছে প্রথমে বনসাই, তারপর পাথর। পাথরগুলিকে ফেরত পাঠাচ্ছে গ্রন্থি চিকিৎসায়।
> হাসিখুশী মেয়েটির দিকে তাকাও। দোহাই পিপাসা জানিও না।"
>
> — রূপা দাশগুপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

এত আলো জ্বালিয়েছ

রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য— সমান্তরাল পাঠ

(১৮৮০-১৯৩২)

"আমরা তো জানি পৃথিবী রমণী আকাশ আদিম পুরুষ
তবে কেন তুমি আমাব দুহাতে শেকল পবিয়ে রেখেছ
হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি।"

— মল্লিকা সেনগুপ্ত

রোকেয়া এমন একজন নারী যাঁব চিন্তাচেতনা সমকালেব তুলনায় অনেক বেশি প্রাগ্রসর। তিনি হলেন প্রথম নারীবাদী নারী, বোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। নারীমুক্তির ইতিহাসে তিনি একজন প্রগতিশীল চিন্তাব অগ্রদূত, তাঁর বাক্য ও কর্ম একে অপবের পবিপূরক। ৩০ ৪.৩১-এ একটি চিঠিতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁব জীবনকাহিনি।

> "শৈশবে বাপের আদর পাইনি, বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগেব সেবা কবেছি। প্রত্যহ ইউরিণ পবীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দুবার মা হয়েছিলাম, তাদেরও প্রাণভযে কোলে নিতে পারিনি। একজন ৫ মাস বয়সে অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবত বৈধব্যের আগুনে পুড়ছি।"[১]

একজন সাধারণ নারীর ছয় লাইনের আত্মজীবনী, অথচ নাবীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ, আর এজন্যই তিনি অসাধারণ। অন্যান্য নারীবা যেভাবে আত্মজীবনী লিখেছেন, বোকেয়া সে-অর্থে আত্মজীবনী লেখেননি ঠিকই কিন্তু সে-যুগের, সে-সময়েব সমাজ বা অনুশাসনের কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন বিভিন্ন ঘটনাব, বিভিন্ন অভিজ্ঞতাব। তাই বোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য সমান্তরালভাবে পাঠের মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনব্যাপী দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গী হওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র জীবন ও সাহিত্যই নয়, পাঠ করা প্রয়োজন প্রত্যয়ের, সেই সঙ্গে সঙ্কেতের।

রোকেয়ার পূর্বপুরুষ বাবর আলি আবুল তাব্রিজী। ইরানের তাব্রিজ শহরের অধিবাসী ছিলেন তিনি। ষোড়শ শতাব্দীর আশির দশকের কোনো এক সময় তিনি রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে পদার্পণ করেন। সেখানে মুঘল সম্রাটের অনুগ্রহে বিস্তীর্ণ জমি লাভ করেন তিনি। আর এই সম্পত্তির অধিকারী সাবের পরিবারের সপ্তম পুরুষ রোকেয়ার পিতা জহিরুদ্দীন আবু আলী হায়দার সাবের। ইনি বিয়ে করেন চারটি। রোকেয়ার মা প্রথম পত্নী।

রোকেয়ার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মসিহুজ্জামান পারিবারিক কাহিনি লিপিবদ্ধ করেন পদ্যের আকারে। সেখানে আলী সাবের সম্পর্কে আছে—

'আলেম ছিলেন তিনি সাতটি ভাষার
আরবী ফার্সী উর্দু পোস্ত কাবুলীয়ার
ইংরেজী হেন্দি আর ভাষা বাঙালী
এই সাত ভাষা জানতেন মরহুম আবু আলী[২]

বহুবিবাহ বিলাসিতা ও অপব্যয়ের জন্য শেষজীবনে চরম আর্থিক সংকটে পড়তে হয় তাঁকে। আর এ সময়ই রোকেয়ার জন্ম, যখন আর্থিক দুর্দশার মুখোমুখি ছিল সংসার আর অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সংস্কারের আবেষ্টনীতে জড়ানো ছিল সমাজ তথা সময়। পরিবারে পর্দার প্রচলন ছিল, আর এই অবরোধের মধ্যে তাঁর বাল্যজীবন কেটেছে। তাই তো বাড়িতে পাড়ার স্ত্রীলোকের আগমনে তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে 'কখনও রান্নাঘরের ঝাপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরানীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে'। এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন 'বাচ্চাওয়ালা মুরগী যেমন আকাশে চিল দেখিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহার ছানাগুলি মায়ের পাখার নিচে পলায়, আমাকেও সেইরূপ পলাইতে হইত'।

সে-সময় সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া ছিল নিষিদ্ধ। রোকেয়ার দুই বড়ো দাদাই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াশোনা করেন। আলি সাবের বিদ্যানুরাগী হলেও রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাই মেয়েদের পাঠদানের ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল। পিতৃতন্ত্র প্রতাপের শৃঙ্খল, রোকেয়ার পিতা সেই পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধি। কাজেই পিতৃতন্ত্রের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তির উপর অঙ্গুলি নির্দেশ সঠিক নয়। কবিপ্রতিভার অধিকারী বড়ো দিদি করিমুন্নেসা নিজের চেষ্টায় বাংলা শেখেন। কিন্তু ঘটনাটি পিতার নজরে পড়ে। রক্ষণশীল পিতা সেদিন ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে তাঁকে উৎসাহিতই করেন। কিন্তু চোদ্দ বছর অতিক্রান্ত হবার আগেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। রোকেয়া লিখেছেন—

> "সমাজ তাঁহাকে গলাটেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা দেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন। ইলেকট্রিক বাতিকে স্তরের পর স্তর অনেক কাপড়ের আবরণে ঢাকিলে অন্ধকার দেখায়; তিনিও সেইরূপ কাপড়চাপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রজ্বলিত শিখা অন্তরে ঢাকিয়া রাখিয়া নীরবে দগ্ধ হইয়াছেন।"

রোকেয়া স্কুল কলেজে পড়াশোনা করেননি। জ্যেষ্ঠা ভগিনী করিমুন্নেসা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহায়তায় এবং নিজের চেষ্টা ও উৎসাহে উর্দু, ফারসি, আরবি ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি শেখেন। মূলত রোকেয়ার নিজেরই মধ্যে ছিল এগিয়ে যাওয়ার অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা, তাঁর দাদা সেখানে উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নয়। অবরোধের দুঃসহ যন্ত্রণা রোকেয়া নিজের জীবনেই উপলব্ধি করেছেন, তাই তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর জীবনে সম্ভব হয়নি। তিনি নিজেই বলেছেন, 'অপর আত্মীয় স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহদান করিবেন দূরে থাকুক বরং নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন— কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই।' পড়াশোনার ক্ষেত্রে পিতার কাছ

থেকে কোন সাহায্য পাননি। করিমুন্নেসার শ্বশুরবাড়িতে এসে এক মেম শিক্ষিকার কাছে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা। দেশে ফেরার পর রাত্রির অন্ধকারে মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় বড়ো ভাই ইব্রাহিমের কাছে ইংরেজি শিক্ষা শুরু, আব বাংলা ভাষা শিক্ষা দিদি কবিমুন্নেসার কাছে।

রোকেয়ার বিয়ে হয় ১৬ বৎসর (মতান্তবে ১৮ বৎসর) বয়সে, বিহারের অধিবাসী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। তাঁর জীবনে এ-ও ছিল একধরনের পরিহাস। তাই তো নারীমুক্তির দিশারীর বিয়ে হল পিতার বয়সি বিপত্নীকের সঙ্গে। সাখাওয়াত ছিলেন কুসংস্কার বর্জিত। স্ত্রীর সংস্পর্শে তিনি উপলব্ধি করলেন মুসলমান সমাজেব উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। পত্নী রোকেযার মধ্যেও যে-সম্ভাবনা নিহিত আছে, তা-ও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তো Sultana's Dream-এর খসড়া পড়ে তিনি বলেছিলেন— 'A terrible Revenge' (ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ) এবং রচনাটি ভাগলপুরেব তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ম্যাকফার কাছে সংশোধনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। ডেপুটি সাহেব একটি পত্রে লিখেছিলেন—

> "The ideas expressed in it are quite delightful and full of originally and they are written in perfect English."[৫]

অনেকে মনে করেন 'perfect English' রোকেযা স্বামীর কাছে শিখেছিলেন। এই ধারণাকে 'পুরুষতান্ত্রিক বিশ্বাস'-এ আখ্যায়িত করেছেন হুমায়ুন আজাদ। তথাপি উচ্চশিক্ষিত, উদাবপ্রাণ, প্রগতিশীল মতানুসাবী সাখাওয়াত বোকেয়াব স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সার্থক করার ব্যাপাবে সচেষ্ট ছিলেন। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে রোকেয়া বলেছেন 'আমাব শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে কখনই সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না'। তাই কি রোকেয়া সম্পর্কিত আলোচনার লিখিত বা মৌখিক বয়ানে রোকেয়ার সঙ্গে বেগম কথাটির সংযুক্তি? বোকেয়া ডাক নাম যাব রকু, প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন। তিনি নিজে নামের আগে কখনো বেগম কথাটি ব্যবহার করেননি। স্বাক্ষর করতেন রোকেয়া বা R S.HOSSEIN বা Roquiah Khatun বা শুধুমাত্র Khatoon নামে। তাহলে কেন রোকেয়ার পাশে কোথাও কোথাও বেগম শব্দের অন্তর্ভুক্তি? হতে পারে বেগম ব্যবহারের পেছনে রয়েছে পিতৃতন্ত্রের এক বাচনিক রাজনীতি (politics of vocabulary), নিজেদের বশীভূত রাখার প্রয়াস। রোকেয়ার প্রতিভাকে, তাঁর কর্মোন্মাদনাকে, তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিহত করতে না-পেরে তাঁর চিহ্নায়ক পরিচযকে প্রাধান্য দিতেই পিতৃতন্ত্র নামের আগে বেগম কথাটি ব্যবহারের অপচেষ্টা চালিয়েছে। 'পথে নারী বিবর্জিতা' বলেই নারীর নিজস্ব সত্তা, তার একক পরিচিতি চিরকালই অস্বীকৃত। তাই কি বোকেয়ার পরিচিতিতেও সচেতনভাবে সুচতুর কৌশলে বেগম শব্দটির অন্তর্ভুক্তি?

শিক্ষা মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই

রোকেয়ার বিশ্বাস ছিল নারীশিক্ষাই নারীমুক্তির একমাত্র পথ এবং নারীমুক্তিই সমাজকে উন্নত করতে সক্ষম। কারণ নারীর চিন্তা-চেতনা, কাজকর্মে অবনতির একমাত্র কারণ শিক্ষার অভাব। রোকেয়া তা উপলব্ধি করেছিলেন তাই শিক্ষাবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। সেই উদ্দেশ্যেই স্বামীর দেওয়া দশহাজার টাকা দিয়ে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ কলকাতার ওয়ালিউল্লাহ লেনে মাত্র ৮ জন ছাত্রী ও ২ খানা বেঞ্চ নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের

যাত্রা শুরু। যদিও স্বামীব মৃত্যুর পর প্রথম ভাগলপুরেই তিনি স্কুল খুলেছিলেন ৫টি ছাত্রী নিয়ে। কিন্তু সতীনের মেয়ে ও তাঁর স্বামীর আচবণে ও প্রবল বিরোধিতায় ভাগলপুরের স্কুল চালানো সম্ভব হয়নি।

বোকেযার জীবনে হওয়া আর হয়ে ওঠার পেছনে দিদি করিমুন্নেসা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিমের নিঃস্বার্থ অবদান অপরিসীম। তাঁর যন্ত্রণার প্রকাশ মাধ্যম সাহিত্য। যার লিখিত রূপ পাঁচটি গ্রন্থ এবং অপ্রকাশিত বেশ কিছু রচনা। গ্রন্থগুলির উৎসর্গপত্রে ভাই, ভগিনী ও জননী ছাড়া অন্য কাবো নাম নেই। নবাব ফয়জুন্নেসা তো স্বামীর কাছ থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, সপত্নী যন্ত্রণা পেয়েও স্বামীকেই আত্মজীবনী উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু রোকেয়া তা করেননি। 'মতিচূড় ১ম খণ্ড' এবং 'পদ্মবাগ' উৎসর্গ কবেছেন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে, 'মতিচূড় ২য খণ্ড' এবং 'Sultana's Dream' বড়ো দিদি করিমুন্নেসাকে আর 'অবরোধবাসিনী' মাকে— যিনি অবরোধের মধ্যেই কাটিয়েছেন জীবন; প্রতিবাদ তো দূবে থাকুক, যন্ত্রণা প্রকাশেব সাহসই তাঁর ছিল না। পিতৃতন্ত্রের অনুশাসনকেই পালনীয় কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন, রোকেয়াকেও সেইমতো তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। উৎসর্গলিপিতে রোকেয়া বলেছেন— 'আমার স্নেহময়ী জননী অবরোধ প্রথার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন'। এ ধারণা হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকেই। ৫ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেদিন প্রথম মেমের সামনে বের হন তিনি, সেদিন তাঁর মা অবরোধকে মান্যতা না-দেওয়ার জন্য তাঁকে মারতে পর্যন্ত উদ্যত হয়েছিলেন। অবরোধবাসিনীদের দুববস্থাব চিত্র 'অবরোধবাসিনী'। রোকেয়ার মা অবরোধ-বাসিনীদেরই প্রতিনিধিস্থানীয়া। তাই হয়তো তাঁকে উৎসর্গ।

রোকেযা নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী ছিলেন না, তাই কাজকর্মে অনেকসময় কর্তৃপক্ষের বাধা মানতে হয়েছে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বোকেয়াব কণ্ঠে সেদিন অভিমান গুপ্ত থাকেনি। "আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা নই। গাধার খাটুনিই আমি খাটি। আধুনিককালের উপাধিধারিণী শিক্ষায়িত্রীদের দেখিয়াই কর্তৃপক্ষ স্কুলের ভালমন্দ বিচার করেন।" তাঁর মতে 'শিক্ষা মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই'। কারণ নারীর দাসত্ব শুধু তার বাহ্যিক দাসত্বই নয়, মানসিক দাসত্বও বটে। নারী যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকারী নন, ততদিন পর্যন্ত তিনি পুরুষের অধীন। কাজেই.তাঁর মতে পুথিগত বিদ্যাশিক্ষা মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারে না, এরজন্যে চাই এমন শিক্ষা, যার মাধ্যমে আত্মিক মুক্তি সম্ভব। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— 'টাকা উপার্জন করাই যে শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য, ইহা আমি কোন কালেই স্বীকার করি নাই। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা আবাব কেবল বি.এ, এম.এ পাশ করিলেও অনেকস্থলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। লেখাপড়া পরীক্ষা পাশের জন্য না হইয়া জ্ঞানলাভের জন্য হওয়া উচিত।' অন্যত্র বলেছেন 'শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে'! এমনকী আদর্শ গৃহিণী হবার ক্ষেত্রেও নারীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করেছেন তিনি। তাই বলেছেন—

> ".. আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা Mental Culture) করিব কিসের জন্য? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (Mental Culture) আবশ্যক।" আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি।

আসলে রোকেয়া বুঝতে পেবেছিলেন নারীকে মুক্তি পেতে হবে নিজেব চেষ্টায়। নারীব অবনতিব মূলে বয়েছে পুরুযের উপব নির্ভরশীলতা। এই পরমুখাপেক্ষী মনোভাবই নারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল করে তুলেছে। আর নাবীসমাজের এই সর্বনাশ থেকে মুক্তির জন্য প্রযোজন আত্মবিশ্বাস, আত্মমুক্তি ও আত্মনির্ভবশীলতা :

> " .. ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য কবেন, যে নিজে নিজের সাহায্য কবে (God helps those that help themselves)"

বস্তুত সেকালেব অন্যান্য মহিলাদের তুলনায বোকেযার সচেতনতা অনেক গভীব। আব এই সচেতনতার পেছনে মূল কারণ ছিল জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। তিনি বুঝেছিলেন 'মাটি কঠিন, আকাশ দূর'। তাঁর মতে দাসত্বই স্ত্রীজাতিব অবনতির অন্যতম কারণ। অথচ অবহেলিত ও দুর্দশাগ্রস্ত নারীকুল নিজেদের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নন। তাই এই ঘুমন্ত নাবীসমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্যই 'স্ত্রীজাতিব অবনতি' প্রবন্ধে বলেছেন :

> "পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদেব দাসত্ব গিযাছে কি?"

বাহ্যিক চাকচিক্য রোকেয়াকে আকর্ষণ করতে পারেনি, তাই অলঙ্কার পবিধানকেও তাঁর মনে হয়েছে দাসত্বের শৃঙ্খল, শাবীরিক দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেছেন এক সালঙ্কারা রমণীর চিত্র— যাব সর্বাঙ্গে ১০২৪০ টাকার অলঙ্কার। মাথায় ৪০ ভরি, কর্ণে ২৫ ভরি, কণ্ঠে ১২০ তোলা, বাহুলতায় ১৫০ ভরি, কটিদেশে ৬৫ ভবি, চরণযুগলে ২৪০ ভরি, নাকের নথেব ব্যাসার্ধ চার ইঞ্চি। তবে অলঙ্কাব পবিধানকে 'সৌন্দর্য বর্ধনের উপায' হিসেবে ধরে নিলে তাকে বোকেয়া বলেছেন 'মানসিক দুর্বলতা'। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য :

> "কারাগারে বন্দীগণ পায লৌহনির্মিত বেড়ী পবে, আমরা (আদরের জিনিষ বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ 'মল' পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহনির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত চুড়ি। কুকুবের গলে যে গলাবন্ধ দেখি, উহারই অনুকরণে!... গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া 'নাকাদড়ী' পরায় এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের 'নোলক' পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছে 'স্বামী'র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন।"

রোকেয়ার এই ব্যাখ্যা নারীকে দাসী থেকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। তিনি প্রস্তাব করেছেন— "... অলঙ্কারের টাকা দ্বারা 'জেনানা স্কুলের' আয়োজন করা হউক।"

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রোকেয়া পুরুষবিদ্বেষী নারী। তাঁর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সকলক্ষেত্রে। কিন্তু মূলত তা নয়, তিনি চেয়েছিলেন সমাজের স্থিতাবস্থাকে বজায় রেখে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। আবার মুসলিম সমাজের উন্নতির কথা মনে রেখে আরোপিত ধর্মের উপর কশাঘাত করেছেন তিনি। স্কুলের প্রসঙ্গে একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। একবার মনে হয়েছে মাকে ছেড়ে কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়, আবার কখনো অর্থসংক্রান্ত অসুবিধা দেখা দিয়েছে, পরবর্তী সময়ে দেখা দিয়েছে সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের অসহযোগিতা। কিন্তু সকল চিন্তা ও সংশয়ের অবসান ঘটেছে

অচিরেই। আর স্কুলগৃহও আশানুরূপ ভাবে বহাল হয়েছে। রোকেযার আজীবন সাধনার জয় হয়েছে। তিনি বলেছেন :

"আমবা তোমাবই উপসনা কবি এবং তোমাবই সাহায্য প্রার্থনা কবি - কোরান শরীফেব এই বচনটিই আমি জীবনেব পবতে পরতে সত্য বলিযা উপলব্ধি করিলাম।"

নারীর প্রথাগত ভূমিকাকে বোকেযা মেনে নিতে পাবেননি। পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টিতে নারীর দুটি রূপ স্বীকৃত— একটি দেবী অপরটি দাসী। কিন্তু রোকেযার কাছে এ দুটি রূপই অস্বীকৃত।

"নারীকে শিক্ষা দিবাব জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইযা থাকেন।... কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার কবিযাছেন, তাহাতে প্রকাশ পায যে, একটি পুতুলের সঙ্গে বালকেব যে সম্বন্ধ সীতার সঙ্গে বামেব সম্বন্ধ প্রায সেইরূপ। ... রাম বেচাবা অবোধ বালক, সীতাব অনুভব-শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, বুঝিযা কার্য কবিতে গেলে স্বামীত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটান যাইত না।"

তিনি সীতাব প্রতিরূপ তৈবি কবেছেন সিদ্দিকাকে। রামাযণে বাম সীতাকে ত্যাগ কবেছিলেন আর 'পদ্মরাগ'-এ তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে— সিদ্দিকা তার স্বামীকে ত্যাগ করেছে। সিদ্দিকাকে দেখে আরেকজনেব কথা মনে পড়ে, সে হল ইবসেনের নোরা। সিদ্দিকা নোরার চাইতেও আরো বেশি কঠোর, আরো বেশি কঠিন।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই নারীমুক্তির একমাত্র উপায— 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে এ কথাটাই প্রাধান্য পেয়েছে। ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা ভুলে লতিফের সঙ্গে 'সংসার ধর্মপালন' করার জন্য তারিণীর উপদেশ শুনে সিদ্দিকা বলে :

"সংসার ধর্ম আমার জন্য নহে। .... আমি সমাজকে দেখাইতে চাই যে... তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সে দিন আর নাই।"

তার মতে 'বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।'

সিদ্দিকা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুদ্ধকণ্ঠ নারীসমাজের সোচ্চার প্রতিনিধি। তারিণীভবন সমস্ত পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা, নিগৃহীতা, অপমানিতা নারীর একমাত্র আশ্রয়স্থল। ব্যারিস্টার তারিণীচরণ সেনের দ্বিতীয় পক্ষের সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণী বিধবা দীনতারিণী। তিনি 'তারিণীভবন' নামে একটি আশ্রম খোলেন। পরবর্তী সময়ে একটি বালিকা বিদ্যালয়, 'নারী ক্লেশ নিবারণী সমিতি' নামে একটি সভা, একটি বিধবা আশ্রম ও একটি আতুরআশ্রম তৈরি করলেন। রোকেয়াও 'তারিণীভবনের' মতো একটি আশ্রম তৈরি করতে ইচ্ছুক ছিলেন যেখানে অত্যাচারিত, অসহায় নারী সুস্থ সুন্দরভাবে জীবন কাটাতে পারবে, বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায় করে নিতে পারবে, সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারবে। তাই তো 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে তিনি বলেন :

"যে বিধবার তিন কুলে কেহ নাই, সে কোথায় আশ্রয় পাইবে? — তারিণী-ভবনে। যে বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে? — তারিণী বিদ্যালয়ে।

> যে সধবা স্বামীর পাশবিক অত্যাচারে চূর্ণ-বিচূর্ণ, জরাজীর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সে কোথায় গমন করিবে? - ঐ তাবিণী কর্মালয়ে। যে দরিদ্র দুবারোগ্য রোগে ভুগিতেছে, তাহারও আশ্রয় হল ঐ তারিণী আতুরাশ্রম।"

তাই তো তারিণীভবনের মেয়েরা কেউ টাইপিং শেখে, কেউ বা নার্সিং, আবাব কেউ টিচারস্ ট্রেনিং। অন্য মেয়েরা চরকা কাটে, কাপড় বোনে, সেলাই করে, মিষ্টি তৈরি করে।

রোকেয়ার স্বপ্নকল্পিত তারিণীভবনের বাস্তব রূপায়ণ যেমন রোকেয়ার মহিলাসমিতি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম', তেমনি 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের তারিণী বিদ্যালয়ের বাস্তব রূপ হল রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'।

তারিণীভবনের নারীরাও স্বাবলম্বী। সৌদামিনী, রাফিয়া, সকিনা, ঊষা, হেলেন, বিভা, চারুবালা সকলেই পুরুষতন্ত্র কর্তৃক কোনো-না-কোনো ভাবে নিগৃহীতা। তাদের কথোপকথনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিপীড়িতা নারীর অবস্থান, সেইসঙ্গে নারীর অধিকাব সম্পর্কিত চিন্তাধাবা। আবাসিকা মহিলাদের নানা কথোপকথনের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে প্রচলিত নারী-ভাবনার প্রতিবাদ— হয়তো বা আগামীদিনের আগাম দ্যোতনা। যেমন :

> "হেলেন। রাফিয়াবুর অকারণ 'তালাকে'র বিরুদ্ধে কোন আইন নাই কি?
>
> রাফিয়া। থাকিলেও আমি তাহার শরণ লইতে ঘৃণা বোধ করি।
>
> সকিনা। আমিও ত ঐ জন্যই তারিণী-ভবনে আসিয়াছি, আমিও দেখাইতে চাহি যে... স্বামীর 'ঘর-করাই' নারী-জীবনের সার নহে।.. তাহা শুধু 'রাধা-উনুনে ফু-পাড়া আর কাঁদাব' জন্য অপব্যয় করিবার জিনিষ নহে।
>
> রাফিয়া। আর... 'অবরোধ' প্রথার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে এইটাই যত অনিষ্টের মূল! লাথি ঝাঁটা হজম করিয়া 'অবরোধ' প্রথার সম্মান রক্ষা, — আর নহে।"

আরো আছে। ডাকাতদের হাতে অপহৃতা হবার পর শ্বশুরবাড়িতে সকিনার স্থান হয়নি। সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 'ঝি'র কথায় তাঁর সুপ্ত ব্যক্তিসত্তা জেগে ওঠে :

> "সত্যই ত, নিজে মরিব কেন? যাঁহারা আমার এ লাঞ্ছনার কারণ, তাঁহাদের মুখে কালী দিব।"

এমনি মুখে মুখে নানা প্রতিবাদী চেতনা স্ফুরিত হয়ে উঠেছে রোকেয়ার লেখনীতে।

বেগম রোকেয়া ইংল্যান্ডের বিচার-ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন উপন্যাসে। ইংরেজ রমণী হেলেনের স্বামী মদ্যপায়ী, সে হেলেনের ওপর শারীবিক ও মানসিক নির্যাতন করে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে হেলেন আদালতে 'ডিক্রি নিসি' দাবি করে। কিন্তু চাবজন বিচারকের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে হেলেনের মুক্তি হল না। রোকেয়া এই অমানবিকতার সমালোচনা করে বলেছেন—

> "ইংল্যান্ডের আইন হেলেনদিকে বাতুলের বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিতে পারিল না।... ইহা অপেক্ষা অবিচার অত্যাচার আর কি হইতে পারে? এই... পুতিগন্ধময় পচা ইংল্যান্ড আবার সভ্যতার দাবী করে।"

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের নায়ক লতিফ আত্মবিশ্লেষণে পটু। সে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে তার মনোভাব যথেষ্ট আধুনিক। পুরুষতন্ত্রের যুক্তিশৃঙ্খলা থেকে সে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। তাই তো সে বলেছে—

> "আদালতের কৃপায় না হয় সিদ্দিকার উপর দখল পাইলাম, তাহাতেও তাহাকে পাওয়া হইল না। আমি চাই সিদ্দিকার আভ্যন্তরীণ মানুষটিকে।"

পিতৃতন্ত্রের পরাক্রমের দহনে নারী হয়ে ওঠে বন্দিনি। হয়ে ওঠে অস্থাবর সম্পত্তি। লতিফ নারীকে সম্পত্তি হিসেবে মনে করেনি। উপন্যাসের নারীরা রক্তমাংসের মানবী। তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্দিকার ব্যক্তিসত্তার জয় হয়েছে। উপন্যাসের শেষে লতিফ যখন জিজ্ঞেস করেছে, 'সিদ্দিকা, স্পষ্ট বল, তুমি আমার গৃহিণী হইবে কি না?' সিদ্দিকা বলেছে, 'না। তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি'। প্রেমের সঙ্গে আত্মমর্যাদার মিলনে প্রেম মহিমান্বিত হয়, যদি কোথাও কোথাও প্রেমের জন্য আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তবে সে-প্রেম সার্থক হতে পারে না।

বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে রোকেয়া বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। উপন্যাসে দীনতারিণীকেও সেই সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রোকেয়ার সময়ে কথা উঠেছিল :

> "যুবতী বিধবা স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের রূপ যৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন।"

তেমনি তারিণী সম্পর্কে জনৈকা ছাত্রীর শাশুড়ির মন্তব্য :

> "(তারিণী) তারিণী-ভবন নামে একটা বিশেষ
> ব্যবসায়ের দোকান খুলিযাছেন, বাঙ্গালার বউ-ঝিকে ঘরের বাহির করিয়াছেন।"

এ ছাড়া সৌদামিনীর মুখে শোনা যায় 'বিমাতা হওয়া যে জীবনের অভিশাপ তাহা জানিতাম না'। এই কথা কি রোকেয়ার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন নয়? সেদিক দিয়ে মনে হয় 'পদ্মরাগ' রোকেয়ার আত্মজৈবনিক উপন্যাস। তবে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তা তিনি অতিক্রম করেছেন উপন্যাসে।

স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্মত্ত অবস্থা বুঝিতে হইবে

রোকেয়া চেয়েছিলেন পুরুষের সমকক্ষতা। কারণ তাঁর উপলব্ধিতে ছিল নারীর স্থান অন্তঃপুরের চারদেয়ালের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সে পুরুষের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সর্বকর্মের দাবিদার। তাঁর মতে নারী-স্বাধীনতা শুধু নারীর নিজস্ব স্বাধীনতা নয়, এই স্বাধীনতা হল, পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের, সমান অধিকার আদায়ের স্বাধীনতা। তাই 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে বলেন :

> "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।"

তিনি দেখেছিলেন সুবিধাবাদী পুরুষসমাজ মেয়েদের বঞ্চিত রেখেছে ন্যায্য অধিকার থেকে, তাদের বঞ্চিত রেখেছে পার্থিব ও অপার্থিব সম্পত্তি থেকে। আর সকল বাধা অগ্রাহ্য করে যখনই 'কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন ; অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ

অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।" রোকেয়া নিজের জীবনেও তা উপলব্ধি করেছেন। তাই বলেছেন :

> "জীবনের পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাৎ কুড়াইযাছি।"

যুগযুগ ধরে নারীকে অবহেলিত রাখার পেছনে আছে পুরুষতন্ত্রের সুপরিকল্পিত কৌশল। সমগ্র নারীসমাজের আলোকবর্তিকা রোকেয়ার দৃষ্টিতে এই কৌশলের নগ্ন রূপ ধরা পড়েছে। তাই অন্যদেরও তিনি সচেতন হবার আহ্বান জানিয়েছেন। ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের দোহাই দিয়ে পুরুষতন্ত্র নারীর উপর অধিকার কায়েম রাখতে চায়। পুরুষের তৈরি এই মরীচিকা থেকে সতর্ক হতে অনুরোধ করেছেন তিনি। তাঁর মতে ধর্মগ্রন্থগুলো হল নারীকে আয়ত্তে রাখার জন্য পুরুষতন্ত্রের নির্দেশপত্র।

> "আমাদের অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিযাছেন।... এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দু নারীকেও অবদমিত রাখা হয়েছে। এই ব্যাপারে নারীর জাত নেই, জাতিধর্ম নির্বিশেষে-নির্বিচারে নারীকে নিষ্পেষিত করা হয়েছে কী হিন্দু কী মুসলমান। কোথাও শরিয়তের দোহাই তো কোথাও মনুসংহিতার। সমাজের এই নিষ্ঠুর সত্য রোকেয়ার চোখে ধরা পড়েছিল। তাই 'সুলতানার স্বপ্নে' আক্ষেপ করে বলেছেন:

> "সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু —তাহারা সমুদয় সুখ-সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সবলা অবলাকে অন্তঃপুররূপ পিঞ্জরে রাখিয়াছে।"

আর এজন্যই রোকেয়া এমন একটি স্বপ্নরাজ্য কল্পনা করেছেন, যে রাজ্যটি নারীশাসিত। বাংলা সাহিত্যে পঞ্চদশ শতকের কবি শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যে বর্ণিত 'কদলীনগর' এমনি এক নারীশাসিত রাজ্যের উদাহরণ। রোকেয়ার নারীশাসিত রাজ্যে পুরুষজাতি শৃঙ্খলাবদ্ধ তাই অন্যায়ের প্রবেশাধিকার সেখানে নেই। তাই 'স্বয়ং পুণ্য' সেখানে নারীবেশে রাজত্ব করেন। মনে হয় 'সুলতানার স্বপ্ন' তাঁর প্রতিক্রিয়ামূলক রচনা।

তাই সেখানে পুরুষ পরিশ্রমের কাজ করে আর নারী করে অন্যান্য কাজ। নায়িকা সুলতানা আরা বলে—

> "তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, আমরা মস্তিষ্ক চালনা করি। আমরা যে সকল যন্ত্রের উদ্ভাবনা বা সৃষ্টি কল্পনা করি, তাঁহারা তাহা নির্মাণ করেন।
> নরনারী উভয়ে একই সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ— পুরুষ শরীর, রমণী মন।"

মানুষের সমাজ যেহেতু পুরুষের সমাজ, কাজেই 'ঊনমানব' নারীর অস্তিত্ব সেখানে অস্বীকৃত। তাই কল্পনারাজ্যেই নারীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়ে ওঠে। জাগতিক জীবনে যারা নিপীড়িত, 'সুলতানার স্বপ্নে' তারা সম্মানজনক আসন গ্রহণ করে। নারীবাদী তাত্ত্বিক এলেন শোআলটেরের মতে, অবজ্ঞার জায়গা থেকে উঠে এসে নারী যে সন্দর্ভটি তৈরি করে তা হল—

"Double voiced discourse that always embodies the social literary and cultural heritage of the muled and the dominant "[8]

'সুলতানার স্বপ্নে' নারী তার নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেছে, যার ঠিকানা আমরা পুরুষনিয়ন্ত্রিত বাস্তবে দেখতে পাই না অথচ প্রত্যাশা কবি। সেই জগৎই খুঁজে বেড়াই স্বপ্নের পরাজগতে। দেখা যায়, নারীসত্তা পুরুষের একবাচনিক সন্দর্ভকে ডিঙিয়ে তৈরি করেছে স্বপ্নজগতের আঁধাবে দ্বিবাচনিক সন্দর্ভ, রোকেয়ার তৈরি নারীস্থান বা Layland-এ।

রোকেয়া ছিলেন প্রাগ্রসর চিন্তাধারার অধিকারী। তাই 'সুলতানার স্বপ্নে' বাল্যবিবাহ বদ করার দাবি উত্থাপিত করে বলেন—

"একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পাবিবে না।"

'সুলতানার স্বপ্ন' রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতার প্রতিফলন এবং দূবদৃষ্টির পরিচাযক। তাই নারীশাসিত রাজ্যে বেলুনের সাহায্যে বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়, সৌরশক্তি সংরক্ষণেব মাধ্যমে রন্ধন, 'গৃহস্থালী ঈষৎ উত্তপ্ত রাখা' হয়। মনে হয় রোকেয়ার এই বিজ্ঞানসুলভ মনোভাবের পেছনে ছিল কৃষিবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বামীর সাহচর্য। সেইসঙ্গে ছিল নিজের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসু মনোভাব।

রোকেয়ার 'সৌরজগৎ'-এ অবরোধ ও স্ত্রীশিক্ষা-বিবোধী মনোভাবেব সমালোচনাই মুখ্য বিষয়। সেখানে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে জাফব আলী। বিংশ শতাব্দীব প্রথমদিকেও স্কুলে মেয়েদের শিক্ষালাভের ব্যাপারে মুসলিম সমাজে রক্ষণশীল প্রভাবই কার্যকরী ছিল। তাই তো জাফর আলীর বক্তব্যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় পুরুষতন্ত্রের মনোভাব সুস্পষ্ট :

"স্কুল শব্দ শুনিবামাত্র জাফর বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিলেন, কি বলিলে? স্কুলে মেয়ে ভর্ত্তি করবে? এখনও ভারত হইতে মুসলমানের নাম বিলুপ্ত হয় নাই— এখনও মুসলমান সমাজ ধ্বংস হয় নাই! এখনই মেয়েরা স্কুলে পড়িবে?"

ইংল্যান্ডের নির্যাতিতা নারীকুলের সঙ্গে আমাদের নির্যাতিতা নারীকুলের তুলনা করার উদ্দেশ্যেই রোকেয়া ইংরেজ লেখিকা মেরী করেলীর 'Murder of Delicia গল্পাংশের অনুবাদ করেছেন 'ডেলিশিয়া হত্যা' নামে। তাই ডেলিশিয়া চরিত্রের সাদৃশ্য তৈরি করেছেন মজলুমা চরিত্র। আর উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল ডেলিশিয়া লেখিকা, গ্রন্থকর্ত্রী হিসেবে খ্যাতি ও প্রচুর অর্থের অধিকারী। অন্যদিকে মজলুমা নিরক্ষর, সে পুরুষের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, সেটা হল উভয়েই স্বামী কর্তৃক নির্যাতিতা। এই দুই নারীর তুলনা করতে গিয়ে রোকেয়া বলেছেন—

"তেজস্বিনী ডেলিশিয়া পিস্তল হস্তে স্বামীকে স্পষ্ট বলিলেন, 'তুমি আমার নিকট আর একপদ অগ্রসর হইলে আমি তোমাকে গুলী করিব।' অভাগিনী মজলুমা সেরূপ কথা বলিবেন দূরে থাকুক— তিনি বরং অত্যাচারীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া নাকি কান্না ধরিবেন— বলিবেন, 'প্রভো। দাসীর কি অপরাধ হইয়াছে?' অথবা দাসীর প্রতি সদয় হও।"

ডেলিশিয়া ও মজলুমা তাই দুই মেরুর বাসিন্দা, মূলত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকা বা না-থাকার সূত্রে। রোকেয়া বিশ্বাস করতেন নারী-পুরুষের সমবেত চেষ্টার মাধ্যমেই

ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। আর 'মুক্তিফল' রূপকটিতে তাঁর সেই ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে।

অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে— নৈতিক

অববোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বোকেয়ার সাহিত্য রচনার প্রধান প্রেরণা। এই অবরোধ প্রথাকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন 'অবরোধবাসিনী'। নিবেদন অংশে বলেছেন, 'কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া অবরোধ-বাসিনী রচিত হইল'। অবরোধবাসিনী শিশু রোকেয়ার জীবন সেইসঙ্গে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত চোখে দেখা অবরোধবাসিনীদেব সামাজিক অবরুদ্ধতার কারণে লাঞ্ছনা, তাঁদের জীবনযন্ত্রণা তির্যক মন্তব্যে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত বয়ানে অবরোধ প্রথার নামে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারকে কশাঘাত করেছেন। তিনি জানতেন অবরোধ ক্ষতিকর। তাই 'বোরকা' প্রবন্ধে মসৃণ অবরোধের কথা বলেছেন 'আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব।... বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা (coarse) হইয়া থাকে। ইহাকে কিছু সুদর্শন (fine) করিতে হইবে'। প্রগতিশীল রোকেয়া পর্দা অর্থে শালীনতা বোঝাতে চেয়েছেন। আর এজন্যেই 'বোরকা' প্রবন্ধে পর্দার সমর্থনে তাঁর যুক্তি ছিল—

> 'বর্তমান যুগে ইউরোপীয় ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন, তাঁহাদের পর্দা নাই কে বলে? তাহাদের শয়নকক্ষে; এমনকি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে না। এ প্রথা কি দোষনীয়? অবশ্য নহে।...' 'সকল সভ্য জাতিদেরই কোন-না-কোন রূপ অবরোধ প্রথা আছে। এই অবরোধ প্রথা না থাকিলে মানুষও পশুতে প্রভেদ কি থাকে?'

আবার 'পদ্মরাগ'-এ নায়িকা সিদ্দিকার মুখে শুনতে পাই—

> 'আমি আজীবন... নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব।'

১৯২৬ সালে 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে' লিখিত ভাষণে বলেছেন—

> 'পর্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোনো মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি— কেবল এইটুকু বলি যে, শেখ সাহেব [শেখ আবদুল্লাহ্] পর্দাকে "সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত" বলিয়াছেন, আমি তাহা মনে করি না। "যন্ত্রণাদায়ক' হইলে অবলাগণ 'বাবারে! মা'রে! মলুম রে! গেলুম রে, বলিয়া আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন। অবরোধ প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্বলিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্বলিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না। অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।'

সব যুগের সব লেখকের মধ্যেই স্ববিরোধিতার ছাপ ফুটে ওঠে। কোথাও কম, কোথাও বা বেশি। রোকেয়াও তার ব্যতিক্রম নন। এই স্ববিরোধিতার কারণ কোথাও কোথাও আভাসে-ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন তিনি। যেমন, 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক নারী-হিতৈষী নাসিরুদ্দিনকে বলেছেন—

'আমাব স্কুলটা আমাব প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়।... স্কুলেব জন্য আমি সমাজের সব অবিচাব অত্যাচাব সহ্য করে চলেছি।'

আবাব ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও একই সুবের প্রতিধ্বনি পাই

'.. তবু পর্দা করছি কেন জানেন? বুড়ো হয়ে গেছি, মরে যাব। ইস্কুলটা এতদিন চালিয়ে এলাম, আমার মরার সঙ্গে সঙ্গে এও যদি মবে সেই ভয়ে।'

এই সাক্ষাৎকারেই স্কুলেব ব্যাপারে স্যার আবদুল কবীম গজনভীব (কবিমুন্নেসার পুত্র, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার) সঙ্গে যোগাযোগেব বিষয় জানতে চাইলে বোকেযা বলেন—

'তাঁকে তো ধরেছি। তিনি বললেন, 'আপনি পর্দা মানেন না, আপনাকে নিয়ে আমি শরম পাই। আপনি পর্দা মানতে রাজী হন, আমি ইস্কুল সবকারী কবে নিচ্ছি।' 'তাকে অভয় দিয়েছি; আমি পর্দা মানবো, তুমি ইস্কুল নিয়ে সরকারের হাতে দাও।'

অর্থাৎ স্কুলের কথা ভেবে সমাজেব রক্ষণশীল মনোভাবকে অগ্রাহ্য করেননি। যে সমস্ত সংস্কার তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন, সংস্কার সমর্থনে একাগ্র যাঁদেব বিরুদ্ধে ছিল তাঁব লড়াই, স্কুল ও সংগঠনের স্বার্থে তাঁদেব বিরুদ্ধাচবণ কবতে চাননি তিনি। এর জন্যে তাকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। প্রতিকূল সময় ও বিরুদ্ধ সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে আপস কবতে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কারণ তিনি জানতেন, 'জেহাদ ঘোষণা কবিলে যদি প্রথম তরবারি আমারই গলায় পড়ে তবে সে সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সবই সাফ হইয়া যাইবে'। তাই প্রথমদিকে তাঁর কণ্ঠে যে-বিদ্রোহের সুব ছিল পববর্তী সময়ে তা অনেকটা স্থিত হয়ে আসে। কখনো বাক্যবাণে পুরুষতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে পরবর্তীতে তাঁদের উষ্মা দেখে তাঁদের সুরে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। কৃষ্ণভাবিনী প্রথমে প্রচণ্ড ক্ষোভেব সঙ্গে বলেছেন দাসত্ব কবিবার জন্যই সৃজিত হয় নাই... নিজের নিমিত্ত ও বাঁচিযা থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'স্ত্রীজাতিব প্রধান কর্মক্ষেত্র গৃহ, প্রধান কর্তব্য গৃহকর্ম'। ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্ দেখাতে চেয়েছেন, নারীকে বন্দি করার সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক শক্তিও নষ্ট করে ফেলা হয়, আর রোকেয়াও বলেছেন একই কথা 'আমাদের মন পর্য্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে'। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে রোকেয়ার পার্থক্য হল, দ্বান্দ্বিক অবস্থান নিয়েই রোকেয়া তাঁর সময়ের তাঁর সমকালীন সমাজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার সাহস বা সুযোগ পেয়েছেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধিই তাঁর কাছে প্রধান, দোলাচল মানসিকতা বা দ্বিরাচারী অবস্থান সেখানে গৌন। তিনি একজন সমাজকর্মী তথা সমাজসংস্কারক, সমকালীন পরিসরে সমাজবাস্তবতাকে অস্বীকার করে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে ব্যর্থ হতে চাননি তিনি, আর এখানেই তার বুদ্ধিমত্তা। আকিমুন রহমানের বয়ানে তাই 'পাথর চাপা ঘাস'। শুধু তাই নয়, রোকেয়া সম্পর্কে আকিমুন রহমানের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত—

'রোকেয়া শেকল মুক্তির লড়াইবত লড়াকু মানুষ নন, যদিও তার রচনাবলী পাঠে জাগে অমনই বিভ্রম। রোকেয়া পাথর চাপা ঘাস বা স্বামীর ছাঁচে বিকশিত এক পরিতৃপ্ত বেগম, এখন নারী মুক্তির অগ্রদূত বলে যে পেয়েছে ভুল প্রসিদ্ধি।'[৫]

মনে হয় রোকেয়াকে বোধহয় আকিমুন নিজের প্রতিপক্ষ ধরেই আলোচনাতে একনিবিষ্ট হয়েছেন। তা না-হলে একুশ শতকে মুক্তি আন্দোলনের পূর্বমাতৃকাদের প্রতিভা ও দক্ষতার

বিচার করতে গিয়ে ইতিহাসেব পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদেব উদ্যোগকে স্বাগত না-জানিয়ে তাঁদের অভিযুক্ত করার মধ্যে নতুনত্বের চমক থাকতে পারে, কিন্তু পাঠকেব গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহেব অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। এর পাশাপাশি ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনাতে সমাজকর্মী রোকেয়া, সংস্কাবপ্রত্যাশী উৎসর্গীকৃতপ্রাণা রোকেয়ার যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে—

> "রোকেয়াব মানস-চিত্রকে নিবেদিতার চিত্রেব পার্শ্বে স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয়। নিবেদিতার কর্ম-ক্ষেত্র আরও ব্যাপক ছিল; তিনি মুখ্যতঃ ছিলেন সেই ভারতের, যে ভাবত নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছে— আর রোকেয়া ছিলেন মুখ্যতঃ সেই ভারতেব, যে ভারত সংসারেব মধ্যে নিজের নীড় বাধিয়া রাখিয়াছে।"[৬]

রোকেযা এককভাবে মুক্তি অর্জনে আকাঙ্ক্ষী নন। তিনি সবাব সঙ্গে সবাইকে নিয়েই মুক্তি চেয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন নারী যতটা না শারীরিক বা মানসিকভাবে শৃঙ্খলিত তার চাইতে বেশি সামাজিকভাবে অবরুদ্ধ। তাই সমাজে বাস করেই সমাজকে শোধরাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

রোকেয়ার মৃত্যুর কয়েকমাস আগে শামসুননাহার মাহমুদ একটি নারী সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে সভানেত্রীর ভাষণে তিনি বলেন—

> "আজ আমি আপনাদের দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম। প্রায় পঁচিশ বৎসর হইতে আমি মুসলিম নারীসমাজকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি; কিন্তু ঘুম তাহাদের কিছুতেই ভাঙিতেছিল না। ডাকিয়া ডাকিয়া জাগাই— আবার পাশ ফিরিয়া ঘুমান। বাইশ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াৎ মেমেরিয়াল স্কুল পরিচালনা করিয়া দেখিলাম, তাঁহারা আগে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতেন, পরে উঠিয়া বসিয়া ঝিমাইতেন — কিন্তু গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন না। সুখের বিষয় এদিকে কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি তাঁহারা চোখ রগড়াইয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ এতগুলি শিক্ষিতা মহিলাকে দেখিতে পাইয়া চক্ষু জুড়াইল।"[৭]

নারীশিক্ষা, নারীউন্নতি নিয়েই তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগেও বিবাহবিচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবি জানিয়ে 'নারীর অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। প্রবন্ধটিতে বৃদ্ধ পুরুষদের বালিকা বিবাহে আগ্রহ নিয়ে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত একটি ছড়ারও উল্লেখ রয়েছে। ছড়াটি এরকম—

> 'হুকুর হুকুর কাশে বুড়া
> হুকুর হুকুর কাশে
> নিকার নামে হাসে বুড়া
> ফুকুর ফুকুর হাসে'

মনে পড়ে যায়, কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলি যাত্রা'র মৃত্যুপথযাত্রী বুড়োর কথা। প্রবাদই তো আছে, 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'। পিতামাতার জন্মজন্মান্তরের পুণ্যলাভই যেখানে প্রধান সেখানে বালিকার ভূত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবে কে? তৎকালীন যুগের এই বাস্তব সমাজচিত্র উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার কতটুকু বা অবস্থান কোন পর্যায়ে, তাই

চিহ্নিত করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রবন্ধের শেষাংশ আমরা পেলাম না। তাঁর লেখার উদ্দেশ্য ছিল সমাজসচেতনতা তৈরি করা, পাঠককে আনন্দ দান নয়। তাঁর লেখনীতে আমরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল, রোকেয়া সেই নবজাগরণের উত্তরাধিকারী।

১৯৩২ খ্রিঃ ৯ ডিসেম্বর শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক, প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার অধিকারী, নারী আন্দোলনের সৈনিক রোকেয়া পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। জীবনে যারা রোকেয়াকে দেখেননি, তাদের হৃদয়েও সেদিন ছিল অব্যক্ত হাহাকার। শেষ ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন তিনি তাঁর কোনো এক প্রিয়তমা ছাত্রীকে—

> 'সত্যসত্যই জীবনের কুন্দকুসুম যেদিন ঝরিয়া পড়িবে সেদিন আমার শেষ বিশ্রামস্থান রচনা করিও আমার প্রাণের এই তাজমহলের একপাশে— কবরে শুইয়া শুইয়াও যেন আমি আমার মেয়েদের কলকোলাহল শুনিতে পাই।'[৮]

কিন্তু মৃত্যুর পরও তাঁর শেষ ইচ্ছার মর্যাদা দেওয়া হল না। তাঁর সমাধি হল কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে আত্মীয়-স্বজনের পুরাতন গোরস্থানে। পুরুষতন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে যিনি জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে গেলেন, মৃত্যুর পরও তাঁর নিজস্ব বাসনা পূর্ণ হল না। রাসসুন্দরীর মতো রোকেয়ার ক্ষেত্রেও প্রথারই জয় হল। রোকেয়া বলেছিলেন, "জানি না কবরের ভিতরেও অভিভাবকের বাটীতে থাকা হয় কি না!!" আমরাও জানি না সেখানে মুক্তনারীবাদের ধারক বাহক রোকেয়া সত্যিই অভিভাবকত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন কি না, পেয়েছিলেন কি না চির আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে

আশালতা সেনের 'সেকালের কথা'

(১৮৯৪-১৯৮৬)

"শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূতনাম
মায়ের রাখিব মান— লয়েছি এ মহাব্রত
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত"

— স্বর্ণকুমারী দেবী

বিশ শতকে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত কবার সংকল্পে অটল অসংখ্য মানুষের মধ্যে নারীরাও ছিলেন, যাঁদের অধিকাংশই শিক্ষিত স্বচ্ছল পরিবারের। পাশাপাশি গ্রাম-গঞ্জের অতি সাধারণ নারীর অংশগ্রহণও ছিল। স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকেই অসংখ্য নারী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে শুরু করেন। সামাজিক ক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা অস্বীকৃত ছিল তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং বিশেষত বৈপ্লবিক মনোভাব নিয়ে আন্দোলনে শামিল হওয়া যে কতটা দুর্বহ ছিল তা তো সহজেই অনুমেয়।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারলাভ করে প্রথম বাংলায়। ফলস্বরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষও হয় প্রথম বাংলাদেশেই। যখন অভিজাত মেয়েদের পাল্কিসহ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা হত, অর্ধহস্ত ঘোমটা দিয়ে কূপমণ্ডূক জীবন কাটাতে হত কুলবধূদের, সে-সময়ই ব্যতিক্রমী সত্তা জ্ঞানদানন্দিনী স্বামীর সঙ্গে বিলেতে গিয়েছিলেন, কৃষ্ণভাবিনীও ইংল্যান্ড পাড়ি দিয়েছিলেন শুধু ভ্রমণোদ্দেশ্যে নয়, শেখার এবং বাস্তবিক প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষায়। সেই সমাজের ব্যতিক্রমী মহিলাদের মধ্যেই রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ হয়েছিল, সমাজ-সংসারের প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই। সাংসারিক কাজকর্মের দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ হয়েও বাংলার এইসমস্ত মেয়েরা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিস্মৃত এই মহিলা সংগ্রামীদের মধ্যে ননীবালা দেবী ও দুকড়িবালা দেবী ছাড়াও ছিলেন অনামিজনেরা। কমলা দাশগুপ্ত লিখেছেন—

> "ননীবালা দেবী ছিলেন বাংলার একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার। ... ননীবালা দেবীর যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই সময় যখন সমাজের লৌহশৃঙ্খল ছিল কঠিনভাবে বাঁধা নারীর হাতে ও পায়ে। তাকে নিজ শক্তিতে ভেঙে নিজে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন তিনি দুর্দম তেজে।"[১]

বোঝা যায়, রাজনৈতিক পরাধীনতার পূর্বেই সামাজিক পরাধীনতা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিয়েছিল শিক্ষিত সচেতন নারীদের মধ্যে। একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীত্বের প্রচলিত শক্তিস্বরূপিনী মূর্তির মহিমায় গৌরবান্বিত হয়ে ঔপনিবেশিকতার অপমান ভুলতে চাইছিলেন অনেকে, অন্যদিকে কিন্তু শিক্ষিত মনের পরস্পরবিরোধী যুক্তি-পরম্পরা নাবীত্বেব প্রচলিত প্রতিকল্পকে মান্যতা দিতে অস্বীকৃত ছিল। সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৬) জাতীয় গৌরবের প্রতি যুবসমাজকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে বীরাষ্টমী ব্রতপালন, প্রতাপাদিত্য উৎসব যেমন চালু করেছিলেন তেমনি মহীশূরে চাকরি করতে গিয়ে রাজনৈতিক মতামত জোরগলায় ঘোষণা করে নারী-প্রতিমার জাতীযতাবাদী নির্মাণকে ভেঙেও ছিলেন।[২] স্ত্রীশিক্ষার সূচনা, ব্যক্তিত্বের উন্মোচন, পুরুষেব দেওযা প্রচলিত ধারণার দর্পণ ভেঙে নবনির্মাণেব জন্য নতুন চিন্তা নতুন ভাবনায় অনুপ্রাণিত হতে নারীকে সাহসী কবে তোলে। একই বৃন্তে দুটি কুসুমের মতো নারীর পরাধীনতা আর দেশের পবাধীনতাকে পাশাপাশি বেখে নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশ ও দশের মুক্তিযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ বাঁধ-ভাঙা জোয়ার আসে গান্ধিজির উদ্যোগে। নারীকে সরাসরি দেশের কাজে নিয়ে আসেন গান্ধিজি। কিন্তু অন্দরমহলের বাধাকে উপেক্ষা করে বহির্মহলের আন্দোলনে নারীকে আহ্বান জানানোব ঔদার্য দেখালেও রাজনৈতিক পবিকাঠামোব কোথাও তাঁদেব স্থান নির্দিষ্ট কবেননি, হয়তো বা করতে চাননি। চিরাচরিত অবস্থানে, সুনির্দিষ্ট অন্দরমহলেব সুপবিচিত গণ্ডিতেই তাঁদের দেখতে চেয়েছিলেন তিনি নিজেও।

ত্রিশের দশক থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন যুক্ত হয়ে যায় সাধারণ মানুযের সর্বাত্মক মুক্তিভাবনার সঙ্গে। বিশ শতকেব শুরুতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, দ্বিতীয় দশকে অসহযোগ, তৃতীয় দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে নারীবা অংশ নেন। এদের মধ্যে রক্ষণশীল সমাজের মুসলমান মহিলারাও ছিলেন। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ আকৃষ্ট কবে অনেককে। কারারুদ্ধ হয়ে জীবন কাটাতে গিয়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অনেকে— তাঁদের মধ্যে আছেন রানী চন্দ (যিনি আশালতা সেনের 'সেকালের কথা'র ভূমিকা লিখেছেন), মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন জেল খাটার অভিজ্ঞতা 'সেদিনেব কথা'— আছেন আরো অন্যরা। আবার অনেকে গান্ধিজির অহিংস আন্দোলনে দীক্ষিত হয়ে সংগঠনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। পূর্ববাংলার ঘরে ঘরে নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তুলতেও তাঁরা ছিলেন সচেষ্ট। তাঁদেরই অন্যতম আশালতা সেন। দেশের চরণে নিবেদিতাপ্রাণা এই সংগ্রামী সত্তার জীবনপাঠে, ব্যক্তিক উচ্চারণে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে জীবনখাতার প্রতি পাতায় ব্যক্তিসত্তার অনিবার্য উপস্থিতি।

১৮৯৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি নোয়াখালি শহরে রাজনৈতিক কর্মী তথা কবি-সাহিত্যিক আশালতা সেনের জন্ম। যদিও তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল নোয়াখালির উত্তরপূর্বে ঢাকা জেলার বিক্রমপুব পরগণার বিদগাঁ গ্রামে। 'কন্যাপণ বিনাশিকা' আর 'পঞ্চবটিতত্ত্ব' বই দুইটির লেখক মুন্সি কাশীনাথ দাশগুপ্তের নাতনি তিনি। 'জন্মসূত্রে সমাজসেবার উত্তরাধিকার তিনি সগর্বে ঘোষণা করেন তার আত্মজীবনীমূলক 'সেকালের কথা' বইটিতে। সমাজসংস্কারের কাজে পিতামহের যুক্ত থাকার কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঈশ্বরগুপ্তের প্রশস্তিমূলক বন্দনার কথা।

'নিবসতি বিদগ্রাম, বৈদ্য কাশীনাথ নাম
পরিশ্রম অবিশ্রাম বিবিধ প্রকার
গ্রাম্য ডাক প্রচলনে করিলেন সযতনে
কত না অশেষ শ্রম বিশেষ প্রকার
জীবনের সার্থকতা পর উপকার ভায়া পর উপকার'

সাহিত্যানুরাগী পিতা বগলামোহন দাশগুপ্তের লেখা তেজস্বিনী সুভদ্রা সম্বন্ধীয় উচ্চপ্রশংসিত বইটির উল্লেখের পাশাপাশি মেয়েদের সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে তাঁর উদ্যোগী ভূমিকার কথাও লিখেছেন শুরুতেই।

আশালতার মূল্যবোধ-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, পদক্ষেপ-পদচারণার আদর্শ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। আর এই প্রাপ্তির ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয়ের ভূমিকাই অনস্বীকার্য। সঙ্গে ছিল স্থানিক পরিবেশ, সেখানকার মহিলাদের ঈর্ষণীয় সামাজিক অবস্থান, তাঁদের আত্মশক্তির প্রকাশ— যা তিনি 'সেকালের কথা'র সংযোজন অংশে 'বিক্রমপুরের নারী আন্দোলন' শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছেন।

মা মনোদা দাশগুপ্তের লেখিকা সত্তার পরিচয়ের সঙ্গে মাতামহী নবশশীদেবীও যে 'পূর্ণানন্দ তরঙ্গিনী' নামে দার্শনিক বই লিখেছিলেন তা-ও জানিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্থান পেয়েছে সে-সময়কার নারীশিক্ষায় প্রতিকূল মনোভাব তথা পরিবেশের কথা। পিতামহ নারীর সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন কারণ তখনো কুসংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন ছিল জনমানস। পিতৃতন্ত্রের ধারক-বাহকদের ধ্বজা তখনো সগৌরবে বহাল ছিল, তাই সমাজে লেখাপড়া সেরকমভাবে স্বীকৃত হয়নি। বৈধব্যের ভয়েই লেখাপড়া থেকে বিরত থাকতেন অধিকাংশজনেরা। অন্যদিকে প্রগতিশীল যুবকেরা সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে এলেও বাধাপ্রাপ্ত হতেন বাড়ির কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দাপটি বৃদ্ধাদের কাছ থেকেই। জীবনাচরণ পদ্ধতি সে-সময় নীতি, নিয়ম, শাসনের সুকঠিন বন্ধনে চালিত হত। পরবর্তী প্রজন্মকেও তাঁরা সেভাবেই চালিত করতেন। আধুনিক মনোভাবাপন্ন পুরুষেরা মহিলাদের নিজেদের পরিবর্তিত মানসিকতার উপযোগী করে তুলতে চাইলেও বাধাপ্রাপ্ত হতেন বাড়ির কর্ত্রীর কাছ থেকেই। কারণ 'অন্দরমহলে কর্তাদের চেয়ে কর্ত্রীদের দাপট প্রায়ই অনেক বেশি থাকত। বাইরের জগতে পুরুষরা মেয়েদের স্থান দিতেন না। এরই শোধ যেন মেয়েরা নিতেন অন্দরমহলে পুরুষদের কর্তৃত্ব যতটা সম্ভব খর্ব করে'। তবে সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবেও যে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল তার প্রমাণ নবশশীদেবীর শাশুড়ি (রামলক্ষ্মী) যিনি নবশশীদেবীর পড়াশোনার আগ্রহে প্রথমে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন, তাঁকে লুকিয়ে তাঁর চোখের আড়াল করে অঙ্কের খাতা বাড়ির পেছনের ঝোপে লুকিয়ে রাখতেন তিনি। পরে দেওর তা সংশোধন করে সেখানেই রেখে আসতেন। তিনিই যখন শাস্ত্রপড়া, হিসাব রাখা এবং চিঠি লেখা আয়ত্তাধীন করে নিলেন তখন 'তার ভাবধারা একেবারে বদলে গেল।' তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার পক্ষপাতী হয়ে পড়লেন। পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষায় বিরোধী অন্যান্য বৃদ্ধাদের মনোভাব পরিবর্তনেও সচেষ্ট হলেন। স্বদেশি আন্দোলনেও তাঁর পরোক্ষ ভূমিকার কথা আমরা জেনেছি আশালতার জবানিতে। রামলক্ষ্মী ছিলেন পিতৃতন্ত্র আরোপিত অনুশাসনে আবদ্ধ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এ পরিবর্তনে অলক্ষ্য ভূমিকা ছিল নবশশীদেবীর।

যিনি একদিকে পূর্বসূরি অন্যদিকে উত্তরসূরির (আশালতা) মানসিকতার ভিত গঠনে সহায়ক সূত্রধার। বিদ্যানুরাগী, লেখিকা, সংস্কারমুক্ত, স্বদেশি আন্দোলনে পরোক্ষ অংশগ্রহণকারী নবশশীদেবীর কথা অজানাই থেকে যেত, সেদিক দিয়ে 'সেকালের কথা' শুধু আশালতার সময়ই নয়, তারও পূর্বেকার সমাজ ইতিহাসের, বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাওয়া অজানা অনামি জনের পবিচিতি প্রদানে এক মূল্যবান উপাদান।

আশালতা জীবনকথা লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন অন্যের ইচ্ছেতেই, তাই শুরুতেই বলেছেন— 'সেকালের কথা শুনতে চাও। বলছি'। নিজের পিতৃকুল এবং মাতৃকুল সম্পর্কে গর্বিত আশালতা সেকালের কথা বলতে গিয়ে নারীর রাজনৈতিক অবস্থানকে বিষয়ীভূত করেছেন, ব্যক্তিগত জীবনকে ঠিক উপেক্ষা করেননি, হয়তো বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে গেছেন। নিজের কথা বলতে গিয়ে শুধুমাত্র নিজের কর্মজীবনের বিবরণই লিপিবদ্ধ করেছেন। সূক্ষ্ম রসবোধের অভাবের জন্যই তাঁর লেখা আত্মকৃতকর্মের তালিকায় পর্যবসিত হয়েছে। আত্মজীবনীর গণ্ডি এড়িয়ে তা হয়ে উঠেছে প্রচারধর্মী আত্মচরিত। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে 'প্রিয়জনদের দূরে সরিয়ে সুখস্মৃতি ঢেকে রেখে শোকসন্তাপ এড়িয়ে, আত্মকথা কি সম্পূর্ণ হয়'? সেদিক দিয়ে 'সেকালের কথা' অসম্পূর্ণ আত্মকথা। অবশ্য এ-ও সত্য যে, লেখিকা আত্মকথা লিখতে প্রবৃত্ত হননি, তিনি তাঁর সময়ের কথা লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন। সে-বিচারে তাঁর লেখা পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নারীর অবস্থান তথা স্বাদেশিক আন্দোলনের এক প্রামাণ্য দলিল।

ভারতবর্ষে নিজেদের শাসন বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই দেশকে অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দুর্বল করার এক চক্রান্ত চলছিল, আর এই চক্রান্তের চূড়ান্ত ফল বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত। ১৯০৫-এর ২০ জুলাই বঙ্গভঙ্গের কথা সরকারিভাবে ঘোষিত হয়, আর প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হয় ১৬ অক্টোবর। ১৫টি জেলার অধিকার হারিয়ে বাংলা দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়— (১) বাংলা, (২) আসাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে নবগঠিত প্রদেশ। এই নতুন প্রদেশের আয়তন ছিল ১০৬৫৪০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা তিন কোটি দশ লক্ষ। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়, রাখিবন্ধন, অরন্ধন, বিলিতি দ্রব্য বর্জনের মধ্য দিয়ে; দেশপ্রেমিক জনগণ স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন, বিপ্লবীদের সশস্ত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে ঘরে-বাইরে চারদিকে। এই উন্মাদনার শরিক হন নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই। অন্দরমহলের রুদ্ধ জীবনে আলোড়ন আসে। কেউ বা সরবে, কেউ নীরব সমর্থনের মধ্য দিয়ে যোগদান করেন আন্দোলনে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ সহ অন্যেরা 'বাংলার মটি বাংলার জল' গানটি গেয়ে শোভাযাত্রা বের করেন। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'— রজনীকান্তের আবেদনে সাড়া দিলেন মেয়েরা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠানটি এক্ষেত্রে স্বদেশি জিনিস যোগানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় ছিল। তবে কেবলমাত্র স্বদেশি গ্রহণ ও বিদেশি বর্জনের মধ্যেই নয়, আন্দোলনে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে লেখনীর মধ্যেও নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করলেন তাঁরা।

তাঁদেরই একজন প্রতিনিধি আশালতা সেন, যাঁর রাজনৈতিক তথা সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষ ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে দশ বছর বয়সে। উত্তরাধিকারসূত্রে মা মনোদা দেবীর কাছ থেকে যথোচিত শিক্ষা এবং নবশশীদেবীর কাছ থেকে স্বদেশি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা

পেয়েছিলেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বর্ষে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধাচরণ করে লেখা একটি কবিতা আশালতার স্পর্শকাতর মনোভাবটি চিনিয়ে দেয় আমাদের। 'আমি বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে একটা কড়া কবিতা লিখে ফেললাম, সেটা 'সুহৃদ' কাগজে ছাপা হবার পর 'অমৃতবাজার পত্রিকা, আর 'বেঙ্গলি' কাগজে তার প্রশংসা বের হলো'। অঙ্কুরেই তাঁর মধ্যে ছিল জাতীয়তাবাদী স্বাদেশিক চেতনার বীজ যা অচিরেই মহিরুহের আকার লাভ করে।

১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাজন কার্যকরী রূপ নেয়। আশালতা সেনের মাতামহী নবশশীদেবী, সুশীলা সেন, কমলেকামিনী গুপ্তা প্রভৃতি মহিলাগণ 'মহিলা সমিতি' গঠন করে স্বাদেশিক ভাবনা প্রচারে উদ্যোগী হন। আশালতার কথায়— 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন দেশের লোকের মনে একটা বৈপ্লবিক ভাবধারা এনে দিয়েছিল। তাই পর্দানশিন প্রাচীনাদেরও বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়। এক্ষেত্রে আশালতার দিদিমা নবশশী দেবীরও ভূমিকা ছিল। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনাতেই আশালতার উপর বিলিতি বর্জনের সঙ্কল্পপত্রে পাড়ার বৌ-ঝি সহ সব মহিলাদের স্বাক্ষর সংগ্রহের ভার পড়ে। দেশের কর্মে আশালতার এই প্রথম হাতেখড়ি। তাঁর কথায়— 'স্বদেশী আন্দোলনে এই আমার প্রথম দীক্ষা বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক কর্মপ্রচেষ্টা' ; দায়িত্ব পালনই তাঁর মধ্যে স্বাদেশিক উন্মাদনার বীজ ছড়িয়ে দেয়, যা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত হয়। আশালতার নিজের কথাতেই তা স্পষ্ট—

> "আমার শৈশবের সবচেয়ে স্পষ্ট স্মৃতি হচ্ছে ইংরেজি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ...১৮৫৭-র তথাকথিত 'সিপাহী যুদ্ধে'র অর্ধ-শতাব্দী পরে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনই সবচেয়ে বড় ইংরেজ বিরোধী দেশব্যাপী বিপ্লব প্রচেষ্টা। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দেশে যত স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন হয়েছে তা মোটামুটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তারই অনুসরণ করে।"

এরই ফলস্বরূপ রাজনৈতিক কর্মধারায় তাঁর সরব উপস্থিতি, সক্রিয় অংশগ্রহণ।

আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি

একদিকে আশালতা সেন প্রগতিশীল পরিবারের কন্যা এবং বধূ, নব্যভাবধারায় অনুপ্রাণিত স্বামীর স্ত্রী এবং সন্তানের জননী, অন্যদিকে রাজনৈতিক ভাবাদর্শে প্রাণিত, পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত, নিরাশ্রয়াদের দুঃখে একাত্ম সেবাপরায়ণা এক মহীয়সী নারী, নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মসম্পাদন এবং 'নিষ্কাম ত্যাগ' যাঁর একমাত্র আদর্শ। নিজেকে যিনি গৃহকোণে আবদ্ধ না-রেখে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন বাইরের পৃথিবীতে, অগণিত নারীসমাজের মধ্যে, পরাধীন দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নিবেদন অংশে রয়েছে এই ভাবনার প্রকাশ—

> 'মানুষ আমরণ কেবলমাত্র নিজ পারিবারিক গণ্ডীর ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবার জন্য পৃথিবীতে আসে নাই। নিজ নিজ সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, এমন কি সমস্ত মানবজাতির প্রতি, প্রত্যেক নর-নারীরই গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে। যাঁহার যে উপায়ে, যেভাবে ও যে পরিমাণে সেই কর্তব্য পালন করার সুযোগ ও ক্ষমতা আছে, সেই অনুসারে তাহা করিতে অগ্রসর হওয়া সকলেরই উচিত।'[৩]

এই মনোভাব নিয়েই 'সর্ব্ব-রিক্তা তপস্বিনী নারী'র 'শান্ত মৌন আত্মদানে ক্লান্তিহীন নিঃস্বার্থ সেবায়' আত্মনিয়োগ, সমাজসেবা ও রাজনীতির প্রাঙ্গণে অনুপ্রবেশ। যে-মহিলা প্রথমজীবনে যথেষ্ট রক্ষণশীল সংস্কারপন্থী ছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার কঠোর জীবনযাপনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, এমনকী একমাত্র শিশুপুত্রের আমিষ আহারে ও পরিচ্ছদ পরিবর্তনে যাঁর নিষ্ঠার অভাব ঘটেনি, তাঁরই জীবনাচরণ ও মনোভাবে ঘটে গেল বিরাট এক সংস্কারমুক্ত বৈপ্লবিক উত্তরণ ; ঘরের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জেলের খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত করে তোলা এমনকী শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে মুসলমান বাড়ির আতিথ্য গ্রহণেও কুণ্ঠিত হলেন না তিনি।

মূলত আমাদের দেশের নারী অন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ব্যাপ্তি লাভ করে। ইংরেজবিরোধী আন্দোলনই নারীকে অন্ধকার দিগন্ত থেকে আলোর দিগন্তে পাখা মেলতে উদ্যোগী করে তোলে। কাজেই নারীর দেশের আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং নিজের জন্য আন্দোলনের সূচনা একই সময়ে। আশালতার সংগ্রামও দুটো ক্ষেত্রেই। সমিতি গঠন এবং কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে একদিকে নারীমুক্তি অন্যদিকে স্বদেশমুক্তি আন্দোলনে অনালোকিত পশ্চাদপদ নারীদের শরিক করে তোলা— এই ছিল তাঁর কর্মপরিকল্পনা। ঢাকায় 'শিল্পাশ্রম' নামে তাঁতবোনার কেন্দ্র স্থাপন করে একদিকে গান্ধিজির বাণী ও খদ্দরের প্রচার এবং অন্যদিকে চরকাকাটা, তাঁতবোনার মধ্য দিয়ে নারীকে স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী করে তোলাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। পাশাপাশি একই মনোভাব নিয়ে 'ভাবী গান্ধিপন্থী আন্দোলনের জন্য' মহিলা কর্মী গঠনের প্রয়োজনীয়তায় 'কল্যাণ কুটির আশ্রম' স্থাপন করে মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে প্রয়াসী হন তিনি। 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' গঠনের পেছনেও যৌথ উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল। আত্মজীবনীতে তিনি নিজেই বলেছেন— 'আমি সুশীলা সেন, গিরিবালা দেবী, সরমা গুপ্তা ও সরযূ গুপ্তার সহায়তায় 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' স্থাপন করি। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় মেয়েদের ভিতর সক্রিয় দেশপ্রেম ও গান্ধীজীর বাণী এবং কর্মপন্থা প্রচার করা'। এমনকী সমিতির পক্ষ থেকে শিল্পমেলারও আয়োজন করা হত সে-সময়ে। ১৯৩২ সালে সমিতি অবৈধ ঘোষিত হয়। সে-সময় গ্রেফতার এড়িয়ে গুপ্তভাবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন তিনি। 'আমি গোপনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে আন্দোলনের কর্মীদের সংগ্রহ এবং সংগঠন করতে লাগলাম'— বলেছেন আশালতা। ১৯৩৩ সালে গেণ্ডারিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। পুনরায় সমিতি গঠনে অনেকের আপত্তি তাঁকে নিরুদ্যম করতে পারেনি। তারই পরিণতি ১৯৫০ সালের ১৫ জুলাই গেণ্ডারিয়ার ৭ নং দীননাথ সেন রোডে নিজের বাসস্থানে সমিতি গঠন। পরবর্তীকালে সমিতি ১৮ দীননাথ সেন রোড, ঢাকাতে স্থানান্তরিত হয়, হিন্দু প্রধান সমিতি ধীরে ধীরে মুসলমান মেয়েদের শক্তিশালী সংঘ হয়ে ওঠে। যে-সমিতি আজও নারীদের সার্বিক উন্নতিকল্পে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, নমঃশূদ্রপ্রধান গ্রাম জুড়ানে সরমা গুপ্তার সহযোগিতায় 'জুড়ান' নামে হরিজন বিদ্যালয় স্থাপন করেন তিনি। এ সময়ে ম্যাজিক ল্যান্টার্ন নিয়ে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল 'জনসাধারণকে একদিকে স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটির শিল্প ইত্যাদির' উন্নতির জন্য শিক্ষা 'অন্যদিকে তাদের সমাজসংস্কার এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করা'। পাশাপাশি ঢাকাতে নিজস্ব বাড়িতে রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য

স্থাপন করেন 'নারী কর্মী শিক্ষাকেন্দ্র'। এই শিক্ষা সম্পর্কে আশালতা আত্মজীবনীতে লিখেছেন— 'এই শিক্ষা অনেক মহিলা কর্মীকে স্বাধীনতার আন্দোলনের কাজ অনেক বেশি উদ্যম এবং দক্ষতার সঙ্গে করতে সাহায্য করে'। উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন 'ভবিষ্যতে স্বাধীনতার জন্য যে গণ আন্দোলন গান্ধীজী শুরু করবেন তার জন্য জমি প্রস্তুত করা'।

শিক্ষাদীক্ষাহীন অবরুদ্ধজীবনে অভ্যস্ত নাবী সমাজসংস্কারকদের প্রচেষ্টা ও সংস্কার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রাণ ফিবে পেল, জীবন লাভ করল। পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি ইচ্ছে, প্রয়োজন বা নিজের উপযুক্ত করে তোলার বাসনাতেই নাবীকে শিক্ষিত করাব ক্ষেত্রে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু সবকিছুর উপরে ছিল আদর্শ গৃহিণীর মর্যাদা অর্জন। যেখানে নারীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল গৃহাভ্যন্তরের সাংসাবিক কর্ম, বা নির্দিষ্ট জীবনাচরণ, সেখানে নারীর চারদেওয়ালের বাইরে সংগ্রামে অংশগ্রহণ ভিন্নতর এক বিপ্লব। গান্ধিজিই প্রথম অহিংসা আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, পর্দানশিন-আলোকপ্রাপ্ত নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিয়ে এলেন।

গান্ধিজি মনে করতেন—

> "Woman is sacrifice personified when she does a thing in the right spirit, she moves mountains".[8]

তাঁর ধারণা ছিল অহিংস আন্দোলন নারীর নেতৃত্বেই সার্থক হয়ে উঠবে— 'অহিংসা যদি আমাদের মূলনীতি হয় তবে দেশেব ভবিষ্যৎ নারীর হাতে'।[৫]

আবার বলেছেন—

> "To call women 'abala' is to condemn the inherent strength of women; in my view it's an insult to them...if women resolve to bring glory to the nation, within no time they can totally change the face of the country...come to your own and deliver your message."[৬]

গান্ধিজির এ ভাবনার বাস্তবচিত্রণ রয়েছে আশালতার লেখায়—

> "সত্যাগ্রহী সেবিকাদলের অধিকাংশ মহিলাকর্মীই সেকেলে নিরীহ পরিবারের লোক। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁদের খুবই কম ছিল। তবু যখন গান্ধীজীর ডাক এলো তখন এইসব 'অবলা'রা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ভয় পেলেন না।"

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনই অন্যদের সাথে তাঁকেও সংসার-সন্তান-শ্বশুরের বৃত্তে আবদ্ধ জীবনের বাইরে পৃথিবীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে বহুজনহিতার্থে বেরিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করে। ক্রমশঃ তাঁরা আজন্মলালিত সংস্কারকে ত্যাগ করেছেন, এর পেছনে ছিল শিক্ষা, অবরোধমুক্তি। অন্দরমহলের বাইরে বহির্মহলে স্বতন্ত্র পরিসরের সন্ধানে সচেষ্ট হলেন তাঁরা। শাশুড়ির কবিতা লেখা বন্ধ করার আদেশে বীণা দে সিদ্ধান্ত নেন 'শাশুড়ি বেরিয়ে যাওয়ার চেয়ে বৌ বেরিয়ে যাওয়াই ভালো'[৭]। কারণ শাশুড়ির ঘোষণা ছিল কবিতা-লেখা-

বৌয়ের সঙ্গে একত্রে বসবাস সম্ভব নয়। নিরুপমা দেবীও মনে করেন জীবনেব সঙ্কটে কবিতাই ছিল তাঁব শান্তির প্রলেপ। আশালতার জীবনেও কর্মের চাপ, দায়িত্ব কর্তব্যের ভার কবিতা রচনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে গঠনমূলক কর্মসূচির পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন। তবে ১৯২৫ সালে বিহার কংগ্রেসেব সভায় গান্ধিজির সঙ্গে পরিচয় এবং আলাপ-আলোচনা আশালতার রাজনৈতিক জীবনের সমীকরণে এক নতুন প্রাপ্তি। 'অনেক প্রশ্নের উত্তর পেলাম আর আমার জীবন ও কর্মপন্থাও নতুন মোড় নিল' — বলেছেন আশালতা। তাঁর গঠিত 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দলে'র অনেকেই আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বেআইনি লবণ কিনে স্বেচ্ছাকৃত গ্রেফতার বরণ করেন অনেকে। কারারুদ্ধ মেয়েদের অবস্থান এবং মনোভাব জানাতে গিয়ে আশালতা বলেছেন—

> "মেয়েদেব ভেতর প্রথম গ্রেফতার হলেন সরযূ গুপ্তা, কামিনী বসু, প্রতিভা সেন এবং সুনীতি বসু। তারা সবাই রক্ষণশীল পরিবারেব মহিলা। প্রথম তিনজন আবার গোঁড়া হিন্দু বিধবা। হিন্দু বিধবার নিবামিষ খাবার নিজেরা রান্না করে নেবার অধিকার যতদিন জেল কর্তৃপক্ষ না দিলেন ততদিন তাঁবা অনশনে রইলেন।"

সরলাবালা সরকারের স্মৃতিকথায় কারাবরণকাবী প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহী ইন্দুমতীর নাম পাওয়া যায়। সরলাবালা বলেছেন—

> "আমার যতদূব স্মরণ হয, সর্বপ্রথম জেলে যান পদ্মবাজ জৈনের কন্যা ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা। .. অভিযুক্ত আসামীটি বালিকামাত্র, আর এই বালিকাই প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকাবিণী।"[৮]

ঢাকায় সরমা গুপ্ত ও আশালতা সেন, বাঁকুড়ার সুরমা ও সুষমা পালিত, কুমিল্লার হেমপ্রভা মজুমদারের নেতৃত্বে মেয়েবা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারারুদ্ধ হন। এই আন্দোলনের ফলে নারীর অন্ধকার গৃহকোণ থেকে আলোর পৃথিবীতে উত্তরণ ঘটে। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধেও তাঁরা সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠেন। এতদিন সংগ্রাম পরিচালনা, সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়া, আন্দোলনকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মে অংশগ্রহণে তাঁর পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু মহিলা সত্যাগ্রহীদের গ্রেফতার কবে জনমানবহীন নদীর চরে নিয়ে ছেড়ে আসার নৃশংস মনোভাবই তাঁকে প্রলুব্ধ করে সংগ্রামে সরাসরি অবতীর্ণ হতে। বলেছেন— 'আমার মনে হলো যে এবার আমাকেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হবে'। ১৯৩২-এর ৬ মার্চ নবাবগঞ্জে সত্যাগ্রহের নেতৃত্বের জন্য ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যান্য কাজের জন্য আরো ১৫ মাস জেল হয় তাঁর। প্রথমে ঢাকা, পরে বরিশাল ও বহরমপুর জেলে রাখা হয় তাঁকে। অন্যান্য রাজনৈতিক কয়েদিদের মধ্যে রক্ষণশীল পর্দানশিন ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবা যেমন ছিলেন, তেমনি 'দুগ্ধপোষ্য শিশু সহ মা'-ও ছিলেন, ছিলেন লেখাপড়া না-জানা কৃষক ঘরের মহিলাও। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আশালতা বলেছেন—

> 'এতদিনের সংস্কারকে এত সহজে পরিত্যাগ করার মধ্যে একটা মস্ত বড় বিপ্লবেরই জয়ধ্বজা কি দেখা যায় না'?[৯]

আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য পল্লিগ্রামের মহিলা এবং বিক্রমপুবের মহিলাকর্মীদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। অবরোধবাসিনী নারীর বিপ্লবে অকুণ্ঠিত যোগদান শুধুমাত্র আবেগসর্বস্ব বা সাময়িক উচ্ছ্বাসেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মূলত এ আকাঙ্ক্ষার পেছনে ছিল সত্তাব যুগ যুগ বাহিত পরাধীনতাব শৃঙ্খলমুক্ত হবাব এক উন্মাদনা, এক পণভাঙা উদ্যোগ। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণেব নিষেধাজ্ঞায় অভ্যস্ত মনের দেশের কর্মে অংশগ্রহণ, মাতৃভূমির আহ্বানে সাড়া দেবাব উদ্যোগ, মনের কোণে সযত্নে লালিত নীরব বিপ্লবের সরব বহিঃপ্রকাশ।

আশালতাব বীবত্ব শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী কর্ম আর কথনেই শেষ হয়ে যায়নি। স্বাধীনতা লাভেব পরও তিনি নিজের কর্মস্থল ত্যাগ কবেননি, অফুবন্ত কর্মপ্রেরণাই তাঁকে গঠনমূলক কাজকর্মে ব্যাপৃত রেখেছে বৃদ্ধ বয়সেও। এজন্যেই ৭৭ বছর বয়সেও বৃদ্ধা আশালতার প্রতিবাদী সত্তা অম্লান। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাড়ির সামনে প্রতিবাদ জানাতে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তী। যশোধরা বাগচী আক্ষেপের সুরে বলেছেন—

> "নিজের শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অবস্থানের মধ্যেও যাঁর চেষ্টা ছিল পূর্ববাংলার খেটে-খাওয়া মুসলিম মেয়েদেব সামাজিক পুনর্গঠনেব কাজে। রোকেয়ার মতো আশালতাও আজ় পূর্ববাংলার নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য হন। আমবা কি আজও বোকেয়া আশালতাব মতো বীবাঙ্গনাদের ভুলে থাকব?"[১০]

মূলত নীরবতার সংস্কৃতির পাশাপাশি মনে রাখার সদিচ্ছাব অভাববোধই এর জন্যে বহুলাংশে দায়ী। দায়বদ্ধতার কথা মনে বেখেই আমাদের উচিত পূর্বসূরিদের অব্যক্ত কণ্ঠ, আমাদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হওয়া।

আশালতা উদার মনোভাবাপন্ন পিতৃকুল ও মাতৃকুলের কাছ থেকে আর বিবাহ-পরবর্তীকালে শ্বশুরের কাছ থেকেও পেয়েছিলেন সহানুভূতি। পূর্বাপর নারীদের মতো ব্যক্তি বা সংসারের অনুশাসন তাঁর জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। আচরিত কর্মে পরিবারের ভূমিকা ছিল সদর্থক, তাই কর্মযজ্ঞের বিরাট পরিধিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পেরেছেন সহজে স্বচ্ছন্দে। অন্যদের মতো তিনি নিপীড়িত নারী-সমাজের প্রতিভূ নন, বঞ্চিত অপরসত্তার আলোকবর্তিকা। সত্তাকে তাঁর নির্মাণ করতে হয়নি। পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সত্তাকে প্রেরণাদাত্রীর ভূমিকায় রেখে সমাজের অপরাপর নারীসত্তার বিনির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। রাজনৈতিক কর্মজীবনের এই ব্যস্ততা তাঁর কবিসত্তাকে বিনষ্ট করতে পারেনি। তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে অছে অন্তরের দুঃখযন্ত্রণা, অন্যদিকে আনন্দানুভূতি। জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়েও তাঁর কাব্যচর্চা ছিল অব্যাহত। কর্মের মধ্যে ব্যাপৃত রাখার ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাই সাহিত্য ও রাজনীতির স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রেরণায় ব্যাপৃত রেখেছেন নিজেকে। 'জন সমারোহ হতে আনি তারে একান্ত বিরলে/পলে পলে/ তারে যে গড়িলে তুমি আপনার মনোমত করি'[১১]— জায়া-জননীর আবরণমুক্ত নবজীবন লব্ধ আশালতার আবির্ভাব সংসার মঞ্চের সীমায়িত পরিধির বাইরে বৃহত্তর পরিধির ব্যাপ্ত পরিসরে। ক্ষুদ্র গৃহকোণে নিজেকে আবদ্ধ না-রেখে ছড়িয়ে দিয়েছেন বাইরের পৃথিবীতে, যেখানে খুঁজে পেয়েছেন তিনি নিজেকে, অবগুণ্ঠনের আড়ালে ঢেকে থাকা নিজের অস্তিত্বকে। এই অনুপ্রেরণা লাভ হৃদয়ের মণিকোঠায় চেতন-অবচেতনের

আলাপচারিতায। 'ঘরে ঘবে সকলের তবে শান্ত, মৌন আত্মদানে, ক্লান্তিহীন নিঃস্বার্থ সেবায়'[১২] তাঁর আত্মনিয়োগ, তাঁর আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদনেব পথেই অবরুদ্ধ সত্তার আত্মমুক্তি। নিপীড়িত লাঞ্ছিত নারীসমাজেব উদ্দেশ্যে বৈধব্যক্লিষ্ট অগণিত নারীর প্রতিনিধি আশালতার বার্তা—

"আপনাবে নারী পূজা কর আজ পূজা কর আপনায
আপনাব মাঝে লও জাগাইয়া, আপনার দেবতায়"[১৩]

আর এখানেই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত প্রান্তরে, চিহ্নাযক পবিচয় থেকে উজ্বল ব্যক্তিত্বে, দহনের দুর্বলতা থেকে সবলের পবিপূর্ণতায উত্তরণ আশালতার।

সপ্তম অধ্যায়

হৃদয় আমার প্রকাশ হল

অনুরূপা বিশ্বাসের 'নানা রঙের দিন'

(জন্ম-১৯৩২)

> "শুধু কপালের চামড়া সরিয়ে দেখাতে চাই আর একটি সবুজ রঙের শ্লেটে সোনার জলের ছবি, কত যত্নে মা লিখেছে বড় হও, মা লিখেছে গাছের ছায়ার মতো সত্যি হও। জানাতে চাই, কতবার মাথা নুইয়ে তবে মহাশূন্যের সমস্ত ভর সহ্য করেছি একা।"
>
> — অঞ্জলি দাশ

কবি সাহিত্যিক নারীমুক্তিবাদী অনুরূপার 'নানা রঙের দিন' পেছন পানে তাকিয়ে দেখা এবং স্বগতোক্তির এক যুগলমিলন।

আইনস্টাইন তাঁর Self-Portrait গ্রন্থে বলেছেন—

> "Of what is significant is one's own existence one is hardly aware, and it certainly should not bother others, what does a fish know about the water in which he swims all his life."[১]

'নানা রঙের দিনে'র লেখিকার বোধশক্তি, মানবিক উৎকর্ষ এবং আকর্ষণীয় উপস্থাপন ভঙ্গিই তাঁর রচনাকে করে তুলেছে অসাধারণ, পাশাপাশি বহুমাত্রিক পরিচয়ের মধ্যে যথার্থ আত্মজীবনীকারের পালক সংযোজনে উন্মোচিত হয়ে উঠেছে নবনির্মিত নবপরিচিত ব্যক্তিসত্তার এক নতুন অবয়ব। বাস্তবিক অর্থেই 'নানা রঙের দিন' এক অভিনব সৃষ্টি। জীবনের ফেলে আসা রঙিন দিনগুলোর দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে পরিণত বয়সের আলোয় তাকেই নতুনভাবে নতুন আনন্দে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টার রূপায়ণ 'নানা রঙের দিন'।

লেখিকার বাসভূমি শিলচর। আমি নিজেও শিলচরেরই মেয়ে। এরকম একজন স্বনির্মিত সত্তার আত্মপ্রকাশকে সাড়ম্বরে ঘোষণার দায় আমাদেরই। প্রান্তিক পরিধির ছোট্ট কোণ থেকে 'নানা রঙের দিনে'র মতো সফল আত্মজীবনী আলোচনা করার সময় ও সুযোগ লাভ আমার গর্বের বিষয়। লেখিকা আমারই শুধু নন, আসামের মফস্সল শহর শিলচরের অহঙ্কার। এ অহঙ্কারকে না-লুকিয়ে আলোকোজ্জ্বল পরিসরে পরিচয় করিয়ে দেওয়া আমাদের সবার আন্তরিক কর্তব্য।

জীবনের কথা লিখতে গিয়ে ১ম, ২য়, ৩য় বিশ্ব বহির্ভূত প্রান্তীয় অঞ্চল শিলচর তথা

কাছাড়ের অনেক কথাই বলেছেন তিনি। কাছাড়ের সামাজিক রাজনৈতিক জনজীবনের তথ্যসমৃদ্ধ অজানা, অধুনালুপ্ত অধ্যায়গুলো পর্যায়ক্রমে উঠে এসেছে তাঁব লেখায়। এ যেন সচল সবাক ছবির পঙ্‌ক্তি মিছিল। দৃশ্যপট পরিবর্তনে কখনো ব্যক্তিকে, কখনো তাঁর পরিসবকে, কখনো বা তাঁর জীবনকে জানার আগ্রহে অন্তরাত্মা উন্মুখ। তাই প্রথম পর্বেব শেষে অন্তবে অতৃপ্তি থেকে যায়, সমাপ্তিসূচক ইঙ্গিত থাকলেও মনের মধ্যে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'— এই আক্ষেপ থেকে যায়, সেইসঙ্গে পরবর্তী পর্ব প্রকাশের অপেক্ষায়, জানার আগ্রহে মন হয়ে ওঠে উদগ্রীব।

অনুরূপার আত্মকথাব খণ্ডিত পূর্বলেখ 'আপনকথা', লেখার সময় ১৯৫৪ সাল। যদিও পরবর্তী সময়ে আপনকথা নিয়ে তিনি বেশিদূর এগোননি। কিন্তু অংশের গুরুত্বের কথা ভেবেই সযত্নে সংবক্ষণ কবেছিলেন। তাই সমসাময়িক প্রতিক্রিয়া হিসেবে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির ওই অংশটুকু আমি পেয়েছি। বলাই বাহুল্য, আজ থেকে ৫০ বছর আগেই অনুরূপার আত্মকথাব প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল, যেখানে তিনি সত্তার চেতনাকে, তাঁর অনুভব উপলব্ধিকে মুক্তি দিয়েছেন। ২২ বছর বয়সে আবেগ মথিত সৃষ্টিশীল সত্তার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে এই 'আপনকথা'য়। এদিক দিযে তা যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। বলা যায়, 'নানা রঙের দিনে'র অপ্রকাশিত ক্ষুদ্রতম সংস্কবণ 'আপনকথা', আর এখানে উপলব্ধির প্রকাশ যুবতী অনুরূপার লিখনে যৌবনকালে। কাজেই সেখানে সত্তার উন্মোচনে যে উদ্দামতা, উজ্জ্বলতা; পরিণত বয়সের বাচনে সে বেগ কিছুটা লঘু, সেখানে আবেগ বা বিবেক তাড়িত সত্তার বাইবে এক নিরপেক্ষ পরিপূর্ণ আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। যুবতী সত্তার অনুভব উপলব্ধির মধ্য দিয়েই আজকেব ব্যক্তিসত্তা প্রৌঢ় অনুরূপার উত্তবণ। 'আপন কথা'র শেষাংশে রয়েছে তারই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত—

> "নারীজীবনের দৈনন্দিন পরিক্রমায় আজও আছে সমাজের হাজার নিয়মনীতির অদৃশ্য শাসন— মুক্তির স্বপ্নে বিভোর আমার সত্তা এখনও সে বন্ধনকে এড়াতে পারেনি— তবু বন্ধনের মধ্যে মুক্তি আদায়, আপন সৃষ্টির মধ্যে বৃহত্তর সৃষ্টির স্পন্দন জাগিয়ে তোলা। সজাগ দায়িত্বে এ রক্তঝরা রূপান্তরের ব্যথা-বেদনার ইতিকথায় আমার জীবন জড়িয়ে নিয়ে পথ চলা তাই হবে আমার ভাবীদিনের আপন কথাও।" (আপন কথা)

'নানা রঙের দিন'-এ 'আমার কথা' অংশে লেখিকা বলেছেন 'আত্মজীবনী তো কতই লেখা হয়, এটা সেই অর্থে তা নয়— জীবনস্মৃতি'। কিন্তু ব্যাপক অর্থে আত্মজীবনী তো জীবনস্মৃতিরই নামান্তর। যদিও সংজ্ঞার্থে বা আভিধানিক অর্থে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে, কিন্তু সাদৃশ্যও রয়েছে অনেক। লেখিকা প্রথমে ডায়েরি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, পরবর্তীতে তিনি তা স্মৃতিকথায় পরিবর্তিত করেছেন। আত্মজীবনী, ডায়েরি বা স্মৃতিকথা সবই তো নিজের কথা বলার নানারকম ভঙ্গি। কখনো খণ্ড চিত্রের মধ্যে নিজের কথা বলা, কখনো পরিপার্শ্বের মধ্যে নিজেকে খুঁজে নেওয়া, কখনো বা অবচেতনের এলোমেলো ছবির পাশাপাশি নিজেকে তুলে ধরা।

আত্মজীবনীর মূল কথা হলো জীবন-ব্যাখ্যা, ফুল যেমন তার ফুটে ওঠা, মৌমাছি-বাতাস-জল থেকে তার স্নিগ্ধতা গ্রহণ এবং সর্বোপরি তার গন্ধ বিতরণের বার্তা পৌছানোর মধ্য দিয়ে

মূলত তার হয়ে ওঠার কথাকেই জানাতে চায় ঠিক সেভাবে আত্মজীবনীকারও তাঁর একান্ত নিজস্ব অনুভূতি, ভাবনা, বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহাবের সঙ্গে অন্তর্লোকের যোগসূত্র স্থাপনের না-বলা না-জানা কথার মালা গাঁথতে চান আত্মজীবনীতে। বিশ্লেষণী চিন্তা এবং উপলব্ধিকৃত ধারণা— উভয়ক্ষেত্রেই বোধেব গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও বোধ-চেতনা-উপলব্ধি সবার সমান নয়, ব্যক্তিবিশেষ অনুযায়ী তার রকমফের হতে পারে এবং তাই স্বাভাবিক। আত্মঘোষণা থাকবে কিন্তু তা যেন আত্মপ্রচারে পর্যবসিত না-হয়। নিজেকে অন্তরালে রাখা শিল্পীর কাজ, আর আত্মজীবনীকারের কাজ নিজেকে খুলে মেলে ধরা, তাই বলে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে নয়। এখানেই অনুরূপার বিশেষত্ব। অনুভূতির আলোকে পরিণত বুদ্ধি ও লেখনীবৃত্তির স্পর্শ তাঁর ছিল যা তাঁর আত্মজীবনীকে করে তুলেছে মহৎ সাহিত্যের মর্যাদাভুক্ত। সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহেব সঙ্গে নিজেব জীবনের নিগূঢ় যোগ এবং তদজনিত অন্তর্চেতনার একটা পরিণতির ইঙ্গিতবাহী এই প্রতিবেদন। আর অনুভাবকের কাছে এই প্রকাশলব্ধ অনুপ্রেরণা গতানুগতিকতার সীমা ছাড়িয়ে এক বিশেষ প্রাপ্তি। অমর চিত্রকর লিওনার্দো দাভিঞ্চির মহৎ সৃষ্টি মোনালিসার হাসি ক'জন লোকের বোধের স্তরে পৌছতে সক্ষম? অধিকাংশই এ ক্ষমতার অধিকারী নন। ব্যক্তিত্বের পরিচিতি প্রতিষ্ঠা যতই থাকুক না কেন, আপন কথা অন্যদের মনে কৌতূহল জাগাতে সক্ষম হলেই তা সার্থকতার মাত্রা পেতে পাবে না। পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে আপনকথাকে ব্যপ্তি দিতে সমর্থ হলেই তা সার্থক, এদিক দিয়ে 'নানা রঙের দিন' হয়ে উঠেছে আকর্যণীয়, চিত্তাকর্ষক। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর মধ্যে লুক্কায়িত থেকে যায় তৎকালীন সমাজের মর্মকথাটি। তাই আত্মজীবনীর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সেদিক দিয়ে লেখিকা প্রখর বোধবুদ্ধিসম্পন্না। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা তিনি, সাহিত্যের ভূমিতে অবাধ গতিবিধি তাঁর, সেই সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার নিয়ন্ত্রিত পরিসরও তাঁর জ্ঞাত। সত্তার অভিজ্ঞতালব্ধ 'নানা রঙের দিন' যেখানে নিজের জীবন, নিজের কথার সমমাত্রায় রয়েছে সমসাময়িক ইতিহাস, ঘটনার ছবি ও রাজনৈতিক আদর্শের কথা ; রাজনীতির পটপরিবর্তন, জীবনের দিকবদল, প্রান্তিক অঞ্চলের ইতিহাসে নারীর অবস্থান, সর্বোপরি তথ্য বর্ণনায় মাত্রাবোধ এবং আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্য মেনে চলার শর্তবোধ তাঁকে করে তুলেছে একজন যথার্থ আত্মজীবনীকার, তাই তাঁর আবেদনও গভীর। আর এ কারণেই বোধ হয় পাঠকের প্রত্যাশাপূরণেও কিছুটা অক্ষম। কারণ লেখিকার জন্ম থেকে রাজনৈতিক জীবন এবং অজ্ঞাতবাস অর্থাৎ, ১৯৩২ থেকে ১৯৫০ আত্মজীবনীর ব্যাপ্তিকাল। বিবাহ-পরবর্তী যৌথ সংসারে অনুপ্রবেশ, তাঁর কর্মজীবন, সাহিত্যিক জীবন অর্থাৎ ১৯৫০-পরবর্তী জীবনের কথা দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য নির্বাচিত এবং তা প্রকাশের আলোর অপেক্ষায়। যেহেতু অনুষ্টুপ শীত-গ্রীষ্ম সংখ্যায় ১৪১১ সালে পূর্বাংশ প্রকাশিত, তাই পাঠকবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহকে মর্যাদা দিতেই পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশের পূর্বেই খণ্ডাকারে 'নানা রঙের দিন' শিরোনামে শিশু-বালিকা-কিশোরী-যুবতী অনুরূপার আত্মপ্রকাশ।

সে আমার উৎসমুখ

মা, মাটি, মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। আত্মজীবনীর অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে মায়ের কথা, 'এ মাটির কন্যা'র গর্বিত উচ্চারণের অহমিকায় আত্মজীবনীর শুরু।

আর মানুযেব প্রতি ভালোবাসাব টানেই সর্বহাবাজনেরা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে সর্বোত্তম মানুষ।

আত্মকথায় মা, বাবা, ভাই-বোন, স্বামীসহ আত্মীয় পরিজনদের কথা যেমন আছে সেইসঙ্গে আছে নিজের শৈশব থেকে যৌবনকালের কথা, আছে কমুনিস্ট ভাবধারা সিঞ্চিত আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনের কথা। মানুষকে মাধ্যম কবে সময় এবং পবিসরই তাঁর বয়ানের ভিত্তিভূমি। তিনি নিজেই বলেছেন—

> "অসংকোচে সব বলার জন্য কলম ধবেছি এই ভেবে যে এসব আমার শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বৃত্তান্ত নয়, এর সমসূত্রে গেঁথে রয়েছে দেশকালের কথা। পাত্রপাত্রীরা এখানে আধার মাত্র। ইতিহাস এঁদের ও এঁদের মতো অগণিত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কেবলই যে পথ কেটে চলেছে।"

আত্মজীবনীর শর্ত পরিপূরক এই কয়েকটি পঙ্ক্তির মধ্যেই উচ্চকিত লেখিকাব বক্তব্যের নির্যাস। এ নির্যাস নিঙড়ে আমরা বর্ণবহুল সময়, সময়কেন্দ্রিক বিবরণ এবং বিবরণলব্ধ জনজীবনকে সর্বোপরি ১ম, ২য়, ও ৩য় বিশ্বের মানচিত্র বহির্ভূত প্রান্তীয় অঞ্চল কাছাড়কে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার সচেষ্ট অনুভবকে জানতে চেষ্টা করব।

ব্রিটিশ অধিগ্রহণের পূর্বে শিলচরের নাম ছিল শিলাচল। ব্রিটিশ শাসকেরাই শিলাচলের নাম করেন শিলচর। আসামের দক্ষিণতম সমতল ভূভাগ বরাক উপত্যকার প্রধান শহর শিলচর ছিল কাছাড় জেলার সদর। কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ ১৮৩০ খ্রিঃ নিহত হবার পর ১৮৩২ খ্রিঃ ১৪ আগস্ট এই জেলা ব্রিটিশদের অধিকারে আসে। ১৮৫৫ খ্রিঃ চা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বাণিজ্যিক গুরুত্ব প্রসার লাভ করে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৮৬৩ সালে প্রাইজ সাহেব শিলচর বালক বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। তার ঠিক ৩২ বছর পর ১৮৯৫ খ্রিঃ মেয়েদের জন্য সরকারি বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন মিস উইলিয়ম্‌স্। সে-সময়ে শিলচর শহরের লোকসংখ্যা ছিল বারো হাজারের মতো। দোকানপাট ছিল ছন-বাঁশের তৈরি। মোটরগাড়ি ছিল না। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ছিল আর কাঠ আনা-নেওয়ার জন্য ছিল হাতি। রাস্তার দুই পাশের গাছপালা থেকে জোঁক পড়ত। শহরের ভিতরে ঝোপঝাড়ে অসংখ্য শেয়াল ছিল। এমনকী শেয়াল মারতে পারলে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পুরস্কার প্রাপ্তিরও সুযোগ ছিল। এখানেই মিশনারিরা প্রথম মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করেন— একটি প্রেমতলা, অন্যটি মালুগ্রামে। বর্ষীয়ান মহিলারা যেমন রাস্তাঘাটে বেরুতেন না, তেমনি ৭/৮ বছরের মেয়েদেরও দেখা যেত না। মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসার জন্য 'নিতাই-এর মা' ছিল। জুতোর প্রচলন ছিল না, কাজেই ছাত্রীরা জুতো পরে স্কুলে আসতেন না। শিক্ষাবিস্তারে মিশনারিদের অগ্রণী ভূমিকা অন্দরমহলে বহুচর্চিত ছিল, তাই এ সময়ে তাঁদের কম লাঞ্ছিত হতে হয়নি। তাঁদের সম্বোধন ছিল খাটাসনি, পেতনি। এমনকী তাঁদের স্পর্শদোষ থেকে মুক্ত হবার জন্য গোবরজল ছিটিয়ে দেওয়া হত। সমাজে বিধিনিষেধ ছিল, ছিল অবরোধ। তারই মধ্যে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো অবরোধ ডিঙিয়ে সংস্কারের বেষ্টন অতিক্রম করে প্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মানসিকতাও তৈরি হচ্ছিল। তথাপি সে-সময়ে শিলচরের সমাজ মানসিকতায় নারীশিক্ষা তেমনভাবে গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি। অনুরূপার মা প্রমীলাসুন্দরী

স্কুলে পড়াশোনা করতে পারেননি। কৌলিন্য ও পাণ্ডিত্যের সমন্বয়ী সত্তা সূর্যকুমার তর্কসরস্বতী ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেও মেয়েদের ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল। প্রমীলাসুন্দরী পড়াশোনা করেছিলেন টোলের ছাত্রদের কাছে অন্দরমহলে। শ্রেণিকক্ষের বিদ্যাশিক্ষার অভাববোধই হয়তো তাঁকে পরবর্তী জীবনে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলে। পথ চলার ক্ষেত্রে শিক্ষা ছিল তাঁর কাছে একমাত্র পাথেয়, তাই পুত্রবধূ নির্বাচনের মানদণ্ডও ছিল শিক্ষা। 'করুণা নয়, নয় অনুকম্পা— সবাইকে সসম্মানে আত্মনির্ভর করার দিকেই ছিল মা'র লক্ষ'— বলেছেন অনুরূপা। স্কুলের চৌহদ্দিতে পা না-রেখে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না-হয়েও তাঁর জীবনদর্শন থেকেই জন্ম নেয় তাঁর নারীবাদী চেতনা যা শুধুমাত্র ভারত সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহীই নয়, আপন ব্যক্তিত্বের আভায় সুস্থ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল সমাজ-সংসার গঠনে অনুসরণযোগ্য অনুভব। মেরি উলস্টোনক্রাফ্‌ট্ 'Vindication of the Rights of Women'-এ নারীর পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রক সামাজিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন আর প্রমীলাসুন্দরীও শাস্ত্রকে অস্বীকার করে সমাজের একপেশে দৃষ্টি ও মনোভাবকে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পরিবর্তিত করতে ছিলেন তৎপর। মা-বাবার কথা বলতে গিয়ে গর্বিত অনুরূপার দৃপ্ত উচ্চারণ—

> "এমন প্রতিবাদী চরিত্র তেজস্বিনী মায়ের মেয়ে হয়ে আমার গর্ব আছে, যেমন গর্ব আছে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার এই সুদূরবর্তী পাণ্ডববর্জিত দেশের গোড়ার দিককার পত্তনে আমার বাবাও ছিলেন একজন রূপকার এই কথা ভেবে।"

নিজের হাতে নিজেকে নির্মাণ

অনুরূপার জন্ম ১৯৩২ খ্রিঃ ১৭ই জুন। বরাক উপত্যকার অন্য একটি জেলা সদর হাইলাকান্দির পোস্টঅফিস কোয়ার্টারে। উনিশ শতকে জন্ম যে-মহিলাদের, শৈশব থেকেই তাঁরা নীরবতার সংস্কৃতিতে দীক্ষিত, সংসারের জন্য উৎসর্গীকৃত। স্বতন্ত্র পরিসর তাঁদের কাছে স্বপ্নকল্পনা। বিশ শতকে শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে এবং ছাঁচে-ঢালা পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তনের জন্যে নারীর শৈশব-পরিসর কিছুটা বিস্তার লাভ করে। অনুরূপার আত্মকথায়ও তার ইঙ্গিত রয়েছে। সে-সময় সাধারণ জীবনযাত্রায় ছিল অনাবিল আনন্দ। হীনম্মন্যতাবোধ ছিল না, শহরে বাস করেও গ্রাম্য সরলতা বজায় ছিল। আজকের ভোগবাদী বিলাসবহুল জীবনের পেষণ, প্রতি পদক্ষেপে প্রতিযোগিতার লড়াই সে-সময়ে ছিল না। শিশুমন ছিল স্বচ্ছ জলের মতো অনাবিল। চাহিদা সীমিত তাই প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও অসন্তুষ্টি নেই। পরির দেশে মনে মনে হানা দিয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো পাখা মেলে উড়ে বেড়ানোতেই ছিল একধরনের আত্মতৃপ্তি। তাই জীবনটাও ছিল অন্যরকম। সময়ের চলমানতার সঙ্গে সমাজজীবনের দ্রুত পরিবর্তন সেইসঙ্গে আজকের শিশুদের পরিবর্তিত মনোভাব রেখাপাত করেছে লেখিকার মনের কোঠায়। বাল্যবয়সের কথা বলতে গিয়ে স্মৃতির দরজা সরিয়ে একের পর এক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন তিনি। ছোটবেলার আনন্দের উপকরণের মধ্যে ছিল বহুরূপী, দিনের বেলার ভিক্ষুক বৈষ্ণবী আর রাতের মুসকিল আসান। এ ছাড়া চড়কপূজা, মাঘব্রত, ছাতিঘুরানো, সঙ্গীসাথীদের নিয়ে ফুলগুটি, বন্দি, এক্কাদোক্কা, বাঘবন্দি, তেঁতুলবিচি দিয়ে

খেলাধূলার বিবরণের পাশাপাশি ছিল প্রথম পাঠের আকরণ— অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য ছিল, ছিল আপন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তেপান্তরের মাঠে শিশুমনের হারিয়ে যাবার উপযুক্ত মুক্ত পরিসর। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে শিশুদের এই পৃথক জগৎ একুশ শতকের বিলাসলব্ধ নাগরিক জীবনে বিরলদর্শন। বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতিচারণে দীর্ঘশ্বাসযুক্ত আনন্দানুভূতি আমাদেরও হারানো অতীতে নিয়ে যায়। এই ভালোলাগার অনুভূতি দেহমনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। বলেছেন—

> 'বাল্যকালটা যে বড় মোহময়— এমন মায়া বিস্তার করে থাকে মনে— অনেক জায়গা জুড়ে থাকতে চায়, কিছুতেই তার বেড়াজাল সরে না।'

এই বাল্যকালটাই তো একজন শিশুবালিকার নিজস্ব বিকল্প পরিসর। বিকল্প পরিসরের উল্লেখ সবার লেখায় থাকে না। লীলা মজুমদারের স্মৃতিকথায় বিকল্প পরিসরের উল্লেখ আছে। সে যেন এক মায়াপরিসর, যেখান থেকে স্মৃতির দরজা খুলে আত্মপ্রকাশ করে সত্তার বিকল্প অস্তিত্ব— যাকে আমরা হারাতে চাই না, হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে ঝরাফুল কুড়ানোর মধ্যেই সন্ধান করি আনন্দের, বিহ্বলতার। অনুরূপাও বলেছেন— 'বোধ করি অবচেতন ভাবে আমরাও সরাতেও চাইনা। তাই স্মৃতিচারণে এত আনন্দ'। বিকল্প পরিসর রক্ষায় এই সচেতনতা তাঁকে active universe-এর Being হিসেবে চিহ্নায়িত করে তোলে।

দিন বদলায়, বদলায় রং

শহর শিলচরের শিক্ষা সচেতনতার দিকে দৃষ্টি দিলে জানা যায়, বিশ শতকের প্রথমদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফলেই সমাজ-মনস্কতায় আসে পরিবর্তন। উদার মনোভাবাপন্ন বাড়ির মেয়েরা যাতায়াত শুরু করেন স্কুলে, তবে একা নয়। সেখানে নিতাইয়ের মায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন হিন্দুস্থানি ঝি। সেসময় পাঠশালায় প্রাথমিক পড়াশোনার জন্য চকখড়ি আর তেঁতুলবিচি নির্দিষ্ট ছিল। অনুরূপাও বলেছেন 'স্লেট পেনসিল ধরার আগে তেঁতুলবিচিই ছিল লেখাপড়া শেখার অবলম্বন।' ছোট শিশুর মনে প্রকাশের সাহস না থাকলেও প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই ছিল। তাই হঠাৎ করেই ঘটনাচক্রে যখন একটা চকচকে মুদ্রা হাতে এসে গেল তখন কাউকে না-জানিয়ে অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে কিনে ফেললেন তিনি স্লেট আর পেনসিল। অবচেতন মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটে গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে। উনিশ এবং বিশ শতকের প্রথম দিকের অধিকাংশ নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ-সংসার বা ব্যক্তির চোখ এড়াতে কখনো ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন, কখনো আড়ালে থেকে উদ্যোগী হয়েছেন। অনুরূপার অবস্থান তাঁদের থেকে পৃথক। তথাপি শিশুবয়স থেকেই সত্তার স্বনির্মাণের অভীপ্সা তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল। ক্লাস টু-তে পাঠ চলাকালীন পড়াশোনায় ছেদ পড়ে পিতার কর্মস্থল বড়খলায় যাওয়ার কারণে। তখনকার দিনে অভিভাবকেরা এখনকার মতো ততটা সচেতন ছিলেন না। শিশুরা পড়াশোনা করবে, পরীক্ষা দেবে— এর চাইতে বেশি আশা তাঁরা করেননি। তাই অনুরূপার পড়াশোনা বন্ধ করে স্বামীর সুযোগ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি আরোপেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন প্রমীলাসুন্দরী। বছর দুই পরে ফিরে এসে তিন ক্লাস ডিঙিয়ে তাঁকে ফাইভে ভর্তি করা হয় স্বদেশী স্কুলে। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের রেশ শিলচরের আকাশ-

বাতাসকে মর্মরিত করে তোলে। সে-সময় মেয়েদের অধিকার আদায় ও মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ রয়ে গেছে তৎকালীন সময়ে মিশন স্কুলে ছাত্রী-শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষিকা মিস ইভান্‌সের মধ্যে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার মধ্যে। ঘটনার পরিণতি স্বরূপ অপমানিত শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা মিশন স্কুল ত্যাগ করলে তাদের কথা ভেবেই স্বদেশী স্কুলের (বর্তমানে এই স্কুল দীননাথ নবকিশোর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত) প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কাছাড়ের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্যামাচরণ দেব ও সৌদামিনী দেবের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফসল এই স্বদেশী স্কুল। এ সম্পর্কে অনুরূপা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> "শিলচরে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তনে মেয়েদের স্কুল স্থাপন অগ্রবর্তী ঘটনা হয়ে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছিল সেদিন। ভাবতে গর্ব হয়, এই শহরের গুটিকতক বড়ঘরের মেয়ে, যাঁরা স্থানীয় মিশন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন, তাদের উজ্জ্বল দেশপ্রেম, উন্নত মর্যাদাবোধ, সর্বোপরি বিজাতীয় শিক্ষার পরিবেশের প্রতি ঘৃণার মনোভাব থেকে জাত আগুনের ঠিকরে পড়া ফুলকি এই অসম্ভব সম্ভব করেছিল।"

এই স্কুলেই ১৯৪০ সালে অনুরূপা ভর্তি হন। তাঁর ব্যক্তিজীবনে এই স্কুলের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বলেছেন— 'আমার জীবনের এমন শক্ত ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল মাত্র তিনবছরের এই স্কুলজীবন, যে শিক্ষার জোরে সারা জীবন সংগ্রাম করেও মাথা উঁচু রাখতে পেরেছি'।

এ-সময়ে থিয়েটারে বেশ সমৃদ্ধ ছিল শিলচর। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাত্রাদল, নাট্যকোম্পানির লোকেরা আসতেন। মেয়েদের জন্য সেখানে পৃথক বন্দোবস্ত হত। এ ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের 'Coronation Club' নামের নাট্যসংস্থা, তারাপুরের 'আনন্দ পরিষদ', আর্যপট্টির 'দুর্গাবাড়ি' এবং 'আর. ডি. আই' হলে অভিনয় হত। সে-সময়ে বৃহত্তর বঙ্গে নারীর অভিনয় স্বীকৃত হলেও শিলচরে তা সমর্থন পায়নি, কাজেই 'অভিনেতারাই অভিনেত্রীর পার্ট করতেন' বলেছেন অনুরূপা। তবে দর্শকাসনে বৃহৎ অংশ জুড়েই থাকতেন বিভিন্ন বয়সি নারীর দল। রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধার মধ্যে জীবনকে সীমাবদ্ধ না-রেখে নিত্যকর্মের পাট শেষ করে 'সবাই বসে যেতেন স্টেজের সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাতা ঢালাও শতরঞ্জির উপর'। বাল্যবয়সের স্মৃতিচারণে ধরা পড়েছে জায়া-জননীর ছকে-বাঁধা জীবনবৃত্তের বাইরে সত্তার নিজস্ব পরিসরের কথা—

> 'ঘরকন্নার নিগড়ে বাধা, নিরানন্দ গতানুগতিক জীবনে এই প্রাপ্তি যে কতখানি ছিল তা এখন বুঝতে পারি। এও বুঝতে পারি যে এই ছোট শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে, বিশেষ করে অন্দরমহলের মেয়েদের মধ্যেও সংস্কৃতিমনস্কতা তিরিশের দশক থেকে বেশ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এইসব সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে।'

এরকম সময়ে ভাব-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে চেতনাসঞ্চার এবং আত্মোপলব্ধি জাগরণের উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালে নারীসমাজের কল্যাণচিন্তায় 'নারীকল্যাণ সমিতি'র প্রতিষ্ঠা। সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মে অন্যতম বিষয় ছিল নারী। সমিতি প্রতিষ্ঠার বছরখানেক আগে ১৯৩৭-এ 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব উদ্‌যাপনে স্থানীয় 'আর ডি.আই' হলে মেয়েদের নিয়ে গীতিনাট্যানুষ্ঠান তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের দুয়ার খোলার জন্য যেন বাঁধা-ভাঙা এক প্রচেষ্টা। প্রথম অভিনীত নাটক

'মেঘমল্লার', এরপর 'বনস্পতির অভিশাপ', এরপর 'হিমপর্ণা'। 'বাঁধ ভেঙে দাও— বাঁধ ভেঙে দাও'— সেদিন সেই বাঁধই ভেঙেছিল, সেইসঙ্গে ভেঙেছিল আরো অনেক কিছু, ভাঙার সঙ্গেই অনেক বন্ধনের উদ্দাম মুক্তি ঘটেছিল। নিজস্ব ক্ষেত্র তথা পরিসর অন্বেষণে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী নিজেদের জড়াতে উদ্যোগী হলেন, মঞ্চাভিনয় সম্পর্কে উচ্চ সমাজের মনোভাব ছিল বিরূপ, সেই বিরুদ্ধতাকে অস্বীকার করেই মঞ্চাভিনয়ে অবতীর্ণ হলেন মেয়েরা। কাজেই একথা নির্দ্বিধায় সত্য যে, বিশ শতকে শিলচরে নারীসমাজের জাগরণ শুধুমাত্র গান্ধিজির অসহযোগ বা আইন অমান্যের মধ্য দিয়ে আসেনি, এর পেছনে ছিল এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবও। নারীকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে স্বদেশী স্কুলের ছাত্রীদের কাজ ছিল শরণার্থীদের জন্য শুকনো খাবারের প্যাকেট তৈরি করা। 'আমরা তখন ওই কাজে হাত লাগিয়েছি— আজও স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের বিশাল অন্নযজ্ঞের দৃশ্য'— বলেছেন অনুরূপা। এ-সময়ে ১৯৪২ সালে ক্লাস সেভেনে পড়া অবস্থায় যুদ্ধাতঙ্কে বাধ্য হয়ে সিলেটে আশ্রয় লাভ করতে হয় অনুরূপার পরিবারের। আগস্ট বিপ্লব, মেদিনীপুরে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে আসাম সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। এ সমস্ত কিছুকে রুদ্ধ করার প্রবণতায় সমগ্র বাংলাদেশে শুরু হয় 'Man made famine' — অর্থাৎ মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ। অনুরূপার লেখায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর কথা আছে। বলেছেন— 'জাপানিরা এগিয়ে আসছিল। আমরা বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারিনি আসলে জাপানিদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। বর্মা থেকে দলে দলে লোক পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে পায়ে হেঁটে তখন শিলচর এসে পড়ছিল'। এরই মধ্যে ১৯৪২ এর ১৮ই মে ডার্বিবাগানে বোমা পড়ে। বোমাতঙ্কে অনুরূপার পরিবার শিলচর ছেড়ে প্রথমে করিমগঞ্জ ও পরে সিলেটে আশ্রয় নেন। তখন তিনি ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। এসময়ের কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন—

> 'যা-ই করে হোক কষ্টেসৃষ্টে আমাদের মুখের অন্ন জুগিয়েছেন অভিভাবকরা, উপোস করতে হয়নি। দুর্ভিক্ষ ঝাপটা দিয়েছে, কিন্তু মেরে ফেলতে পারেনি। যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ— এই দুই দুর্বিপাককে চিনে নিলাম।'

শিশুমনের অনুভূতি জানাতে গিয়ে বলেছেন— 'সুন্দর শৈশব আর রইল না, শুরু হল কঠিন জীবনসংগ্রাম, টিকে থাকার লড়াই— যে লড়াইয়ে বড়দের সঙ্গে ছোটদেরও সামিল হতে হয়েছে।' যুদ্ধ-পরবর্তী দুর্ভিক্ষ, বিধ্বস্ত অর্থনীতি, বেঁচে থাকার জন্য কঠিন জীবনসংগ্রাম, অনিশ্চিত অতিথি জীবনের মধ্যেও লেখাপড়া বন্ধ হয়নি তাঁর, সাময়িক বিরতি চিরস্থায়ী হতে পারেনি। সিলেটের কিশোরীমোহন গার্লস হাইস্কুলেও আবার তিন ক্লাস ছেড়ে টেন-এ ভর্তি। এ-সময় বালিকা থেকে যুবতীতে উত্তরণের পর্যায়ে অনুরূপার বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টির সামনে অজানা অচেনা পৃথিবী, সত্তা ও অপরতার দ্বন্দ্বে আলোড়িত তাঁর অস্তিত্ব। বলেছেন—

> "উপরে এক শাসন ভীরু অবরুদ্ধ মন... পা বাড়াতে কতো ভয়, দুশ্চিন্তা... মন আবার স্বপ্নাতুর ... নিজে বড় হব, সমস্ত বাঁধন ছিড়ে নিজেকে গড়বো আরো কতো কি।" (আপন কথা)

অস্তিত্বের দ্বিরালাপিক অবসরে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ হয়ে ওঠে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনের একমাত্র উদ্ভাসন।

জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই

বস্তুত অনুরূপার জীবনে সাফল্যের মাপকাঠি ছিল তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর একাগ্রতা, তাঁর ইচ্ছাশক্তি। প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, আর্থিক অসঙ্গতি তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছটি মেয়ের পঞ্চমা অনুরূপার বিকাশের পথ উন্মুক্ত ছিল শুধুমাত্র 'ভাল পাশ করেছি বলে'। সত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠাব অদম্য স্পৃহাই তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছতে সহায়তা করেছে। পথ যতই সমস্যাসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ হোক না কেন, হয়ে ওঠার বাসনাই যেখানে মুখর সেখানে অন্য সবকিছুই গৌণমাত্র। অবচেতন মনের সুপ্ত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ হয়নি কখনো, হয়তো তিনি নিজেও চাননি। আবরণের আড়ালে গোপন রেখে প্রাণচঞ্চলতাকে উপভোগ করলেও শরিক করে তুলতে পারেননি নিজেকে। নিজেই বলেছেন—

> "খুবই মুখচোরা ভাবুক গোছের অন্তর্মুখী মেয়ে আমি, প্রাণ খুলে কারও সঙ্গে মিশি না, মন খুলে দিই না কারও কাছে, নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাবার প্রবল আগ্রহ কাজ করে সব সময় মনের ভেতর— আলাদা হয়ে থাকি, থাকতেও চাই।"

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি সিলেট উইমেন্স কলেজে ভর্তি। আর তখন থেকেই রাজনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। আমরা জানি প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর প্রয়োজন হয়, অনুরূপারও রাজনৈতিক কর্মে অনুপ্রবেশ হঠাৎ করে হয়নি, সলতে পাকানোর কাজ চলছিল অনেক আগে থেকেই। ১৯৩৬ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে মেয়েদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ শুরু হয়। এর আগে অন্তরালবাসিনী নারীর পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। মধ্য ত্রিশ থেকে যোগদানকারী মেয়েদের অনেকে জাতীয়তাবাদী পারিবারিক ঐতিহ্য বহন করে এসেছিলেন। কেউ বা পারিবারিক কোনো পুরুষ সদস্যের সূত্রে, আবার কেউ বা নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছিলেন, বাড়ির নিষেধাজ্ঞাকে পরোয়া না-করে। সেদিক দিয়ে অনুরূপা পুরুষ-আত্মীয়ের হাত ধরে না এলেও তাঁর মধ্যে চেতনা সঞ্চার করেছিলেন বাড়ির পুরুষ-আত্মীয় মেজদি রানির স্বদেশি স্বামী রমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। তাঁর আদর্শ ও নিষ্ঠাই সাম্যবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করে ছোট্ট অনুরূপাকে। সিলেট উইমেন্স কলেজে সহপাঠী দুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে যাঁরা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, ছাত্রফ্রন্টের সঙ্গে জড়িত যাঁর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন "সেই 'সবলা' নারীচেতনার ঝিলিক"। বলেছেন—

> "খুব যে একটা সচেতন ছিলাম তা কিন্তু নয়। তবু উত্তাল সময়ের ঢেউ— প্রতিবাদ প্রতিরোধ আগুনের আঁচ মনকে দীপ্ত করল।... যোগ দিলাম ছাত্র ফেডারেশনে"।

১৯৪১-৪২ সাল থেকে জেলায় জেলায় সংগৃহীত হতে থাকেন মহিলা সদস্য। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা ফ্রন্টে অন্যান্য মেয়েদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। এভাবেই অনুরূপাকে আকৃষ্ট করেন তাঁর বান্ধবীরা। 'এর মধ্যে আমায় আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলে একটি মেয়ে... সে আমায় কাছে টেনে নিলে'। সচেতন মনের গভীরে তখন থেকেই চেতনা সঞ্চারিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে মায়ের সমর্থন

ছিল না। বিপ্লবী ভাবধারার প্রতি সমর্থন থাকলেও অনুরূপার আনুগত্যে অনুরূপার পরিবাব বাধা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এলোমেলো জীবনেব অস্থিরতা, অনিশ্চিত জীবনে নিরাপত্তার অভাব তাদেরকে চিন্তিত করেছিল। কিন্তু স্রোতস্বিনী নদীর উদ্দাম বেগ রুদ্ধ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আক্ষেপ করে বলেছেন— 'ছোট থাকতে আর কখনও অবাধ্যতা করিনি— যা করেছি বড়বেলায়, নিজের জীবনের সবচাইতে গুরুতর সিদ্ধান্ত নেবার বেলায়'। মনেপ্রাণে আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন অনেক আগেই, ৪৬-এর শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নিলেন আদর্শ ও বিশ্বাসকেন্দ্রিক মতবাদকে পার্টির সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে। ডায়েরি লেখা শুরু তখন থেকেই, পাশাপাশি কবিতাও, যদিও সে-সময়কার অধিকাংশ কবিতাই অপ্রকাশিত। অভিভাবকদের বাহ্যিক পরিসরেব প্রভাবমুক্ত রাখার কোনো কৌশলই অনুরূপার পদচারণায় প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। 'মুক্ত বিহঙ্গ হবার উপায়' না-থাকলেও 'ভয় সংকোচ দ্বিধা এসব ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে বেপরোয়া হবার' চেষ্টা করেছিলেন। অন্যান্য সব সদস্যই যেখানে কমিউনিস্ট সেখানে অনুরূপার পরিবারে তিনি একাই সাম্যবাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই তাঁর এই নতুন পথে যাত্রা।

১৯৪৮-এ শিলচর ফিরে ভর্তি হলেন গুরুচরণ কলেজে। পাশাপাশি দিনবদলের সংগ্রামে শরিক করে তুললেন নিজেকে। কাছাড়ে তখন থেকেই পার্টি বা সংগঠনের উপর দমননীতি নেমে আসে। এসময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জেলা সম্মেলনে যোগদানকারী আড়াইশো প্রতিনিধিদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি ছিলেন কাছাড়ের গ্রামাঞ্চলের মণিপুরি ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর কৃষক-নারী, ছিলেন চা ও রেল শ্রমিক নারী, শহরের ছাত্রী ও নারী আন্দোলনে যুক্ত নারীরা। এ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন সুবর্ণপ্রভা দাশ, সুরমা ঘটক, কল্যাণী দাস (মিশ্র), হেনা দাস, বিলঙ্গময়ী কর, ইলা ভট্টাচার্য এমনকী দেড় বছরের কোলের বাচ্চা নিয়ে সন্ধ্যা মুখার্জিও সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

কৃষকদের নিয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফলের আশায় কলকাতায় বিজয় মিছিলের অনুকরণে ১লা মে শিলচরেও বিজয় মিছিলের সিদ্ধান্ত হয়। মিছিল চলাকালীন পদযাত্রীদের মধ্য থেকে গ্রেফতারের সম্ভাবনায় অনুরূপার আত্মগোপন। আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন শুরু তখন থেকেই— 'শুরু হলো কঠিন কঠোর জীবন... মুক্তিযোদ্ধার গোপন জীবন ... সুদৃঢ় শৃংখলায় সুনিয়ন্ত্রিত' (আপন কথা)। সম্ভাবনা মনের মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছিল কিছুদিন ধরেই। বলেছেন 'জানতাম, ঘর ছাড়ার দিন এসে গেছে'। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে অভিভাবকদের অনুমতি সাপেক্ষে পদচারণাতে যিনি অভ্যস্ত, ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁর বিহ্বল-বিমূঢ় হওয়াই তো স্বাভাবিক। অনুরূপার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল : 'মনে একদিকে মুক্তির আনন্দ,... অন্যদিকে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে' না-পারার জন্য এক অব্যক্ত কষ্টবোধ। সত্তা এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আলোড়নে সচেতন মনের দৃঢ়তায় মান্যতা পায় বাস্তব পরিস্থিতি। দুঃখ-যন্ত্রণার ক্ষতে শান্তির প্রলেপ তৈরি হয় সময়ের চলমানতায়। এ সময় জীবনচর্যা 'নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা'— আর কাজ 'কৃষক মেয়েদের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব বোঝানো'। এ যেন খাঁচায় বদ্ধ পাখি, নির্বাসিত জীবনে কাজের চাপ নেই, আতঙ্ক আছে, মন ছুটে গেলেও অস্তিত্ব-সংকটে অন্তরালেই অবস্থান। প্রথমে গন্তব্যস্থল বোয়ালজুর। নিবিড় অন্ধকারে, ঝিঁঝির একটানা

সুব, পিচ্ছিল গর্ত, 'হঠাৎ জেগে ওঠা সংকীর্ণ খাল' হল তাঁর চলার পথ। জীবনযাত্রা শুরু জঙ্গলাকীর্ণ জমিতেই ছয় ফুট বাই ছয় ফুট কুঁড়েঘরে। দিনের বেলায় আত্মগোপন, রাতের অন্ধকারে অজস্র ব্যাঙাচিপূর্ণ গ্রামের পুকুরে স্নান, সঙ্গে মাটির কলসে জল তুলে আনা। সমাজ সংসারেব বন্ধন ছিন্ন করে নারীর এ মুক্তিতে অনুরূপাব সত্তা অতৃপ্ত। বলেছেন—

> 'আত্মগোপন কবে আছি, একে কি অবাধ জীবন বলে?
> এটা কি মুক্তি হতে পারে?'

বোয়ালজুর থেকে রামনগর, সেখান থেকে বড়খলা। ধানের জঙ্গলে জমা জল কোথাও হাঁটু পর্যন্ত, কোথাও বা তারও বেশি। আর ধানগাছের গোড়া আঁকড়ে থাকা জোঁক রক্তের আস্বাদনে আহ্লাদিত। এ সবকিছু সঙ্গী করেই কখনো কাঁখে, কখনো মাথার উপরে নিত্য ব্যবহার্য কাপড়চোপড়ের বোঝা নিয়ে মাইলের পর মাইল পথ চলা। স্নেহবঞ্চিত রুক্ষ জীবনে মণিপুরী মহিলা গাম্ভিনীদি ছিলেন একমাত্র স্নেহদাত্রী। সেখানে সংগঠনের ভিত ছিল মজবুত। বিধবা, সন্তানহীনা চাউবিদিদি পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। খেতমজুর সম্মেলনে 'রংঘর' গ্রামে প্রতিনিধি সভায় হাজারখানেক খেতমজুরদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান মণিপুরী সবাই ছিল। তবে আশি ভাগ মণিপুরী। এসময় গণশক্তির কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন—

> 'মণিপুরের জননায়ক ইরাবত সিংহের তিনবছর বেশি সময় (৪৩-৪৬) কাছাড়-বাস কালে নিজের হাতে কৃষক আন্দোলনও সংগঠনকে মজবুত করার শ্রমের ফসল ছিল এসব শক্ত গণ-ভিত্তি যার জন্যে শহরের অন্তত দশ-বারো জন নেতা-কর্মী, নারী-পুরুষ মিলিয়ে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকতে পেরেছে।'

ভিতরগঙ্গাপুর ফিরে আসার পথে সঙ্গীসাথীদের মধ্যে দুজন অ্যারেস্ট হন, একজন 'বুদ্ধি করে পানার তলায় শুধু নাকটি ভাসিয়ে নিঃসাড়ে গা ডুবিয়ে থেকে বেঁচে' যান। পুলিশের দৃষ্টি অনুরূপাকে খুঁজে পায় না।

চল্লিশের দশকে নারীর বিচরণক্ষেত্র সেখানে সীমায়িত, সেখানে পুরুষের সঙ্গে হাতে হাত ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, অনাহারে অর্ধাহারে বিনিদ্রিত অবস্থায় প্রতিকূল প্রকৃতি তথা পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলায় যুবক-যুবতীর স্বপ্নলব্ধ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে বাধা-বিপত্তিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে এগিয়ে যাবার সচেষ্ট অনুভবের কথা জেনে বিস্মিত হতে হয়। অনুরাধা রায় বলেছেন—

> "বাংলার বিভিন্ন গ্রামে কৃষকদের লড়াই, ভারতের অন্যত্র তেলেঙ্গানা ও আরও কয়েকটি বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম, কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি হবার (১৯৪৮) সুবাদে অনেকক্ষেত্রে নিজেদেরও আন্ডারগ্রাউন্ড বা কারাগার জীবনযাপন— তাঁদের চোখে আসন্ন বিপ্লবের স্বপ্ন জাগিয়ে রাখল বেশ কয়েক বছর। সে স্বপ্নে যতটা আদর্শ ও আন্তরিকতা ছিল ততটা বাস্তববোধ হয়ত ছিল না।"[২]

অনুরূপার কণ্ঠেও শুনি একই সুরের প্রতিধ্বনি— 'আমরা রীতিমতো উত্তেজিত, স্বপ্নপাগল বিপ্লবের রোমান্টিকতায় আক্রান্ত'।

মার্কসবাদ যথার্থভাবেই কাজে-কর্মে-পাঠে-প্রয়োগে আত্মস্থ ছিল অনুরূপার। তথাপি ক্ষেত্র

বিশেষে পার্টির ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁকে আঘাত করেছে। সরল সাধারণ মানুষদের সংস্পর্শে এসে বোধগম্য হয়েছে মধ্যবিত্ত পার্টিকর্মীদের মধ্যে কিছুজনের সুবিধাবাদী মনোভাব, পাশাপাশি ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করে মেহনতি মানুষদের কর্তব্যপালন, তাঁদের ব্যতিক্রমী মনোভাব তাঁর দ্রষ্টাচক্ষু এড়ায়নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকলেও মেহনতি মানুষদের মানসিকতা মূল্যবোধে কোনো দ্বিচারিতা ছিল না। তাঁদের কাছ থেকে আহরিত শিক্ষাই পরবর্তী জীবনে হয়ে উঠেছে তাঁর বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন। বলেছেন—

> "তাদের কাছে শিখেছি ত্যাগ, ধৈর্য— সর্বাবস্থায় মানিয়ে চলার মতো মন তারাই গড়ে দিয়েছে আমায়। তাই তো বলি ওটাই আমার আসল পাঠশালা। মেহনতি মানুষ আমার শিক্ষক।"

সর্বহারাদের জীবন-যাপন, অভাব-অভিযোগ, আশা-আন্তরিকতার বহর তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। আর সেই বাস্তব জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত, শ্রমজীবী মানুষেরাই, পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষ— 'যাঁরা এই জগত ও জীবনের মেরুদণ্ড।'

মার্কস তার মতবাদ বা দর্শনকে শুধুমাত্র বয়ানে-বক্তব্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবিক প্রয়োগে আগ্রহী ছিলেন। অনুরূপা ১৪ বৎসর বয়সে মার্কসবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত মার্কসবাদই হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের চলার পথের একমাত্র পাথেয়। মার্ক্সীয় ডায়লেক্‌টিস-এর যথার্থ প্রয়োগ ঘটেছে তাঁর জীবনে।

৪৩-এর দুর্ভিক্ষ বাংলার কৃষকদের আর্থিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত করে দিল। এ অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টায় '৪৬ সালে শুরু হল বিভিন্ন জেলায় 'তেভাগা আন্দোলন'। তেভাগা আন্দোলনে প্রথমে কৃষকদের ঘরের মেয়েরা সেভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু তারাও তো ধান বুনত, ফসল ফলাতো। ক্রমে তাদের আকর্ষণ করে কৃষকসভা। আড়াল থেকে নেতাদের কথা শুনে তারা নিজেদের অধিকার নিয়ে এগিয়ে আসে সামনে, যোগদান করে আন্দোলনে। এদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বীণা গুহ বলেছেন, — তেভাগা আন্দোলনের একটি সভা চলছে ঠাকুরগাঁর একটি গ্রামে। হঠাৎ সেখানে ঢুকে পড়ে 'গ্রামের ডাকাবুকো কৃষক মহিলা জয়মণি। পেছনে তার এক দঙ্গল মেয়ে। জয়মণি এক কমিউনিস্ট নেতার দিকে তাকিয়ে বলল— হামরা কেনে শুনিম না তুর কথা। হামরা বেটা ছাওয়ালের সঙ্গে মাঠে কাম করি না? জোতদার গুলান হামাদের গায়ের মাংস গুলান ছিঁড়ে খায় না? হামরা লড়াকু। তেভাগার লড়াই— হামাদের সকলের লড়াই। কৃষক নেতা বল্লেন— হ তুমরাও কৃষক সমিতির মেম্বার। তুমরাও ভলন্টিয়ার। বিপুল উল্লাসে কৃষক মেয়েরা আওয়াজ দিল— জান দিব, তবু ধান দিব না। যোগ দিল কৃষক সমিতিতে'।[৩]

এভাবেই ১৯৪৬-এ বাংলার জেলায় জেলায় ছড়ানো তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত সংগ্রামে নিজেদের শরিক করে তোলে, এ সংগ্রাম হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাদের মধ্যে নারী অধিকারের চেতনাকেও আঘাত করে। ছেলেদের পুলিশের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে মুসলিম মেয়েরা পর্দার কথা ভুলে দা-বঁটি হাতে তুলে নিয়েছিল। আর্থিক সমস্যা নিয়ে লড়াই করতে করতে তারা নিজেদের সম্মান, অধিকার, সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি পুরুষের সমানাধিকারের দাবি সম্পর্কেও উদ্যোগী হয়েছিল। কাছাড়েও

একই সময়ে কৃষকদেব আন্দোলন শুরু হয়। অনুরূপার আত্মজীবনী পাঠে জানা যায়, নারীপুরুষ নির্বিশেষে 'ঝাঁটা লাঠি হাতে' সবাই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। শহিদ হয়েছিল বীবাঙ্গনা ইবেমচাও। রানী দাশগুপ্ত বলেছেন—

'... নারীমুক্তি আন্দোলন এতদিন নগরগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নারী সমাজের মধ্যে। বাংলাব গ্রামের নারীসমাজকে প্রথম জাগিয়ে তুলেছে তেভাগা আন্দোলন।'[৪]

কাছাড়ে বিশেষভাবে মণিপুরি নারীসমাজে এসেছিল জাগরণ। অনুরূপা বলেছেন—

"এ বিপ্লবী কর্মপ্রয়াসের মধ্যে দেখতে পেলাম বিবাট মেয়েসমাজের বন্ধনমুক্তিকে ... যুগ যুগ সঞ্চিত লাঞ্ছনাব, অবদমনের কঠিন শিলাচলে যেন নেমে এসেছে মুক্তিঝোরার ধারা।"

(আপন কথা)

দক্ষিণ ২৪-পরগণার সবোজিনী, উত্তমা, বাতাসী, গর্ভবতী অহল্যা, সূর্যমণিও শহীদের তালিকায় নাম লেখান। অহল্যার পেট থেকে বেরিয়ে আসে 'অজাত শিশুব অপুষ্ট একটি হাত'। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'পরিচয়' পত্রিকায় সলিল চৌধুরী লেখেন 'শপথ' কবিতাটি।

"কাকদ্বীপ
শোন কাকদ্বীপ— সেই চন্দন পিঁড়ি শ্মশানে
যেদিন আমরা অহল্যা মাকে
চিতাশয্যায় তুললাম
(আহা!) শপথ আগুনে দাউ দাউ জ্বলা
পাঁজরের চিতাশয্যায়
কলজে জ্বালিয়ে ফেললাম।[৫]
* * *"

তেভাগা একসময় অর্থনৈতিক লড়াইয়ের সীমানা ছাডিযে বৃহত্তর মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত হয়। শিলচর জেলে বন্দি কৃষক মাধবী নাথের মৃত্যুতে অনুপ্রাণিত হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি গান এখানে উল্লেখ করতে চাই—

'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ একথা ভুলব না
তোমার কলিজার খুনে রাঙাইলো কে আন্ধার জেলখানা'[৬]

মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?

অজ্ঞাতবাসকালীন সময়ে নারীর সামাজিক ভূমিকা অনুরূপাকে আহ্লাদিত করেছে, গ্রামজীবনে দু'বছরের ব্যাপ্তিকালে তিনি লক্ষ করেছেন মেয়েদের স্নেহময়ী ভূমিকার পাশাপাশি বীরাঙ্গনা রূপ। লক্ষ করেছেন যুগব্যাপী নারীর বঞ্চিত বদ্ধজীবনে বিপ্লব যেন মুক্তির এক মহামন্ত্র। পূর্বসূরিদের অবহেলিত শোষিত জীবনের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই ছিল মুক্তি কামনার এক বার্তা। বিপ্লবী জীবনে অনুরূপা নারীসমাজের অনুভবকে উপলব্ধির চেতনায় রাঙিয়ে মনের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

"দেখেছি বঞ্চনার অথৈ পাথার আজ আর বোবা হয়ে থাকতে চাইছে না, দুরন্ত বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবনে ভেসে পড়তে চাইছে। তাই পিছন না চেয়ে পথে পথে রক্ত দিয়ে মুক্তিস্বপ্নের আলপনা রেখে গেছে এ মাটীব কল্যাণী— অনন্যাবা, নিজের সন্তানের ক্ষুধার অন্ন, স্বচ্ছন্দ জীবন, ভবিষ্যৎকাল আত্মাধিকার, স্বামীপুত্র নিয়ে শান্তির সংসার পাবার কামনায় তাঁরা চলার পথ এঁকে গেছেন— সেই জীবপালিনী শক্তিধারিণীদেব কল্যাণী হৃদযে আমার বিদ্রোহী কাঠিন্যে আনলো আরো নতুন সুর। মেযে সত্তাকে আরো নতুন করে যেন দেখতে পেলাম।"

(আপন কথা)

কিন্তু সমাজ-সংসারেব বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে গিযেও বুঝতে পেরেছেন সমাজ-নির্দিষ্ট অনুশাসন থেকে নারীর মুক্তি নেই, নিম্নবিত্ত কৃষক সমাজেব মধ্যেও সমাজ নামক যন্ত্রেব চাপ বিবাজমান। যে কোনো অবস্থানেই সমাজ স্বীকৃত, তাব অদৃশ্য চাপও অব্যাহত। এ পৃথিবীতে পুরুষের একটাই পরিচয়— সে মানুষ, আর নারীর ক্ষেত্রে তাব চিহ্নাযক পরিচয়ই স্বীকৃত, সেখানে মানুষ হিসেবে তাব পুরুষের মতো একক সত্তা নেই। নারীকে আধারস্থ হিসেবে দেখতেই সমাজ আগ্রহী, আব সে-আধার স্বামী পুত্র পিতা যে কেউ হতে পারেন। আর সেই সামাজিক পরিচয়ের জন্যই কমরেড বিশ্বাসের (কার্তিক বিশ্বাস) সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্কের স্বীকৃতিদান অর্থাৎ লোকদেখানো বিয়ে। সময়টা ১৯৪৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর। নিয়ম-আচাব-উৎসব-অনুষ্ঠান বর্জিত অনাড়ম্বর পরিবেশে শুধুমাত্র পার্টিসদস্য ও গ্রামবাসীদের সামনে বিবাহিত বলে ঘোষণা ভিন্ন আর কিছু নয়। কারণ পার্টি নীতিতে ব্যক্তিগত জীবন তুচ্ছ, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ দুর্বলতা, অলিখিত নিয়মেই তা কার্যকরী। মানুষকে একসূত্রে বেঁধে ফেলার প্রক্রিয়া শুধুমাত্র বাহ্যিক, পার্টি নীতিই সেখানে এক এবং একমাত্র নির্ধারক। তাই স্বামী হিসেবে ঘোষিত কমরেড বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হলে চোখেই কথা বলতে হয়। আক্ষেপ করে বলেছেন—

"যেন আমাদেব সব কথা ফুরিয়ে গেছে। পার্টি ছাড়া যেন ব্যক্তিগত জীবনের আবেগ অনুভূতির স্থান নেই।"

পার্টি ভিন্ন পারিবারিক জীবনে এ পুতুল বিয়ের কোনো স্বীকৃতি নেই। তাই ১৯৫২ সালে কমরেড বিশ্বাসের (যিনি তখন আইনজীবী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত) সঙ্গে অনুরূপাব বিয়ে হয় আনুষ্ঠানিকভাবে।[৭]

সমাজকে সচেতন মনে অস্বীকার করে চললেও 'সমাজ নামক অদৃশ্য শক্তিধরের কাছে' পরাজয় হয়েছে তাঁর। সাম্যের গান গাইলেও নারীর ভূমিকাতে সব বাধা-ব্যবধান ঘোচানো সম্ভব হয়নি। নিজেই বলেছেন—

"সমাজ বদল করতে নেমে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি সমাজ নামক অদৃশ্য, আপাত অলক্ষ্য ভিত্তিটি কী অসীম শক্তি রাখে 'মেয়ে' হলে অনেকটাই অরক্ষিত আর 'বউ' হলে আরেকরকম।"

সমাজআরোপিত নিয়ম-নীতির বেষ্টন থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি তাঁর ব্যক্তিসত্তা। জীবনপথের যাত্রী হয়ে পূর্বমাতৃকা অনন্যাদের সংস্পর্শ তাঁর অন্তর্নিহিত সত্তাকে আলোড়িত করেছে। পূর্বমাতৃকাদের নিষ্ফল যুদ্ধের বৃত্তে সঞ্চিত তাৎপর্যপূর্ণ ইশারা তিনি লক্ষ করেছেন।

'আমি এই শ্যামলববণী বিশাল মাতৃরূপা দেশের কোলে কত অনন্যার সন্ধান পেযেছি. . তাদেব হৃদয মিলেছে আমাব হৃদযে . ''— অন্তবালবর্তী এই অনন্যারা ভাবে-অনুভবে পলে-অনুপলে মিশে আছেন অনুরূপাব মধ্যে, যাঁদেব অনুরূপা দেখেছেন, চিনেছেন, জেনেছেন। অনুরূপাব মা সহ দেশের অগণিত পূর্বমাতৃকারা দেশ, সমাজ, বাজনীতিব বিপর্যযের আড়ালেই থেকে যান নামহীন পরিচযে। প্রগতি সংস্কৃতির অন্যতম লেখিকা সুলেখা সান্যালের সাহিত্যপাঠেও এই অজানা অচেনা আড়ালকৃত পূর্বমাতৃকাদের চিনে নেওয়া যায়। 'এ মাটির অনন্যারা ... চলাব পথ এঁকে গেছেন'— তাদেব অঙ্কিত পথে সফল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাব অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সম্বল কবেই উত্তরণে আগ্রহী অনুরূপার জাগ্রত নারীসত্তা। সমযেব অতন্দ্র প্রহবী অনুরূপার অন্তঃস্থল নিঃসৃত বয়ানেই নিহিত তাঁর নারীচেতনা বা নাবীবাদেব অঙ্কুর। আর এই অঙ্কুব থেকেই মুক্তিচেতনার আলোকবর্তিকা আজকের অনুরূপাব সফল আত্মপ্রকাশ।

> ''নিত্যদিন নাবী তুমি মাটিগন্ধা
> সেবাদাসী, গর্ভদাসী, রূপদাসী
> যা-ই হোক নাম,
> জলের দর্পণে দেখি জেগে রয ছবি
> আদিরূপা প্রকৃতিজননী''[৮]

অষ্টম অধ্যায়

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম

বেবী হালদারের 'আলো আঁধারি'

"কোন অপরাধে আমি এখানে এলাম,
উঠতে বসতে জ্বালা, কথায় কথায়
অপমান, হেলাফেলা, ছোট করে দেখা,
নারী অঙ্গ নিয়ে জন্ম অপরাধ নাকি!"

— কৃষ্ণা বসু

বেবী হালদার আমাদের চেনা গণ্ডির পরিচিত জন যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্যনৈমিত্তিক; প্রতিদিনকার সাক্ষাতে যা অবহেলিত, অনাদৃত; যে সম্পর্ক সুবিধাভোগের, সুবিধা আদায়ের, সন্তুষ্টি ক্রয়ের সম্পর্ক। এককথায় স্বার্থিক লাভালাভ যেখানে মুখ্য, সেখানে সম্পর্কের আড়ালে সম্পর্কহীনতার প্রতিচ্ছবিই প্রকট। স্বার্থসুলভ এই সম্পর্কের গণ্ডি এড়িয়ে সত্তার পরিচয় সন্ধান বাহুল্যমাত্র, তাই আগ্রহ নেই কারো। হয়তো বা তা প্রয়োজনের নিক্তিভুক্ত নয় বলেই। তাই তার পরিচয় শুধু তার সম্বোধনেই সীমাবদ্ধ, যেখানে শুধুমাত্র নাম পরিচয়ই যথেষ্ট, পদবির খোঁজ নেওয়া অহেতুক মাত্র। এই পরিচয়হীন, গোত্রহীন সত্তার ক্ষোভ যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কোনো-এক ক্ষণিক অবসরে, কোনো-এক আশাহত মুহূর্তে, দীর্ঘশ্বাসে ভরপুর দু-চারটি কথার মধ্য দিয়ে। এর চাইতে বেশি বলার অবকাশ যেমন তাঁদের নেই, তেমনি শোনার আগ্রহেও উদ্‌গ্রীব নয় কেউ। এই নিরুচ্চারিত বর্গের গর্বহীন দীপ্তিহীন ভাষাহীন কাহিনির রূপকার বেবী। প্রাচীরের গায়ে নাম-গোত্রহীন ফুলের মতোই তাঁব নিয়তি-নির্দিষ্ট অবস্থান, প্রতিনিধিত্বের আকল্পে চিহ্নিত বাস্তব পরিসর। কিন্তু একই অবস্থানের শরিক হয়েও তিনি অন্যদের চাইতে ভিন্ন হওয়া আর হয়ে ওঠার কাহিনি রচনার ঐকান্তিক আগ্রহই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিভূমি। আর এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ 'আলো আঁধারি' যেখানে আঁধারকে অতিক্রম করে তিনি পাড়ি দিয়েছেন আলোর ভুবনে, তার জয়যাত্রার রথচক্রকে তিনি একটু একটু করে অন্ধকার ভুবনের গলিঘুঁজি থেকে প্রশস্ত পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন। 'আলো আঁধারি' নামের মধ্যেই রয়েছে এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। 'আলো আঁধারি' মানেই তো স্পষ্ট-অস্পষ্ট, প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন, ব্যক্ত-অব্যক্ততার এক রহস্যাচ্ছন্ন মেলবন্ধন। আলো-আঁধারের যুগল মিলন। বেবীর জীবন, তাঁর সত্তার অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ তথা উন্মীলন। দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অনটন অশান্তির বেষ্টনী ছেড়ে প্রান্তিক অবস্থান থেকে ভিন্ন পরিসরে চিন্তাচর্চার এক নতুন পরিমণ্ডলে তাঁর চলাফেরার মধ্যেই রয়েছে আলো-আঁধারির ব্যঞ্জনাগর্ভ নামকরণের বিশেষত্ব।

তোমাকে নির্মাণ করতে গিয়ে দেখি দ্রুত সরে যাচ্ছে সময়ের ফুলগাছ

বেবীর ত্রিশ বছরের জীবনে, ঘটনাপ্রবাহ এরকম— বেবীরা দুবোন, দুভাই। বাবা উপেন্দ্রনাথ প্রথমে ফৌজিতে, পরে গাড়ি চালকের কাজে, তারও পবে এক ফ্যাক্টরিব কাজে যোগ দেন। দারিদ্র্যের জ্বালা, পাবিবাবিক অশান্তিতে বেবীব মা গঙ্গা ছোট ভাইকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। দিদির বিয়ে হয়ে যায় ১৫ বৎসর বয়সে। সংসাবেব দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করে বেবীর জ্যাঠা বেবীর বাবাকে বিয়ে দেন। কিন্তু সৎমার স্বামী-সন্তান-সংসাবেব প্রতি কোনও মমত্ব ছিল না। তাকে মিথ্যাচার কবে বেবীর বাবার তৃতীয়বাব বিয়ে। নতুন মা-ও বেবীদের আপন কবে নিতে পারেননি। বারো বছর দশ মাস বয়সে ছাব্বিশ বছরেব যুবক শঙ্কবের সাথে বিয়ে হয় বেবীব। একের পর এক তিনটে সন্তানের জন্ম হয়। স্বামীর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে একসময় বেবী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ঠিকানাহীন পথে। প্রথমে বাবাব বাড়ি, এরপর ফরিদাবাদের উদ্দেশ্যে পাড়ি। তারপর পরিচারিকার কাজ করতে করতে একসময়ে গুরুগাঁওয়ে এক পরিচিত লেখকের গৃহে আশ্রয়লাভ। সেখান থেকেই লেখার ভিত তৈরি এবং আত্মজীবনী রচনা— যার মধ্য দিযে কাজের মেয়ের পবিচিতি থেকে লেখিকার পরিচযে উত্তবণ।

একটি সাদামাটা জীবনকাহিনি। কিন্তু কাহিনিতে রয়েছে নবজাতক বা নবজীবনলব্ধ বেবী ও তাঁর একাগ্রতা, নিষ্ঠা, উচ্চাশাব বাস্তবায়ন। ভয়ঙ্কর পরিবেশের প্রভাবকে এড়িয়ে সংগ্রাম-মুখর জীবনের সঙ্গে জীবনযন্ত্রণার চূড়ান্ত রূপ প্রত্যক্ষ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মধ্যেই রয়েছে বেবীর চারিত্রিক ভিন্নতা। অনালোকিত পরিসরের অন্তরালে ঘটে-চলা শোষিত মানুষের জীবন-যন্ত্রণার টানাপোড়েনের ছবি এই আত্মজীবনী। উনিশ শতকের রাসসুন্দরীর পব বেবীর আত্মজীবনী একুশ শতকের প্রান্তীয় সমাজের পারিবারিক তথা সামাজিক চালচিত্রের এক লিখিত বয়ান। আত্মজীবনী যেহেতু সত্যভাষণ তাই স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সত্যকথন প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

প্রথমত বেবীর আত্মকথায় সন, তারিখের কোনো উল্লেখ নেই, আনুমানিক একটা সময়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু অনুমান কখনো প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। আর ইদানীং কালে তো নারীবিষয়ক বই লেখা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে বাণিজ্যিকীকরণের একটা সুচতুর চেষ্টা চলছে। Unauthentic Commercial ব্যাপারটা সমগ্র ভারতবর্ষেই চলছে, সেইসঙ্গে কলকাতাতেও। 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসে হিন্দু আমলের আবহাওয়া থাকলেও সন তারিখ যুক্ত ইতিহাসের প্রভাব নেই বলেই তা বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসের গোত্রভুক্ত হতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত স্থানের উল্লেখে শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীর, মুর্শিদাবাদ, ডালহৌসী, ধানবাদ, কান্দি, করিমপুর, দুর্গাপুর নামগুলোর উল্লেখ আছে। কিন্তু এই প্রদেশ বা জেলার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট জায়গার নাম নেই, এমনকী পাড়ারও কোনো উল্লেখ নেই। গ্রাম এবং পাড়া বলেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রেখেছেন লেখিকা। কোনো একটি অঞ্চলের নির্দিষ্ট ভাষা বিশেষত্বের উল্লেখ করতে গিয়েও লেখিকা গ্রামের নামটি মনে রাখতে পারেননি বা বলতে চাননি। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। একবারই শুধু 'বাবার কোম্পানীর ডি.পি.এল হাসপাতালের' কথা বলেছেন, কিন্তু বাবার কোম্পানির পরিচয় সংক্রান্ত কোনো ইঙ্গিত দেননি। আমরা জানি, ঘটনা

সংযোজন বা তথ্য সংগ্রহ আত্মজীবনী লেখাব শর্ত নয়, তথাপি পবিবেশ, পরিচিতি, পরিসরকে বাদ দিয়ে সমাজ ইতিহাসের চিত্র, সামাজিক বিন্যাস অপূর্ণ, তাই স্থান-কাল-পাত্রের উল্লেখ অপরিহার্য।

তৃতীয়ত আত্মজীবনীর প্রতিটি পাতায় বেবীর পরিচিত-অপরিচিত জনের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাম বা সম্বোধনই ব্যবহার করেছেন, পদবি বা পরিচয় প্রদানে আগ্রহ দেখাননি, বা জরুরি মনে কবেননি তিনি।

এই অনুল্লেখকে নীরবতার রাজনীতি বলা যায় না। হতে পারে লেখিকা অতীত বিস্মৃত, নতুবা ব্যবহারিক শিক্ষার অভাববোধই উল্লেখের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে ততটুকু সচেতন বা সতর্ক করে তুলতে পারেনি, তাই জীবনযন্ত্রণার ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে ঘটে-যাওয়া ঘটনাকে বিস্মৃতির গর্ভগুহা থেকে পুনরুদ্ধারেই অধিক মনোযোগী হয়েছেন। ঘটনাকেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকগুলো অনুক্তই থেকে গেছে। যেমন আত্মজীবনীব একজাযগায় আছে 'ফটোতে আছে জ্যেঠু, জ্যেঠুর পাশে শর্মিলাদি আর একপাশে সুখদীপদা'। এই জ্যেঠু যিনি বেবীকে বলেছিলেন, 'তুমি দ্বিতীয় আশাপূর্ণা দেবী হতে পার'। শর্মিলাদি সম্পর্কে অন্যত্র আছে 'এই কয়েকমাস হল তার লেখা একটি বইও বেরিয়েছে'— আবার বলেছেন 'সে একটি স্কুলে চাকরী করে'— শর্মিলাদি হতে পারেন 'বাংলায় মেয়েদের ভাষা' বা 'নিঃসঙ্গতার জার্নালের' লেখিকা প্রয়াত শর্মিলা বসু দত্ত। কিন্তু এ ভাবনাতে একটু বেশি সবলীকরণ হয়ে যায়। সাহিত্যিক বা সাহিত্যপিপাসু জ্যেঠু-কে চেনার জন্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের একমাত্র উপায় বেবী বা প্রবোধকুমারের দ্বারস্থ হওয়া। আত্মজীবনীকার বিনোদিনী তাঁর লেখায় দু-একজন ব্যক্তির নাম পরিচয় গোপন রেখেছেন, আর এই গোপনীয়তা তাঁর স্বেচ্ছাকৃত। তারপরও তাঁর সময়কে, সময়ের ইতিহাসকে, চারপাশের ব্যক্তিবর্গকে, তাঁর সমাজকে জানতে বিনোদিনীর শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি, আর হলেও আজ তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বেবীর রচনার ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। আর যেখানে উল্লেখ রয়েছে সেখানেও তার পরিধি-ক্ষেত্র এতই বিস্তৃত যে সেখান থেকে স্থানিক পরিচয় বা ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধান অন্ধের হস্তিদর্শনতুল্য। তথাপি 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'-আর এই সহজ কথাকেই সহজে বলতে পারার কৃতিত্বে বেবী অবশ্যই আমাদের কাছে বারবার উচ্চার্য।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করতে পারি C.K. Janu র 'Mother Forest'-এর কথা। ভাস্করণ আদিবাসী মালয়ালিতে তা লেখেন, পরে রবিশঙ্কর তার ইংরেজি অনুবাদ করেন। কেরালার সবচাইতে গরিব জাতির মেয়ে জানু, গ্রামে জঙ্গলের মধ্যেই যাদের জীবন ছড়ানো। সেখানে জানুর বলাতেও সাল তারিখের উল্লেখ নেই কিন্তু কথনভঙ্গি বা ঘটনাপ্রবাহ সময়টাকে সঠিকভাবে চিনতে বা জানতে আমাদের সাহায্য করে[১]। সেদিক দিয়ে বেবী হালদারের 'আলো আঁধারি' আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। একই কারণে সামাজিক মানচিত্রে প্রামাণ্য দলিলের দাবিদার নয়। তবে সমাজ ইতিহাসের আকর্ষণীয় উপাদান হিসেবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

'আলো আঁধারির' ''প্রকাশ প্রসঙ্গে'' অংশের শুরুতেই প্রকাশক আমাদের জানিয়েছেন—

"কোন বই মূলভাষায় প্রকাশ হবার আগেই অন্য ভাষায় অনূদিত হয়ে পাঠকেব কাছে পৌঁছে যায়, এমনটা কমই দেখা যায়। উল্লেখ্য, পববর্তীতে এই আত্মকাহিনীমূলক বইটির চারটি কিস্তি মূল ভাষায় নবারুণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'ভাষা-বন্ধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।"

আবার আত্মজীবনীর শেষাংশে বেবীর বয়ানে বয়েছে—

"বেবী পত্রিকাটা উল্টেপাল্টে দেখে বেবীব নিজের নাম। অবাক হয়ে আবার দেখে, সত্যিই তো লেখা আলোআঁধারি, বেবী হালদার।.. পত্রিকার নাম দেখতে দেখতে জ্যেঠুর কথা মনে হল। ... বেবী নিচে থেকে ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে, বলছে দেখ দেখ একটা জিনিষ। ছেলেমেয়ে দুজনেই দৌড়ে এসেছে। বেবী ওদের বলল, বলত এটা কি লেখা আছে? বেবীর মেয়ে একটা একটা করে অক্ষর বলল, বেবী হালদার, মা, তোমার নাম বইয়ে?"

এই দুটো অংশের পাঠপ্রতিক্রিয়ায় আমাদের ভাবনার স্তবে নতুন প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করে।

(১) বেবী হালদার কি জানতেন ওঁব আত্মজীবনী প্রকাশিত হবাব পর তাঁর বা তাঁর সন্তানদের প্রতিক্রিয়া কী হবে?

(২) যদি তা সঠিক না-হয তা হলে কি ভাবনাতে আলোড়িত প্রতিক্রিয়াই লিপিবদ্ধ করেছেন আত্মজীবনীর শেষাংশে? কারণ প্রকাশকের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, প্রথমে বইয়ের আকারে পবে পত্রিকাতে বেবীর আপন কথা প্রকাশের আলো দেখে।

(৩) যদি শুধুমাত্র মূলভাষায় প্রকাশিত হবার সময়েই অনুবাদকৃত হিন্দি বইয়ের প্রকাশলব্ধ অনুভূতির কথা তুলে ধরা হয় তা হলে সংযোজন অংশে তা সন্নিবিষ্ট করার কথা ছিল। কিন্তু সেরকম কোনো অংশের উল্লেখ আত্মজীবনীতে নেই।

(৪) সেক্ষেত্রে অন্যভাষায় অনূদিত হবার সময়ে আত্মজীবনীটির শেষাংশ নিশ্চয়ই ভিন্ন বয়ানে ছিল? ধরে নেওয়া যায়, লেখিকার এ ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু যে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর পরিমণ্ডল থেকে এই আত্মকথার প্রকাশ, তাঁদের এক্ষেত্রে আরেকটু যত্নবান হওয়া বোধ হয উচিত ছিল।

আমরা যে জ্যামিতি শিখতে পারলাম না

আলো-আঁধারিতে তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে বেবীর জন্ম থেকে বিয়ে; দ্বিতীয় পর্বে বেবীর সাংসারিক জীবন থেকে শুরু করে তিন সন্তানকে নিয়ে ফরিদাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা; তৃতীয় পর্বে তিন সন্তান নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, প্রবোধকুমার অর্থাৎ তাতুষের আশ্রয় লাভ এবং আত্মজীবনী রচনা ও প্রকাশের আনন্দ।

বেবী প্রথম স্কুলে ভর্তি হন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে। আর্থিক অনটনের মধ্যেও বেবীর মা সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ করেননি। বেবীর নিজেরও এক্ষেত্রে আগ্রহ ছিল প্রবল। কিন্তু মায়ের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বেবীর লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি হয়। টিউশনি বন্ধ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও 'আমরা স্কুলে যেতাম, ইস্কুলে গেলে খুব ভালো থাকতাম' বলেছেন বেবী। সেখান থেকে

ধানবাদ গিয়ে নতুন স্কুলে যাতায়াত। কিন্তু সেখানেও একই ঘটনাব পুনরাবৃত্তি 'বাবা বই খাতা কোনদিনই কিনে দিত না, তবুও আমি এর ওব কাছ থেকে জোগাড় করেই নিতাম'। প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করাব পেছনে মূলত লেখাপড়াব প্রতি অপরিসীম আগ্রহই ক্রিয়াশীল। যদিও এ জয়ের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হযেছে অনেক বৎসব। পিতার সহানুভূতি-সহযোগিতা তিনি পাননি। 'আমাব ইস্কুলে যাবার অভ্যেস ছিল বলে আমি পাড়াব ছেলে-পিলের সাথে ইস্কুলে যেতাম'। কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টায় বেবীকে কান্দিতে জ্যেঠার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন বেবীর বাবা। সেখান থেকেও বেবীকে ফিরে আসতে হয ঘরের কাজের জন্যে। স্বার্থিক লাভালাভের টানাপোড়েনে বেবীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় চিরদিনের জন্যে। একটা মেয়ের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে। বাংলার প্রথম মহিলা কবি খনাও এক নিষ্ঠুর চক্রান্তেব শিকার হয়েছিলেন পুরুষতন্ত্রের প্রবল প্রতাপে, তার জিভ কেটে ফেলা হয়েছিল তাব পাণ্ডিত্যেব খ্যাতি প্রকাশের ভয়ে। ববীন্দ্রনাথেব 'খাতা' গল্পের উমার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল শ্বশুববাড়ির লোকেবা। আপনজনেরাও লিঙ্গ-বৈষম্যের ঘৃণ্য খেলায় কতটুকু হিংস্র বিধ্বংসী হযে উঠতে পারে, তারই প্রমাণ তাঁরা। আমাদের ভারত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে রয়েছে—

Every child has the right to survival [articles 47& 39(2) 8(f)]

Every child has the right to life & liberty (articles 21 & 45)[২]

তা হলে বেবীর ক্ষেত্রে কেন এমন হল? এর পেছনে রয়েছে লিঙ্গ-রাজনীতির এক নিষ্ঠুর চক্রান্ত, পুরুষতন্ত্রের নাবীকে অবরোধে রাখাব সুচতুব প্রয়াস, তাঁদের ধারণায় নাবীব জন্য অর্থ ব্যয় বাহুল্যমাত্র, তাবই শিকার বেবী। ইচ্ছের গাছকে তিনি লালন কবেছেন হৃদয়ের মণিকোঠায়, সেই ইচ্ছের গাছই আশ্রয়দাতা প্রবোধকুমারের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে ফুল-ফল নিয়ে একসময় আত্মপ্রকাশ করে। পড়াশোনাব পাশাপাশি লেখিকা হিসেবে তিনি নিজেকে নির্মাণ করেন। স্রষ্টা বেবীর উপলব্ধিতে ছিল, 'বইটা আমার থেকে বেশি তাদের'। উৎসর্গ অংশে তাই বলেছেন—

> "যা কিছু এখন আমি লিখছি এসব কি লিখতে পারতাম যদি আমার ইস্কুলের মাষ্টার মহাশয় দিদিমণিরা বাংলা ভাষা আব সাহিত্যের সাথে আমার পরিচয় না করাতেন? এই জন্য আমি ওদেরকেই আলো-আঁধারি উৎসর্গ করলাম।"

প্রবোধকুমার এখানে উপলক্ষমাত্র। মূলত বেবীর অবচেতনের স্তরে ভাবনা-চিন্তার আলোড়ন ছিল, অপেক্ষা ছিল সুযোগের, তাই সময় এবং সুযোগ আসতেই ভাবনাগুলো বেরিয়ে এসেছে শব্দ ও বাক্যের বুননে। সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কলম ও কালির আঁচড়ে।

কে বুঝবে তার মর্ম-ব্যথা

সংসার ত্যাগের মধ্য দিয়ে গঙ্গা (বেবীর মা) প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্বামী, সংসার, সুবিধাবাদী সমাজের বিরুদ্ধে। প্রথম প্রতিশ্রুতির সত্যবতীও শিশুকন্যাকে ফেলে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পুরুষতন্ত্রের ছলনার সঙ্গে লড়াই-এ সে জয়লাভ করতে পারেনি বলে

আত্মসম্মানবোধকেও বিসর্জন দেয়নি। শূন্য হস্তে বেবিয়ে এসেছে ভবা সংসাব, সাজানো আয়োজনকে পেছনে রেখে। দারিদ্র্যের অসহনীয জ্বালা গঙ্গাকে প্রতিবাদী করে তোলে, অন্যদিকে ব্যক্তিত্বেব সঙ্গে সমাজনির্দিষ্ট ভূমিকার সংগ্রামী মনোভাবই সত্যবতীকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বদ্ধপরিকর করে তোলে।

দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীব কাছ থেকে গঙ্গা একের পর এক সন্তান প্রাপ্তি ভিন্ন কিছুই পাননি। সন্তানসহ সংসার যেন তাঁর একার, কাজেই উপার্জনের দাযও তাঁরই। এই অবহেলিতা জীবন থেকে লক্ষ্মণের গণ্ডিরেখা অতিক্রম করে অবুঝ শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে সংসাব ত্যাগ করে পাড়ি দিয়েছেন তিনি ঠিকানাবিহীন পথে। যদিও বিশ বছর পর আবার ফিরে এসেছেন কিন্তু তা নতুন কবে হাবাবার জন্যেই। 'A woman is the woman's body.'[৩] পুরুযের কাছে নারীদেহ কাম্যবস্ত, সম্পর্ক সেখানে তুচ্ছ। তাই বেবীর মায়েব মৃত্যুকালীন সময়ে বেবীর বাবা অন্তিম দর্শনেও আগ্রহ দেখাননি। যে-মহিলা ঘর ছেড়েও কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর পরতেন, তাঁর সৎকার করারও প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। তাঁর কাছে নারী ভোগ্যসামগ্রী, এক এক করে তিন নারীর সংসর্গ তিনি ভোগ করেছেন। তৃতীয় নাবীই প্রকৃত অর্থে সহধর্মিণী, যেমন তাঁর জীবনে তেমনি তার চলনে বলনে। বেবীর কথাতেই তার ইঙ্গিত রয়েছে— 'মা আব বাবা দুজনেই নেশা করত। প্রথমে আমাদের লুকিযে খেত, পবে এমন হল যে আমাদের দেখে আর লুকোয় না, নিজেরা হাসাহাসি করতে করতে খেত'। সমাজদেহের এ ভাঙনের ছবি একুশ শতকে শুধু নিম্নবিত্ত পরিবাবেরই নয়, অনেক উচ্চবিত্তেব মর্যাদার স্মারক, যা ভাবতীয সমাজ-সংস্কৃতির পরিপন্থী।

বারো বছর দশ মাস বয়সে বেবীর বিয়ে হয় ছাব্বিশ বৎসরের শঙ্করের সাথে। যদিও বেবী বলেছেন 'বিয়ে কাকে বলে জানতাম না। শুধু জানতাম বিয়েতে খুব ধুমধাম হয় অনেক লোকজন আসে। কত বাজনা বাজে কত আনন্দ হয় আমি এই জানতাম'। একই সুর রাসসুন্দরীর মধ্যে। তবে রাসসুন্দরীর এ ভাবনা বালিকা বয়সে আর বেবীর রজঃস্বলা হবার পর। বিশ শতকের শেষপ্রান্তে এ বয়সে বিয়ে সম্পর্কিত অনভিজ্ঞতার স্বীকারোক্তিকে মান্যতা দিতে কষ্ট হয়। বেবী ও শঙ্করের বিয়ে তো পরিবার-নির্দিষ্ট এবং স্বীকৃত যৌনসম্পর্ক। কারণ তাদের সম্পর্কে প্রেম-প্রণয়, সহযোগিতা-সমঝোতা তো ছিল না, ছিল না স্বামী-স্ত্রীর একান্ত আলাপচারিতা। শুধু একই ছাদের নিচে পাশাপাশি অবস্থান। সন্তান তৈরির যন্ত্র তো ব্যবহার্য উপাদান, তাই তাঁর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। কাজেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেবীর মন্তব্যে 'তেড়ে তেড়ে মারতে আসতো'। কথায় আছে 'ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই'।

সংসারে নারী প্রতিবাদহীন শ্রমশক্তি। এ শ্রম তাঁর নিয়তিনির্দিষ্ট ; এর কোনও মূল্য নেই, কাজেই স্বীকৃতিও নেই। বেবী তো স্ত্রীর মর্যাদা পাননি, তিনি ছিলেন বিনে মাইনের বাঁদি, নিষ্ঠুর নির্লজ্জ, সন্দেহপরায়ণ এই লোকটির সঙ্গে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়েছেন বেবী, আপস করে চলতে চেষ্টা করেছেন শুধুমাত্র মেয়ে বলেই। 'প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যে রকম যথার্থ প্রণয়' কোনোদিন হয়নি বা হবার নয় সেরকম অপমান ছুঁড়ে দিতে চেয়েছে শঙ্কর বেবীর দিকে। একে একে তিন সন্তান জন্ম নিয়েছে তাঁর গর্ভে 'বারে বারে

আমাকে সন্তানবতী করেছে পুরুষ'। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বেবী জানিয়েছেন—'এক বিছানায় শুই কিন্তু আমি বেমুখ করে।... তারপর একদিন আমাকে ও নিজেই জোর কবে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল।... হঠাৎ ওর শরীরের সাথে আমার শরীর মিলাতে চেয়েছে। আমি ভয়ে চিৎকার করেছিলাম। আবার ভাবছি এইভাবে যদি চিৎকার করি তাহলে এত রাতে সবাই জেগে যাবে, তখন আমি চোখ মুখ বন্ধ করে ও যা করছে সব সহ্য করে গেলাম'। বলপূর্বক যৌনসঙ্গমকে বলা হয় ধর্ষণ। আই. পি. সি তে বলা হয়েছে—

> "Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not beings under fifteen years of age is not rape."[৪]

সম্প্রতি অন্য একটি আইনে বলা হয়েছে— স্ত্রীর বয়স যাই হোক না কেন তার ইচ্ছার বাইরে রতিক্রিয়া করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। ১৫ বৎসরের কম বয়সি বেবীর সঙ্গে শঙ্করের যৌনসঙ্গম বলপূর্বক, যা ধর্ষণেরই নামান্তর। এখানে প্রেম নেই ভালোবাসা নেই, আছে শুধু প্রয়োজনের তাগিদ, শরীরী তৃষ্ণা এবং অধিকার ফলানোর দুর্দমনীয় চেষ্টা। 'প্রেম নয়, শ্রদ্ধা নয়, অধিকার নয়, নারী শুধু প্রয়োজনের' তাই সন্তান-সম্ভবা অবস্থায় অসহনীয় যন্ত্রণায়ও স্বামীর সাহায্য-সহানুভূতি পাননি তিনি, পেয়েছেন শুধু বিরক্তিভরা দৃষ্টি, কটূক্তি এবং নিস্পৃহ উদাসীনতা। ১৪ বছর বয়সে প্রথম সন্তানের জন্ম জন্মাষ্টমীর রাতে। প্রসবকালীন যন্ত্রণায় কিশোরীটির পাশে কেউ ছিল না। হাসপাতালে রেখেই চলে এসেছিল সবাই। সন্তান তৈরির যন্ত্রের জন্যে সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে চায়নি কেউ। পোষা জন্তুর জন্যেও মায়া জন্মায়, কিন্তু নারী তো তারও চাইতে নিকৃষ্ট, প্রাণহীন জড়পিণ্ড, যাকে ব্যবহার করা যায়, প্রয়োজন সাপেক্ষে ত্যাগও সম্ভব।

> 'A woman, a horse and a hickory tree
> The more you beat'em the better they be'[৫]

তুলসীদাসও বলেছেন—

> 'ঢোল গাঁওয়ার শুদ্র পশু নারী
> ইয়ে সব হ্যায় তাড়ণকে অধিকারী'[৬]

পিতৃতন্ত্র তো এ ধারণারই বশীভূত। এমনকী পিতৃতন্ত্রের ঘেরাটোপে আবদ্ধ নারীর ধ্যান-ধারণাও অনেকক্ষেত্রেই পুরুষায়িত। সেই ধারণাকৃত উপলব্ধি নিয়ে বেবীরও ভাবনা 'মা বাবা যখন দিয়েছে যার হাতে তখন মরি বাঁচি তার কাছেই থাকতে হবে'।

ছেলেদের পড়াশোনার খরচ চালাতে গিয়ে নিচু শ্রেণির ছাত্র পড়ানোর কাজ, পরে পরিচারিকার বৃত্তি অবলম্বন করেন তিনি। হালদারবাবুর মেয়ে হিসেবে দ্বিধান্বিত মনোভাব নিয়েও বাধ্য হয়েই তিনি এই কাজ নির্বাচন করেন। গৃহকর্মে তিনি ছিলেন পটু তাই ভালো কাজের জন্য তাঁকে নিয়ে চর্চা হত ঘরে ঘরে। স্ত্রীর পরিচারিকা বৃত্তি অবলম্বনে স্বামী সম্মতি-না জানালেও অসম্মতি প্রকাশ করেননি। 'আমার দেখে মনে হত আমি যে বাইরে কাজ করছি তাতে ওর ভালই হচ্ছে, ও খুব খুশি'— বলেছেন বেবী। বড়শোল গ্রামের জনৈক বৃদ্ধার মুখফেরতা ছড়ায় রয়েছে এ মনোভাবের প্রতি এক শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত—

'ধন্য পইসারে/পইসা নাই যার/বিথাই জনম সংসারে,/
পইসা এমন বলকারী/কুনেব বউবে বাইব করে'।[৭]

সমস্ত পুরুষ সেই আদি পিতা, নিষ্ঠুর অশুচি

অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনাব মধ্যেও বেবীর একমাত্র উদ্দেশ্য সন্তানদের শিক্ষাদান। প্রতিবেশী ষষ্ঠীর মার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অপরাধে পাথরেব আঘাতে রক্তাক্ত করতেও তাঁর স্বামী দ্বিধান্বিত হয়নি। এখানেই শেষ নয়, পাল্টা প্রশ্নেব জবাবে সন্তানসম্ভবা চারমাসের গর্ভধারিণী বেবীর কোমরে আঘাত করে সে। এ ঘটনার পর পেটের যন্ত্রণায় প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে বেবী, তার গর্ভপাত হয়। এক্ষেত্রে আঘাতকারীর কোনো অনুশোচনা হয়নি। এমনকী প্রতিবেশীর বাড়িতে পুজোর অঞ্জলির সময়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই সে বেবীর চুলের মুটি ধরে বলে, 'আয় শালি, ঘরে তোর মজা দেখাচ্ছি'। এতসব ঘটনার পরও বেবী স্বামীগৃহ ত্যাগ করেননি। বলেছেন— 'মার খাই, কষ্ট পাই, সুখ পাই বা না পাই এখানেই পড়ে থাকতে হবে। কি করব কোথায় যাব, ছেলে-মেয়ে নিয়ে যাবই বা কোথায়?' সত্যিই তো নারীর নিজস্ব কোনো বাসস্থান নেই। জন্তু জানোয়ারের জন্য বন জঙ্গল আছে, নারীর জন্যে তো খোলা আকাশও নেই। 'A room for her own'-এ ভার্জিনিয়া লিখেছেন, 'It is far more difficult to murder a phantom than a reality'[৮]। প্রায় একই সুর রোকেয়ার কণ্ঠে—

> "... অধিকাংশ ভারতনারী গৃহসুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপবের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাটীতে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়।"[৯]

সত্তর দশকের কবি কৃষ্ণা বসুর মধ্যেও এই অপ্রাপ্তির জন্যে খেদোক্তি—

> "বিয়ের আগের বাড়ি, বিয়ের পরের বাড়ি,
> বলো কোন বাড়ি আমার নিজেব অধিকারে?
>
> *   *   *
>
> মাগো, বলে দাও, আমার নিজের বাড়ি কোনখানে আছে?
> মেয়েদের নিজেদের বাড়ি থাকে কোনোদিন?"[১০]

মাথা গোঁজার ঠাঁই-এর জন্য বেবীকে আপস করে চলতে হয় সবার সঙ্গে, সবকিছুর সঙ্গে, সর্বাবস্থার সঙ্গে। কখনো দোষারোপ করেন নিজেকে 'ও যেটা চায় আমি সেটা কেন পারি না। আমি সেইভাবে চলতে কেন পারি না'। আবার বলেন— 'আমার খুব লজ্জা হত, অপমান লাগত, ভাবতাম আমি কি মানুষ না জানোয়ার যে আমার সাথে এরকম করে।' নারীর ব্যতিক্রমী পদচারণা, উপস্থিতি পুরুষতন্ত্রের স্বীকার্য নয়। নির্দেশিত সীমারেখা অতিক্রম করলেই বিপত্তি। জল ভরার উদ্দেশ্যে পুকুরঘাটে যাওয়ার সময়ে পুরুষদের সঙ্গ নেওয়া— এই ছিল বেবীর অপরাধ। আর এ অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে চিরাচরিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ নির্যাতন। সমাজতাত্ত্বিক মুরে স্ট্রসের মতে 'দি ম্যারেজ লাইসেন্স ইজ এ হিটিং লাইসেন্স'।[১১] মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন, 'আদিবাসী সমাজ আমাদের তথাকথিত

সভ্য সমাজের থেকে অনেক সভ্য, কারণ সেখানে ধর্ষণ নেই, যৌতুক, খুন নেই, একতরফা বউ পেটানো নেই'।[১২]

কিন্তু একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় বেবীর। সিদ্ধান্ত নেন, 'ওর ঘরে আর ফিরে যাব না'। লাঞ্ছনা অবমাননার সজল ধারায় বহুদিন ধরেই পরিপূর্ণ ছিল পাত্র যা অল্পেতেই উপচে উঠল। তিনটে ছেলে-মেয়ে নিয়ে অসহায় অবস্থায় পিতার সাহায্য তো দূরের কথা, সামান্য সহানুভূতিও তাঁর জোটেনি। এ-সময়কার অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত বাবার সুবিধাবাদী মনোভাবের কথা জানিয়েছেন বেবী— "বাবা বলল, 'তুমি ওর ঘরে যদি না যাও তাহলে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও'। সহায়সম্বলহীন অবস্থায়ও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে ছিলেন অনড়। বলেছেন— 'আমি আর ওর ঘরে যাব না, এইবার আমাকে যদি ওর ঘরে যেতেই হয় তাহলে আমি আর এই দুনিয়াতে থাকব না'। এখানেই বেবীর ব্যক্তিসত্তার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়। এ জয় শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের জয়, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের জয়, প্রতাপের বিরুদ্ধে নিজস্বতার জয়। মনে পড়ে 'আমিই সেই মেয়ে'র কথাগুলো— এক পৃথিবী লিখব বলে/ঘর ছেড়ে সেই বেরিয়ে গেলাম/সঙ্গী শুধু কাগজ কলম../যখন যারা আসবে মনে/তাদের লিখব লিখেই যাব/এক পৃথিবীর একশ রকম স্বপ্ন দেখার/সাধ্য থাকবে যে রূপকথার/সে রূপকথা আমার একার'।[১৩]

দারিদ্র্য-কবলিত সংসারে অনেকসময়েই মেয়েরা রুটি রোজগারে এগিয়ে আসে। বেবীও সংসারে একটু স্বচ্ছলতার জন্য, নিজের হাতখরচের টাকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়েদের সামনে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাব স্বপ্নে ন্যূনতম শর্তে কাজ নিতে বাধ্য হয়েছেন। পিতার পরিচয়, সম্মান, মর্যাদার কথা মনে রেখেও নিরুপায় বেবী পরিচারিকার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শঙ্কর তাঁকে সংসারের যাঁতাকলে সামান্যতম মর্যাদা দিতে চায়নি। দুর্বিষহ দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছেন কখনো টাকা, কখনো চাল কিন্তু স্বীকৃতির বেলায় নৈব নৈব চ। সেদিক দিয়ে বিশ্বায়নকৃত বাজার তাঁকে মুক্তির আলো দেখিয়েছে। নারীর শ্রমকে প্রকৃত শ্রমের স্বীকৃতি না দিয়ে, প্রতিবাদ না করে মুখ বুজে কাজ করার চিরায়ত ভাবনাকে মূলধন করে মুনাফা লাভের অপচেষ্টা চলছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। তথাপি সামান্য হলেও কাজের একটা মূল্য তিনি পেয়েছেন। আর এই স্বাবলম্বী মনোভাবই শেষ পর্যন্ত তাঁকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করেছে। "Finds unity where the cultrue propagates division, between a women's sexuality and her spirituality; her creativity and her procreativity, herself and other women, her private and her public self."[১৪] — নারীকে বশীভূত রাখার পিতৃতান্ত্রিক কৌশল থেকে মুক্তির জন্যই নারী ছুটে চলে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে। বেবীও এ মুক্তি অন্বেষণেই ছুটে যান স্বামীর বাড়ি থেকে অন্য আশ্রয়ে।

আমি তো শিখিনি মাতা রমণীয় পশ্চাদ্‌পসরণ

আলো-আঁধারিতে প্রকাশক বলেছেন, 'আমাদের সামনে কতকগুলি প্রশ্ন ছিল। যেমন, বইটির ভাষা আদৌ পরিবর্তন করা উচিত কি না। বানানের সমতা রাখা, গুরুচণ্ডালী দোষ দূর

করা, ইত্যাদি নিয়েও বিতর্ক ছিল।... আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে বানান ঠিক রাখা আর সামান্য যতিচিহ্ন দেওয়া নেওয়া ছাড়া অন্য কোনোভাবে আমরা বেবীর লেখাতে হাত দেব না। ফল কি হয়েছে তা পাঠকরাই বিচার করবেন'। সম্পাদনা ও সংশোধনের স্পর্শমুক্ত এই বয়ান পাঠকদের নিঃসন্দেহে এক বিশেষ প্রাপ্তি। ক্লাশ সেভেনে পড়া বিদ্যা নিয়ে একটা মেয়ে কী অনায়াস গদ্যে আপন কথাকে নির্দ্বিধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পেবেছেন ভাবলে অবাক লাগে। প্রান্তিক গোষ্ঠীর মুখের ভাষা এবং আমাদের ব্যবহৃত ভাষার রূপ, রং এক নয়, তাই সাহিত্যে লেখক সেই ভাষাকে ব্যবহার করেন শুধুমাত্র লোকাল কালার অর্থাৎ স্থান-কাল-ভাষা-পরিবেশের সৌন্দর্য বোঝাতে, স্থানিক মাহাত্ম্যকে তুলে ধরতে। আলো আঁধারিতে বেবী মুখের ভাষারই অপরিবর্তিত রূপকে লিখিত ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন। সহজ সাবলীল গদ্যে দৈনন্দিন ব্যবহার্য শব্দ নিয়েই আলো আঁধারি আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পেরেছে। 'টাইমে আমাদের খেতে দিত না'; 'যাও যাও উপেনভাই ওকে এবার মানাও গিয়ে'; 'জ্যাঠা কোনদিন মেয়েদের অভালবাসা দেয়নি'; 'বেবী নিজের শৈশবকে চাটে', 'যেমন নবজাত বাছুরকে ওর মা চাটে'; 'আমি একজনের বন্দিতে পড়ে আছি'; 'খুশিতে খসে পড়ছি'; 'ছেলে আওয়ারার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে'; 'আবার দেখেছি কাহানিও লেখে'— ব্যবহার্য শব্দসমষ্টি প্রতিদিনকাব ব্যবহারে মলিন, অথচ বেবীর আত্মপ্রকাশে তা আন্তরিকতায় পূর্ণ। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, তাঁর আত্মস্মৃতির আঙ্গিকে এক নতুনত্বের আভাস। যদিও এ কৌশল তাঁর আয়ত্তীকৃত বা স্বেচ্ছাকৃত নয়, নিজের অজান্তে আপন গতিবেগেই তার স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক শব্দচয়ন। কখনো 'আমি' হয়ে সত্তার বহিঃপ্রকাশ আবার অপরসত্তার দৃষ্টি নিয়ে বেবীকে পর্যবেক্ষণেব সময়ে বেবী 'সে' হয়ে কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষের জবানিতে আপন কথাকে মুক্তি দেবার এ প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে বোধহয় প্রথম।

প্রান্তিক পরিধি থেকে সত্তার উন্মোচনের ক্ষেত্রও প্রান্তিকায়িত। ডরোথি কাউফম্যান ম্যাককলও বলেছেন—

> "Woman has always been sobordinate to man. Second, Woman have internalized the alien point of view that man is the essential woman the inessential "[১৫]

কাজেই প্রতাপের নিষ্পেষণ, কৃৎকৌশলের একপেশে রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যেই রয়েছে বেবীর আত্মোন্মোচন; আর এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। প্রসঙ্গত প্রান্তিক সমাজের আরেকজন মেয়ের কথা মনে পড়ছে এখানে— কৃষ্ণা লোধ, বইয়ের নাম 'প্রান্তিক সমাজ এবং একটি কালো মেয়ে', বইটি প্রবন্ধের সংকলন, আত্মজীবনী নয়। রোকেয়ার মতো কৃষ্ণাও আত্মজীবনী লেখেননি কিন্তু সমাজ ও দেশ সম্পর্কিত আলোচনায় অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের কথাই উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। প্রান্তিক অবস্থানে থেকে একজনের বর্ণনায় আছে ব্যক্তিক জীবনের দৃশ্যপট, অন্যজনের বর্ণনায় জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি জনিত ভাবনা। অবস্থান এক হলেও কথনভঙ্গি ভিন্ন, লিখনপ্রক্রিয়া বা লিখনশৈলীতেও রয়েছে

পার্থক্য। আত্মজীবনী রচনার গতানুগতিক কৌশলকে পিছনে ফেলে এ এক নতুনতর উদ্ভাবন। যেন আত্মজীবনী রচনার দুই প্রকারভেদ। লক্ষণীয় যে, ভিন্ন অবস্থানে থেকে ভিন্ন কথনশৈলীকে আত্মস্থ করেও তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য হল (১) উভয়েই প্রান্তিকায়িত (২) উভয়েই নারী অর্থাৎ নিম্নবর্গীয়। উভয়ের বয়ানে রয়েছে প্রান্তিকায়িত গোষ্ঠী হিসাবে শোষণ, নারী হিসাবে পুরুষতন্ত্রের অবদমন এবং নিম্নবর্গীয় বলে প্রতাপের যুক্তিশৃঙ্খলা। সামাজিক বিন্যাসে এই ক্ষমতার চাপ স্বাবলম্বী হবার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে নিজেদের বশীভূত করে তুলতে প্রয়াসী হয়। কৃষ্ণা বা বেবী সেদিক দিয়ে সংগ্রামী এবং ব্যতিক্রমী নারী। এর পেছনে আছে নিজেদের কঠিন মনোবল, অনড় সিদ্ধান্ত এবং অনুকূল পরিস্থিতি। আর্ডেনার (Ardener 1977) মনে করেন, মেয়েরা নিজেদের কথা সরাসরি বলতে না-পারাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। স্বামী, সন্তান, পরিবার-পরিজন, সমাজ-সংস্কারের গণ্ডি অতিক্রম করে নিজেদের কথা বলা আর তাঁদের হয়ে ওঠে না। সেদিক দিয়ে বেবী বলেছেন একান্তই আপন কথা, নিজের ভালোলাগা-মন্দলাগার কথা, প্রথম রজঃস্বলা হবার অনুভূতির কথা, গর্ভপাতকালীন অবস্থার কথা, মা বাবার দায়সারা মনোভাবের পাশাপাশি শ্বশুরবাড়ির ভালোবাসার কথা— সবকিছুই বলেছেন অনায়াস অকপটে, সত্য ভাষণে কোনো আড়ষ্ঠতা প্রকাশ পায়নি। সর্বোপরি তাঁর বয়ান বিশ একুশ শতকের সন্ধিক্ষণে নিম্নবর্গীয় নারীর প্রকৃত অবস্থানের সূচক। সত্যকে ঢাকনা খুলে আলোর মুখ দেখিয়েছেন বেবী। হাতে বাতি নিয়ে আঁধারকে অপসারণ করতে চেয়েছেন। 'ছোট আমি'র আড়াল ভেঙে 'বড় আমি'র প্রকাশ ঘটেছে ছায়া থেকে কায়ায়, ভিতর থেকে বাইরে, অন্ধকার থেকে আলোয়। প্রকৃত অর্থেই আলো আঁধারি আঁধার থেকে আলোর পথে যাত্রার অন্যনাম।

'যেখানেতে অগাধ ছুটি মেল সেথা তোর ডানাদুটি
সবার মাঝে পাবি ছাড়া
আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'

(রবীন্দ্রনাথ)

নবম অধ্যায়

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে

উপসংহার

"কী আমাদেব জাত আর ধর্মই বা কী
মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়ে দু'চোখ মেলেছি
মানুষ হয়ে বাঁচব সবাই— লড়াই চালাচ্ছি"[১]

নারীর প্রতি বৈষম্য আবহমানকাল ধবে— কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট, লিঙ্গ-বৈষম্য কায়েম করার চক্রান্তে ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মপ্রবক্তা, ধর্মীয় অনুশাসনের ভূমিকাও অনবদ্য। ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিতে নারীর পরিচয়: 'নারী নরকের দ্বাব'। পাশাপাশি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নিত্যনতুন প্রকৌশলে অর্থনীতির ভূমিকা আজো অব্যাহত। নারীর পরিচয়-হয় সে বিকৃত, নয় সে বিক্রীত।

বহমান ইতিহাসের প্রেক্ষাপট অনুধাবনে স্পষ্টই বোঝা যায়, নারী শুধু অবহেলিতই নয়, নারীর কোনো সত্তাই স্বীকৃত নয়, কাজেই সে মানুষ নয়, ঊনমানব; যাকে চালনা করবে প্রাণচঞ্চল জীবনীশক্তিতে ভরপুর, ব্যক্তিসত্তার অধিকারী মানুষ — বকলমে যিনি পুরুষ। আর সে-ক্ষেত্রে উপনিবেশীকৃত মনের অধিকারী নারীর ধারণায় পতিসেবা বেদাধ্যয়ন, পতির পুণ্যে স্বর্গবাস। অর্থাৎ নারীর জগৎ চার দেওয়ালের গণ্ডিতে গৃহকর্ম, পতিসেবা এবং সন্তানধারণ ও পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীর এ অবস্থা 'অবরোধ প্রথা'য় আখ্যায়িত। এরই মধ্যে বস্তু থেকে ব্যক্তিস্বরূপে দেখার আকাঙ্ক্ষায় নারীর চেতনার জগতে ওঠে আলোড়ন, পিঞ্জরাবদ্ধ নারী খোলা আকাশে বেরিয়ে আসার তাড়না বোধ করেন— 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে'। কেউ বা অবরোধকে মেনে নিয়েই সবার অলক্ষ্যে নিজের অভীপ্সার সাকার রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন, শাস্ত্রের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে। কেউ বা নির্দেশিত সীমারেখা লঙ্ঘন করে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হলেন সমাজ-সংসারকে পেছনে ফেলে। লিখলেন আত্মকাহিনি, যে অভিজ্ঞতা আজ সমাজ-ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। এই আত্মকথা-স্মৃতিকথায় লুকিয়ে আছে মেয়েদের নিজেদের কথা, সময়ের অভিঘাতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথা। ধূসর স্মৃতিকে অবলম্বন করে লেখা এই আপনকথায় অপ্রাপ্তি, হতাশা, দীর্ঘশ্বাসের গোপন কথাটি গোপন থাকেনি। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপ ও যুক্তিশৃঙ্খলাকে নিগড় বলে বোধ হয়নি, নিয়ম বলেই মেনে নিয়েছিলেন অনেকে, কারণ একদিকে সমাজ, সংসার তথা শাস্ত্রের শাসানি, পাশাপাশি ছিল নিজস্ব চাহিদার ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ। তাই নিজের সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত সময়ে

মেয়েদের সুযোগসুবিধা দেখে আহ্লাদিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনীকার রাসসুন্দবী উনিশ শতকে বলেছেন— 'এখনকাব মেয়েছেলেগুলা যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়'। আর বিশ শতকে বাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আশালতা সেন, নারীমুক্তি আন্দোলনে যাঁর ভূমিকা অভূতপূর্ব, মেয়েদেব দেখে তিনি বলেছেন, 'মেয়েরা আজকাল যে স্বাধীনতা, যেসব সুযোগ-সুবিধা পাবাব কথা ভাবতে পাবছে,... এসব ৮০/৯০ বছর আগে কল্পনা করা যেতে পাবতো না'। দুজনের কণ্ঠেই একই ভাবনাব, একই সুরের অনুরণন। যুগ পাল্টায়, পাশাপাশি চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, মানসিকতায় আসে পরিবর্তন। যে আচরণ উনিশ শতকের রক্ষণশীল সমাজের কাছে অসহনীয়, ঔদ্ধত্য ছিল, পরবর্তীকালে তা-ই হয়ে ওঠে প্রগতিশীলতার পরিচায়ক।

বিশ শতকে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সর্বজনীন বিরোধিতার পরিবর্তে এল সমর্থন। তাই আশালতা রাসসুন্দরীর মতো নারীশিক্ষার ব্যাপ্তি দেখে আহ্লাদিত হননি, তিনি আনন্দিত হয়েছেন স্বাধীনতা দেখে। কারণ তখন থেকেই নাবীমুক্তি-চেতনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে সমাজ-মানসিকতায়। তবে উনিশ শতকে নাবীশিক্ষা ভাবিত করে তুলেছিল যে সমাজকে — ভদ্রলোকের জাত থাকবে না, মেয়েছেলেতে পুরুষেব কাজ করবে— এই চিন্তায; বিশ শতকে নারী-স্বাধীনতা দেখে সেই সমাজেব মনে কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয়নি, তা বলা যায না। মূলত ১৯ এবং ২০ শতকের চরিত্র পুরোপুরি ভিন্ন, সে-ক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরণ বা প্রতিক্রিয়া অস্পষ্ট অনুচ্চার্য, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন।

একুশ শতকে অনুরূপা যখন বলেন, 'পথে পথে রক্ত দিয়ে মুক্তিস্বপ্নের আলপনা রেখে গেছে এ মাটীর কল্যাণী অনন্যারা' তখন মনে হয় আমাদের পূর্বমাতৃকাবা যে স্বপ্নলব্ধ স্বাধীনতায় প্রত্যাশী ছিলেন, অনেক প্রাপ্তির মধ্যেও আমবা কি তা পেয়েছি?

এ শতকেরই সুচিত্রা ভট্টাচার্য, মল্লিকা সেনগুপ্তেব কণ্ঠে শোনা গেল আশঙ্কা ও হতাশার সুর। সুচিত্রার ধারণায় অধিকাংশ শিক্ষিত নারীর মধ্যেই রযেছে সচেতনতার অভাববোধ। তাই মুক্তি শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা তাঁরা অবগত নন। তাঁর বিশ্বাস—

> 'মুক্তি মানে চেতনার উন্মেষ। মনুষ্যত্বের জাগরণ। আত্মার স্বরূপকে অনুভব করা। একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে অন্তরে মানবিকতাবোধকে উদ্দীপিত করার নামই মুক্তি।'[২]

আর মল্লিকাও যে দ্বিধান্বিত তা তাঁর বয়ানেই স্পষ্ট—

> "...... দিকে দিকে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার হাতছানি, ক্যাটওয়াকের করিশমা। এগুলি মোটেই খারাপ কিছু নয়— মেয়েগুলা প্রজাপতি হয়ে উঠছে, দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য, সত্তার স্বাধীনতার চেয়ে দৈহিক সৌন্দর্য যদি বেশি গুরুত্ব পায়, খারাপ লাগে।'[৩]

সমালোচক চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> 'মেয়েরা থামবে না, তারা এগিয়ে চলবে প্রাণধর্মের স্বতঃস্ফূর্ততায়।... বাধা তো শুধু বাইরের নয়, বাধা যে রয়েছে তার অন্তরে হৃদয়গত সংস্কারে, ভাবনায়— তার থেকে

মুক্তি পেতে হবে তাকে। অন্বিষ্ট 'আমি' কে খুঁজে পেতে গেলে অতিক্রম করতে হবে যে নিজেকেই।'[৪]

প্রয়াত অধ্যাপিকা শর্মিলা বসু দত্ত, ১৪.১০.৮৬-তে 'থার্টি সিক্স চৌরঙ্গি লেন', 'পরমার' পরিচালক অপর্ণা সেন সম্পাদিত বাংলা পত্রিকা 'সানন্দা' নিয়ে হতাশা গোপন রাখতে না পেরে একটা চিঠিতে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন কবেছেন—

''কেন আমরা শিক্ষা দেব না একটি মেয়ের ব্যক্তিত্ব কতভাবে বিকশিত হতে পারে, কতভাবে সে শিক্ষিত করে তুলতে পারে নিজেকে? কেন আমরা লোকায়ত জীবনের গভীরে অনুসন্ধান চালাব না যেখানে মেয়েদের শক্তি স্ফুরণের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়? কেন আমরা মেয়েদের আত্মনির্ভবতা, আত্মরক্ষার শিক্ষা না দিয়ে রূপের ডালি সাজিয়ে পুরুষ-নারীর খাদ্য-খাদক সম্পর্ককে আধুনিকতার শরীরবিলাসী ভড়ং-এ ঢেকে কীভাবে জিইয়ে রাখা যায় তাকেই প্রশ্রয় দিয়ে আসব?''[৫]

তাঁরা প্রত্যেকেই বিস্মিত নারীস্বাধীনতার লেবেল লাগিয়ে নারী আচরণের স্বরূপ দেখে। সমাজের একদিকে যখন চলছে লিঙ্গ-বৈষম্যের নির্লজ্জ খেলা, অন্যদিকে চলছে লিঙ্গ-পার্থক্যকে মূলধন করে স্বেচ্ছাচারের প্রতিযোগিতা। চরম এবং অভ্রান্ত সত্য হল, একুশ শতকের নারীস্বাধীনতার নামান্তরে স্বেচ্ছাচারের ভয়ঙ্কর চেহারা— নারীমুক্তি আন্দোলনের বিপথগামিতার দিক, যা বিরূপ সমালোচকদেব কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনেব বিরাট সুযোগ। যুগ পাল্টেছে, যুগের চেহারাতে পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু বৈষম্য বা সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই অতি সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞাপন, মিডিয়া, সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতা, রূপচর্চা ও ফ্যাশনের মধ্য দিয়ে অর্থনীতিকে মজবুত ও বাজারজাত করার এক ধূর্ত কৌশল চলছে— এসব কিছুই এক প্রহসন। আর এই প্রহসনের ফাঁদে পা দিয়ে মডার্ন-এর শিরোপা নিয়ে নারী নিজেকে স্বেচ্ছায় পণ্য করে তুলছে। বোঝাই যাচ্ছে, সমস্যা বা বৈষম্যের শুধু স্বরূপ পাল্টেছে, যে স্বরূপ বা বৈষম্যের জন্য দায়ী পুরুষতন্ত্রের তল্পিবাহক নারী-পুরুষ উভয়েই। পাশাপাশি চলছে নারীমুক্তি আন্দোলন, প্রক্রিয়া-পরিকল্পনা, তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু আমরা যে-তিমিরে ছিলাম সেখান থেকে আলোর পথে যাত্রা করেছি ঠিকই কিন্তু ঈর্ষণীয় উত্তরণ হয়নি। অভ্যস্ত জীবন থেকে অনভ্যস্ত পথে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছি বারবার, অনবধানবশত আঘাতগ্রস্ত হতে হচ্ছে প্রতিবার। কারণ সচেতনতার অভাব, ঔচিত্যবোধের অভাব, সর্বোপরি মনুষ্যত্বের অভাব। বর্তমান প্রজন্ম শিক্ষিতের উপাধি নিয়েও তাদের চিন্তা-চেতনা মিথ্যা ভ্রমে আচ্ছন্ন। শিক্ষার অঙ্কুর ওদের মস্তিষ্কে এমনভাবে কর্ষণ হয় যাতে করে তাদের বোধগম্য হয় না কোন স্বরটি তাদের নিজের আর কোনটি অপরের। চিন্তায় স্বচ্ছতার অভাববোধই তার প্রকৃত কারণ। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামী মনোভাব তাদের নেই। অর্থাৎ একুশ শতকে অধিকাংশ নারীই কুসংস্কারের জগদ্দল বোঝা মাথায়-মনে সযত্নে বহন করে শারীরিক মুক্তি ঘটাতে পেরেছেন, মানসিক মুক্তি তাদের ঘটেনি। তাই আজও অঘটন ঘটেই চলেছে প্রতিনিয়ত। মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথা সতীদাহের সংশোধিত সংস্করণ বধূহত্যা, একইভাবে পণপ্রথার ক্ষেত্রে

স্বেচ্ছায় মেয়েকে দান; তবে এ-যুগের একটা নতুন সংযোজন ধর্ষণের মাত্রাতিবিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি। অন্দরমহলেব ঘেরাটোপে জীবনাবদ্ধ নারীর মনুষ্যত্বের অবমাননা তথা অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভের পবও কেন তার অস্তিত্ব তথা ব্যক্তিত্বের সংকট? এর জন্যে দায়ী কে? এক্ষেত্রে সুকুমারী ভট্টাচার্যের অভিমত—

> "আড়াই হাজার বছর ধরে যে-জীবনকে সমাজ নিপীড়ন করে এসেছে, তার মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে, সে আজ রুখে দাঁড়াচ্ছে! লড়াই করে অর্জন করে নিচ্ছে নিজের প্রাপ্য অধিকার। তাই আজ যে শুধু ফণা তুলেই বসে থাকবে না, দু-চারটি ছোবলও দেবে— এটাই তো স্বাভাবিক। আমি স্থিতি (Thesis), প্রতিস্থিতি (Anti-thesis) ও সংস্থিতির (Synthesis) তত্ত্বে বিশ্বাস করি। স্থিতির যুগ পেরিয়ে এখন এসেছে প্রতিস্থিতির যুগ, প্রতিবাদের যুগ। তাই আজ নারী এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠছে, কালের নিয়মে। এরপর একদিন কালের নিয়মেই সংস্থিতি আসবে। তখন পরিস্থিতি পাল্টাবে।... আর তখন 'আতিশয্য' নিয়ে বাদানুবাদের দিনও শেষ হবে।"[৬]

গবেষণাই যাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান আজকের বাদানুবাদ প্রসঙ্গ তাঁর কাছেও আলোচিত। এখনো যেহেতু সংস্থিতির যুগ আসেনি তাই বাদানুবাদ হযতো চলতেই থাকবে। প্রশ্ন জাগে এ অভিযোগ-অভিমান-আক্ষেপ কি অধিকাংশের মধ্যেই?

রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই দেশ ও জাতিগঠনে নারীর ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন। বিশ শতকের শুরুতে আত্মিক মুক্তির দাবিদার (Mental culture) রোকেয়ার কণ্ঠেও ছিল তাঁদেরই প্রতিধ্বনি। ঘুমন্ত নারীসমাজের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান— 'জাগ, জাগ গো ভগিনি'। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী না-হয়েও রোকেয়া যে-নারীর প্রতিকল্প তৈরি করেছিলেন, যাকে মুক্তি পেতে হবে নিজের চেষ্টায়, আর যে-মুক্তির জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, আত্মমুক্তি, আত্মনির্ভরশীলতা— শত বৎসরের ব্যবধানেও সেই মানসিকতার প্রতিফলন সুচিত্রা, মল্লিকা, চিত্রিতা, শর্মিলার মধ্যেও। নারী জেগে উঠলেন ঠিকই কিন্তু আজকের নারীসমাজ কি সেই আদর্শায়িত ব্যক্তিত্বের সমাবেশ? ব্যতিক্রমদের নিয়ে তো সমাজ নয়। তাই আজ একুশ শতকেও বৈষম্যের পাখা প্রসারিত, আর এর জন্য দায়ী কিছুটা হলেও নারীর পরস্পরবিরোধী অবস্থান। অনেক কিছু পেয়েও না-পাওয়ার বেদনা কখনো বা হারানোর ভয় শঙ্কিত করে তোলে আমাদের। হৃদয়ের মণিকোঠায় আলোড়িত প্রশ্ন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে বারবার— আমরা কি কোনোদিন রোকেয়া-সুচিত্রা-মল্লিকা-শর্মিলার সংজ্ঞায়িত নারীদের নিয়ে সুস্থ, সুন্দর, বৈষম্যহীন, সংঘবদ্ধ, উভলিঙ্গ সমাজ দেখতে পাব না?

'... এত কামনা, এত সাধনা, কোথায় মেশে
কি আছে শেষে পথের...'

(রবীন্দ্রনাথ)

পরিশিষ্ট ১

সুপ্রভা দত্তের ডায়েরি

প্রসঙ্গত আমি এখানে উল্লেখ কবছি বরাক উপত্যকাব এক মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ সুপ্রভা দত্তের ডায়েরি-র কথা। পূর্ণাঙ্গ ডাযেবিটি অপ্রকাশিত, তবে ডায়েরিটির অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল 'অক্ষববৃত্ত' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (আশ্বিন ২০০৩, করিমগঞ্জ)। ডায়েরিটির সময়সীমা খুবই কম, কিন্তু গুণগত বিচারে এর মূল্য অপবিসীম। উল্লেখ্য যে, দিন কয়েক আগে আমি আরেকটি ডায়েরির সন্ধান পেয়েছি। ডায়েবিটি প্রয়াত লীনা নন্দী মজুমদারেব[১]। ডায়েরিটি স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯৯০-৯১ ইংবাজীতে লেখা।

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর মতো ডাযেবি লেখার কোনও ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। মনোদা দেবীব 'সেকালের গৃহবধূব ডাযেবি' মূলত ডায়েবি নয, স্মৃতিচাবণ। সেদিক দিয়ে সুপ্রভা দত্ত ব্যতিক্রমী নারী। বরাক উপত্যকার প্রান্তীয় শহরের একজন সামান্য গৃহবধূ লিখেছিলেন দিনলিপি যা শুধুমাত্র মানবীচর্চাব দিক দিয়েই নয়, বিশেষ একটা সময়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তথ্যসূত্র হিসেবেও ডায়েবিটির গুবত্ব অপরিসীম।

ডায়েরি বিচারে ডায়েরিকারের অন্তর্দৃষ্টিই বড় কথা। সুপ্রভা দত্তের ডায়েরির সময়সীমা ৮ বৎসর, ১৩৩২ বঙ্গাব্দে যে লেখার সূচনা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে তার সমাপ্তি। লেখার স্থান শিলচর শহর এবং মৈমনসিংহ জেলার কিশোবগঞ্জ মহকুমার ইটনা থানার অন্তর্গত মৃগা গ্রাম। এই সমযেব মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ভয়ঙ্কর বন্যা, অংশগ্রহণ করেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, সভাসংসদে; দুঃখ করেছেন বিলাতি সাবান ব্যবহারের জন্যে। তাঁর ডায়েরিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণের পাশাপাশি রয়েছে গ্রামজীবনের খুঁটিনাটির সানুপুঙ্খ বিবরণ। দিনলিপির মধ্যে নিজেকে উন্মুক্ত করে তুলতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি তিনি। আর এখানেই তাঁব ডায়েরির বিশিষ্টতা। অথচ আশ্চর্যের বিষয় আজ পর্যন্ত ডায়েরিটি প্রকাশিত হয়নি। বছর কয়েক আগে এ ডায়েরি প্রকাশে যথেষ্ট তৎপরতা নজরে আসে। এমনকী নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জেনেছি ড. অরুণ বসু সে সময় ডায়েরিটির একটি মূল্যবান ভূমিকাও লিখেছিলেন। এতসব প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পর কেন এ ডায়েরিটি আজ পর্যন্ত প্রকাশের আলো দেখতে পেল না, তা ভেবে অবাক হতে হয়। পাশাপাশি প্রশ্ন জাগে, ডায়েরি সম্পর্কিত আলোচনায় নীরবতার রাজনীতির পেছনে কি সেই অজ্ঞাত কারণ, যা জনসমক্ষে প্রকাশিতব্য নয়? কে দেবে এই উত্তর? সময় না সমাজ?

সুপ্রভা দত্তের জন্ম ১৯০৫ খ্রিঃ। ব্রাহ্ম আদর্শ তাঁর পিতাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই তাঁর পরিবারে ব্রাহ্ম রীতিনীতি চালু ছিল। অন্যদিকে মা ছিলেন পূজা-আর্চায় বিশ্বাসী, তথাপি তাঁর পিতা কখনো তাঁর মাতার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। বোঝা যায় পারিবারিক পরিবেশের

মধ্যেই ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বীজ। বিবাহ পরবর্তীকালে দিনলিপি লেখার খাতাও স্বামীর কাছে উপহারস্বরূপ পান তিনি। শুধু তাই নয়, স্ত্রীকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করতে তিনি ছিলেন সহায়ক। ৫টি সন্তানের অকালমৃত্যুতেও এই মহিলার দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটেনি। এখানে রাসসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর মিল আছে। সন্তানের মৃত্যুর বিবরণ রাসসুন্দরীও লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু সুপ্রভা দত্তের মতো এত মর্মস্পর্শী বিবরণ অন্য কোথাও নজরে পড়েনি। আরেকটি বিষয়েও রাসসুন্দরীর সঙ্গে সুপ্রভার সাদৃশ্য রয়েছে; রাসসুন্দরী ছিলেন দয়ামাধবের কৃপাপ্রার্থী, অন্যদিকে সুপ্রভারও ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। তাঁর দিনলিপিতেও বারবার তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ার কথা বলেছেন। কখনো দিনলিপির শেষে লিখেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত সুপ্রভা'।

বরাক উপত্যকার নারীপ্রগতির ইতিহাসে সুপ্রভা দত্ত অগ্রণী। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে মহাত্মা গান্ধির গ্রেপ্তার সংবাদ প্রাপ্তির পর একটা শোভাযাত্রা করা সম্ভব কি না, তাঁরই মতো আরেক নারীর মুখে এ কথা সুপ্রভার মনঃপূত হয়নি। তিনি লিখেছেন—

> ''কথাটা আমার প্রাণে খুব বাজে এবং পাড়ার মধ্যে চেষ্টা করিয়া কংগ্রেস অপিসে আমি এই খবর জানাই।''[২]

এরপর লিখেছেন—

> 'শোভাযাত্রা হবে না স্থির ছিল, তার মধ্যে নারীগণের শোভাযাত্রা এবং সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করা। আনুমানিক দেড় সহস্র মানবের মহামিলনে শোভাযাত্রাটি এমন হইয়াছিল যাহা শিলচরবাসী কখনও দেখে নাই।'[৩]

দীর্ঘকাল ধরে পিতৃতন্ত্রের শাসনে থেকে নারী নিজের সত্তাকে চিনতে বা জানতেই পারেনি। নারী পুরুষের দ্বারা চালিত, তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা নেই, যা শুধু পুরুষতন্ত্রের কাছেই নয়, নারীর মধ্যেও দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে এরকম ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই অন্য আরেক নারীর মুখে 'শোভাযাত্রা বাহির করা যায় কিনা' কথাটা শুনে তাঁর নারীব্যক্তিত্বে আঘাত লেগেছিল, কেননা তার পৈতৃক বাড়িতেই তো ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বীজ। আর পরবর্তীকালেও তিনি পেয়েছিলেন প্রগতিশীল স্বামীর সহায়তা। এধরনের কথাবার্তা তো তাঁর কাছে ছিল আশার অতীত। ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে নারীর সবধরনের প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার যে দৃঢ় মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিল, তাতে করে এটা স্পষ্ট যে, বরাক উপত্যকার নারী-প্রগতির ইতিহাসে তিনি প্রথম সারির নেত্রীর আসনের দাবিদার।

নারীর প্রতিবেদনে অনুরণিত হয় যন্ত্রণাদগ্ধ নারীর ক্ষুব্ধ বয়ান, সমাজে তাঁদের অবস্থান। এঁদের মধ্যে অনেকেই নিজস্ব বক্তব্য, উপলব্ধি-অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা বলতে চেয়েও খোলাখুলি ভাবে বলতে পারেননি, অর্থাৎ সত্যকথন তাঁদের রচনায় কতটুকু রয়েছে, তা বিচার্য বিষয়। কেননা 'সব সত্য উচ্চারণের অধিকার নারীর নেই'। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে এবং একবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে ক'জন নারী নিজেকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করতে পেরেছেন? 'মেয়েরা আসে এ পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে'; ভয় না-থাকলেও সঙ্কোচবশত নারী অনেক কিছু বলতে পারে না। সহজাত কুণ্ঠাই সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। 'কিছু বলব বলে' এসেও অনেক কিছুই না-বলা থেকে যায়। সেদিক দিয়ে সুপ্রভা দত্ত একজন ব্যতিক্রমী নারী। বরাক উপত্যকার

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসেও তিনিই প্রথম মহিলা লোকসংস্কৃতিবিদ। প্রান্তীয় জনপদের প্রান্তিকায়িত এই বঙ্গললনা সমকালীন সমাজ-সংস্কার কেন্দ্রিক একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তা লিপিবদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁর ডায়েরিতে। রক্ষণশীল পরিবারে থেকেও তাঁর স্বচ্ছ মনন কলুষমুক্ত ছিল। কখনো মুক্ত হতে চেয়েছেন অশিক্ষিত আবেষ্টনী থেকে, কখনো বিদ্রোহী সত্তাকে সংযত করেছেন তিনি। ব্যক্তিসত্তা বারবারই নিজেকে প্রকাশ করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনের মধ্য থেকে তাঁর মনে হয়েছে—

> "হিন্দু ঘবের মেয়ে যূপকাষ্ঠে বাঁধা পশুর চেয়ে বেশী শক্তি রাখিতে পারে না।"[৪]

ঘরের মধ্যে রাখতে যে হয় বহুলোকের মন; কাজেই নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ বা সাহস কোথায়? পুরুষতন্ত্রের উপেক্ষা নারীর ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করতে বাদ সাধে। তাই তো সুপ্রভা দত্তের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা ব্যাহত হয়। তিনি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন সমাজের কোথায় তাঁর স্থান, তথা নারীদের অবস্থান, বুঝতে চেষ্টা করেন অপরসত্তা হিসেবে নিজের অবহেলিত জীবনকে, জানতে চেষ্টা করেন তাঁর পরিসরের পরিধিকে। সুপ্রভা দত্তের এই বিশ্লেষণী প্রতিভার জন্যই তাঁর ডায়েরি ব্যক্তিবচনার সীমা ছাড়িয়ে সর্বজনীনতার স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। আর এখানেই তিনি অসাধারণ, এখানেই তিনি অনন্য। এ প্রসঙ্গে ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্যের সুচিন্তিত মতামত উল্লেখ করা যায়—

> "আমাদের এই সমাজ ইউরোপের হোক কিংবা এশিয়ার হোক, আফ্রিকার হোক কিংবা আমেরিকার হোক, নারী মানে নারী অর্থাৎ মেয়েমানুষ। আগে মেয়ে পরে মানুষ। এইজন্যে মেয়েদের আগে মানুষ হওয়ার চেষ্টা করার যে দ্যোতনা, যে প্রয়াস, সেই প্রয়াসে কিভাবে যুক্ত হয়ে যায় সুপ্রভা দত্ত নাম্নী কোন এক এতদিনকার অজ্ঞাতপূর্ব মহিলার কণ্ঠস্বর, তা জেনে আমরা ঋদ্ধ হয়ে উঠি।"[৫]

সুপ্রভা দত্তের ডায়েরিতে নারীর ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক উচ্চারণের সম্মিলন ঘটে একটি যুগলবন্দীতে। পিছিয়ে-পড়া নারীদের মধ্যে জেগে ওঠে এক নতুন সমাজ-চেতনার আভাস। স্বদেশী আন্দোলন নারীকে চিনিয়ে দেয় তাঁর পরিসর, দেখা দেয় তাঁর মধ্যে সাহিত্যিক অভিব্যক্তি, স্বচ্ছ অনুভূতি। আর এখানেই তিনি স্বতন্ত্র, তিনি অসামান্য।

উল্লেখপঞ্জী

১. বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দীমজুমদারের 'মা'।
২. ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য (সম্পা) 'সুপ্রভা দত্তের ডায়েরী', দ্রষ্টব্য 'অক্ষরবৃত্ত' ৬ষ্ঠ বর্ষ:, ৪র্থ সংখ্যা, আশ্বিন ১৪০৩, পৃ. ৭
৩. তদেব
৪. ৮ মার্চ, ১৯৯৮ ইংরাজীতে আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষে মৈত্রেয়ী সংঘ আয়োজিত অমলেন্দু ভট্টাচার্য প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত (শব্দ সংগ্রাহক যন্ত্রে ধৃত)
৫. ৮ মার্চ, ১৯৯৮ ইংরাজীতে আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষে মৈত্রেয়ী সংঘ আয়োজিত ড. তপোধীর ভট্টাচার্য প্রদত্ত ভাষণ (শব্দ সংগ্রাহক যন্ত্রে ধৃত)

পরিশিষ্ট ২

উনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষে নারীমুক্তি আন্দোলনের সালতামামি

উনিশ শতক :

১৮১৯ : কলকাতার গৌরীবাড়িতে বাঙালি মেয়েদের জন্য প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮২৯ · সতীদাহ নিষিদ্ধ।

১৮৪৯ : প্রাতিষ্ঠানিক নাবীশিক্ষার সূচনা— ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল স্থাপন— পরে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত।

১৮৫৬ : বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত। বাঙালি মহিলা বচিত সর্বপ্রথম পুস্তক কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' প্রকাশিত। হিন্দু উত্তবাধিকাব আইন প্রবর্তিত। প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমাবীর জন্ম।

১৮৬৩ : ''বামাবোধিনী'' পত্রিকা প্রকাশিত।

১৮৮২ . পণ্ডিতা বমাবাঈ এর আর্যমহিলা সমাজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৩ : বাংলার প্রথম দুই মহিলা স্নাতক।

১৮৮৬ : বাংলাব প্রথম মহিলা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখী সমিতি' স্থাপন।

১৮৯১ : সহবাদ সম্মতিসূচক আইন অনুমোদিত (Age of Consent Bill)।

বিশ শতক :

১৯১০ : সরলাদেবীব 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' স্থাপন।

১৯১৪ : 'নারীসত্তা অন্বেষণেব প্রথম স্মৃতিফলক' রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'স্ত্রীর পত্র' প্রকাশিত।

১৯২০ : ভারতীয় নারীদের প্রথম ভোটাধিকার লাভ মাদ্রাজে।

১৯২১ : ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার লাভ বোম্বেতে।

১৯২৫ : ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার লাভ বাংলায়।

১৯২৭ : অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স (AIWC)-এর প্রতিষ্ঠা।

১৯২৯ : বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন প্রবর্তিত। ফলস্বরূপ মেয়ে ও ছেলেদের বিবাহের বয়স ধার্য হয় ১৪ ও ১৮।

১৯৪৩ : মহিলা আত্মবক্ষা সমিতির ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

১৯৫৫ : হিন্দু বিবাহ আইন প্রবর্তিত।

১৯৬১ : পণ প্রতিষেধ আইন অনুমোদিত (Dowry Prohibition Act)।

১৯৭১ : মেডিক্যাল টারমিনেশন প্রেগনেন্সি আইন বলবত, গর্ভপাত আইনসম্মত হল।

১৯৭৪ : স্টেটস কমিটির রিপোর্ট Towards Equality প্রকাশ। মথুরা রেপকেসে (১৯৭২) সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিবাদে দেশব্যাপী নারী আন্দোলন।

১৯৭৬ : নাবী শ্রমিকের পুরুষের সমান মজুবি পাওয়ার দাবি স্বীকৃত।

১৯৮৩ : রেপ বিল সংশোধন করা হয়। বিচাব হবে বন্ধ ঘরে এবং নির্যাতিতার নাম প্রকাশ কবা হবে না।

১৯৮৭ : 'সতীদাহ প্রতিষেধ আইন' প্রবর্তিত।

১৯৮৯ : দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পে সুযোগ-সুবিধার চল্লিশ শতাংশ নারীর জন্য সংরক্ষণের আইন।

১৯৯১ : জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত।

১৯৯২ : গণতন্ত্রের তৃণমূল স্তরে মহিলাদের জন্য ত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষিত।

১৯৯৭ : কর্মক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইন প্রবর্তিত।

১৯৯৮ : নাবালক সন্তানের উপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকারকে স্বীকৃতি দান।

২০০০ : বিবাহবিচ্ছিন্না মুসলমান মহিলাদের পুনর্বিবাহ না-করা পর্যন্ত খোরপোশ পাবাব অধিকারের পক্ষে রায় দান কলকাতা হাইকোর্টের।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অক্ষয় কুমার সেন — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুথি

২. অনুরাধা রায় — সেকালের মার্কসীয় সংস্কৃতি আন্দোলন

৩. অনুরূপা বিশ্বাস — কা আ তরুবর (কবিতাগ্রন্থ)
তৃষ্ণার ভৃঙ্গার

৪. (সম্পা) অভিজিৎ সেন — অগ্রন্থিত রোকেয়া

৫. (সম্পা) অভিজিৎ সেন
অভিজিৎ ভট্টাচার্য — সেকেলে কথা

৬. (সম্পা) অভিজিৎ সেন
যশোধরা বাগচী — শতবর্ষে আশালতা সেন

৭. (সম্পা) অমলেন্দু ভট্টাচার্য — দেবব্রত দত্তের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন

৮. আকিমুন রহমান — বিবি থেকে বেগম

৯. আনিসুজ্জামান — মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য

১০. (সম্পা) ঈশিতা চক্রবর্তী
বর্ণালী পাইন — নৈঃশব্দ্য ভেঙে

১১. কল্যাণী দত্ত — পিঞ্জরে বসিয়া

১২. কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য — শিলচরের কড়চা

১৩. কৃষ্ণকলি বিশ্বাস — স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে ভারতের নারী
উনিশ শতকের বামালেখনী

১৪. কৈলাসবাসিনী দেবী — হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা

১৫. গোলাম মুরশিদ — রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া
নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী

১৬. চিত্রা দেব — অন্তঃপুরের আত্মকথা

১৭. চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) — সময়ের উপকরণ মেয়েদের স্মৃতিকথা

১৮. তপোধীর ভট্টাচার্য — আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর
প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব
বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ

১৯. তাহমিন আলম — বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
(চিন্তাচেতনার ধারা ও সমাজকর্ম)

২০. পরাগ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় — বৈদিক সংহিতায় নারী

২১. পরিমল দে — শিলচর- পুরানো সেই দিনের কথা

২২. বন্দনা সেনগুপ্ত — স্পন্দিত অন্তর্লোক

২৩. বিনয় ঘোষ — বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ

২৪. বিনয়ভূষণ রায় — অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা

২৫. (সম্পা) বীণা মজুমদার — দুই পৃথিবীর উত্তরণ

২৬.	মল্লিকা সেনগুপ্ত	পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র
২৭.	সংকলক মহুয়া মিত্র	অরূপ তোমার বাণী
২৮.	মাহমুদা ইসলাম	নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা
২৯.	মোরশেদ শফিউল হাসান	বেগম রোকেয়া সময় ও সাহিত্য
৩০.	যশোধরা বাগচী	নারী ও নারী প্রসঙ্গ
৩১.	যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত	ভারত মহিলা
৩২.	(সম্পা) রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় গৌতম নিয়োগী	ভারত ইতিহাসে নারী
৩৩.	রঞ্জিত সেন	ভাবিত পুরুষ অ-ভাবিত নারী
৩৪.	রুশতী সেন	প্রচ্ছন্নের আখ্যান
৩৫.	লায়লা জামান	দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ
৩৬.	শামসুন নাহার মাহমুদ	রোকেয়া জীবনী
৩৭.	শেফালী মৈত্র	নৈতিকতা ও নারীবাদ
৩৮.	শিবনাথ শাস্ত্রী	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন সমাজ
৩৯.	সংঘমিত্রা চৌধুরী	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ
৪০.	সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী	অন্দরে অন্তরে
৪১.	(সম্পা) শাহিন আখতার মৌসুমী ভৌমিক	জানানা মহফিল
৪২.	সুকুমারী ভট্টাচার্য	মন্থন
৪৩.	সুখময় সেনগুপ্ত	বঙ্গদেশে ইংরাজীশিক্ষা: বাঙ্গালীর শিক্ষাচিন্তা
৪৪.	সুচিত্রা ভট্টাচার্য	খোলামন
৪৫.	সুতপা ভট্টাচার্য	সে নহি নহি মেয়েদের লেখালেখি (সম্পা)বাঙালী মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য
৪৬.	সুদীপা ভট্টাচার্য	নয়ন ছেড়ে গেলে চলে
৪৭.	সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	আধুনিকতার অভিমুখে রঙ্গনারী
৪৮.	(সম্পা) সুপর্ণা গুপ্ত	ইতিহাসে নারী: শিক্ষা
৪৯.	সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	অশ্রুত কণ্ঠস্বর
৫০.	সৌমেন্দ্র নাথ বসু	(সম্পা) স্মৃতিকথা, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী
৫১.	স্বপন বসু	সতী
৫২.	(সম্পা) স্বপন বসু হর্ষ দত্ত	বিশ শতকের বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতি
৫৩.	হুমায়ুন আজাদ	